

গৃহশ୍ରী

রায়সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

কবিশেখর বি, এ,

(খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণের
লিখিত পরিশিষ্ট-সহিত)

মূল্য দুই টাকা মাত্র
রাজসংস্করণ আড়ংই টাকা



ଅନ୍ତରାଳ ସଂସ୍କରଣ

প্রিন্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু
 "সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
 ৭৭ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

বাড়ীর মেয়েদিগকে স্বকল্পে কতকগুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তখনই ইহা-অন্তঃপুরের সীমার বাহির করিয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু লিখিতে লিখিতে পুঁথি বাড়িয়া গেল এবং হার অব্যবহৃত মত একখানি বাহির মত হইয়া গেল, এজন্য কয়েকজন বন্ধুর মাধ্যমে এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। নিজের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, শাস্ত্র ঘাঁটিয়া শ্লোকের অর্থ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে বাই নাই।

আমার কতিপয় বন্ধু পুস্তকখানি বাহাতে সকল বিষয়ে কাজে লাগে, এইজন্য নিঃস্বার্থভাবে শ্রম করিয়া আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বেচ্ছা লইয়াই পরিশিষ্ট। তাঁহাদের নিকট এজন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। পরিশিষ্টের যে অংশে মাসিক ও দৈনিক বেতনের হার এবং জিনিষপত্রের ওজন ও দর দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রমথনাথ সরকারের সাহায্যে প্রস্তুত করিয়াছি। বেতনের দৈনিক হার দিতে বাইয়া কড়া-ক্রান্তিগুলি অনাবশ্যক বোধে বাদ দিয়াছি। চিকিৎসা সম্বন্ধে নিত্যন্ত শিশুদের পক্ষে যে সকল ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন কোনটি যদি প্রচলিত ব্যবহারের অমূল্য না হয়, কিংবা তৎসম্বন্ধে যদি গৃহস্থের কোন বিধা বা সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে বিখ্যাত চিকিৎসকের মত লইয়া কাজ করাই ভাল। বলা বাহুল্য, বাহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কৃতী ও বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁহাদের ব্যবস্থা সর্বজনদাত। তৎসম্বন্ধে আমার অধিক আলোচনা অনধিকার-চর্চা মাত্র।

পুস্তক রচনার সংবল পাইয়া ভক্তিতাজন শ্রীযুক্ত লালগোলায় রাজাবাহাদুর গ্রন্থকারকে ৫০০ টাকা দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার বলাভ্যতা চির-পরিচিতি। কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার নামে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে বাধিত করিয়াছেন। মলাটের ছবিখানির মালীক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার অনুমতিক্রমে উহা ছাপাইতে পারিয়াছি। ৫০ পৃষ্ঠার ১০-১২ পংক্তির ভাব যে ছবিখানি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা জুবিলি-আর্ট-একাডেমির প্রিন্সিপাল ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রণদা প্রসাদ গুপ্ত আঁকিয়া দিয়াছেন। ইহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

৭, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকতা
১লা জানুয়ারি, ১৯২২ বাং

}

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এক বৎসরের মধ্যেই 'গৃহকীর' প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে, সুতরাং পুস্তকখানি সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, এরূপ মনে হয়। এবার পুস্তকখানি স্থানে স্থানে সংশোধন করিলাম।

১২ই বৈশাখ, বাং ১৩২৪
বেহালা, ২৪ পরগণা

}

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বি বৎসর হইতে ও অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তকের দ্বিটি সংস্করণ নিঃশেষ হইল, ইহাতে অনুমান হয়, পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদর লাভ করিয়াছে। এবার পুস্তকখানি ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার মেম্বরের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আত্মসম্মত পরিশোধিত হইল। সূক্ষ্মর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম ডি, মহাশয় তাঁহার লিখিত অংশ কতকট পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার এই নিঃস্বার্থপ্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

২৩শে মার্চ, ১৩২৪ বাং
বেহালা, ২৪ পরগণা

}

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সূচী

গ্রহিণী গ্রহমুচ্যতে ১৫ পৃ:।—গৃহে শৃংখলা ১ পৃ:। গ্রহিণী শুধু
রাধুনী বা পরিচারিকা নহেন ৩ পৃ:, রাসা-ঘরে ৪ পৃ:।

স্ত্রী-শিক্ষা ৫-২১ পৃ:।—বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষা কি? ৫ পৃ:,
বরণক্ষের পরীক্ষা-প্রণালী ৬ পৃ:, পোষাক বিজ্ঞা ৬ পৃ:, মেরেকে নিত্য নিত্য
কি শিখাইতে হইবে? ৭ পৃ:, হস্তাকর ও বর্ণাভিহি ৮ পৃ:, জননীর কর্তব্য
১০ পৃ:, পৌরাণিক উপাখ্যান ১১ পৃ:, উপভাস পড়া ১২ পৃ:, জীব-উপাখ্যান
১২ পৃ:, ইতিহাস-শিক্ষা ১৪ পৃ:, ভূগোল-শিক্ষা ১৪ পৃ:, সুখ করা বিজ্ঞা ১৫ পৃ:,
ইংরেজী-শিক্ষা ১৫ পৃ:, গানশিক্ষা ১৭ পৃ:, শেলাই ১৮ পৃ:, সাধারণ জ্ঞানের
উপযোগী শিক্ষা ১৮ পৃ:, ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা ১৮ পৃ:, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়
শিক্ষা ১৯ পৃ:।

শিশুদিগের শিক্ষা ২১-৫৩ পৃ:।—অতি-বয়স ২১ পৃ:, অবয়ব ২৩
পৃ:, বুড়ি ও মার্কেল খেলা ২৩ পৃ:, শিশু দেওয়া ২৪ পৃ:, ক্রিকেট ও ব্যাডমিণ্টন
২৫ পৃ:, স্কুলে ২৭ পৃ:, মেরেদের স্কুলে যাওয়া ২৯ পৃ:, শব্দা সম্বন্ধে সাবধানতা
২৯ পৃ:, অবিচার ২৯ পৃ:, জলের কলে ৩০ পৃ:, কাজে বস্ত্র ৩০ পৃ:, তাইবোন
কালে রাখা ৩১ পৃ:, কাজ করা নয়, কাজ শিক্ষা ৩২ পৃ:, পরিষ্কার থাকা ৩২
পৃ:, জিনিষপত্র লইয়া খেলা ৩৫ পৃ:, পরিষ্কার থাকা ৩৫ পৃ:, কু-অভ্যাস ৩৬ পৃ:,
বশাবির উপর জিনিষ রাখা ৩৬ পৃ:, ভ্রম-সামগ্রী নষ্ট করা ৩৭ পৃ:, আমোদ ও
প্রমোদ ৩৮ পৃ:, থিয়েটার ৩৮ পৃ:, ধর্ম-শিক্ষা ৪০ পৃ:, ইন্সপেক্টাইল লিটার
৪৩ পৃ:, গোয়ালার দুধ ৪৪ পৃ:, ফেরিওয়ালা ৪৬ পৃ:, খাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম ৪৬
পৃ:, ছেলেকে দুধ খাওয়ান ৪৭ পৃ:, ছেলেকে মারা ৪৯ পৃ:, শিষ্টাচার, ৫১ পৃ:,
দেখলাই লইয়া খেলা ৫৩ পৃ:।

একাত্তরভূক্ত পন্নিবান্দ ৫৪-৭৫ পৃ:।—এদেশের সমাজ ৫৪ পৃ:,
অকর্ম্মার কাজ ৫৫ পৃ:, একত্র থাকার বিপদ ৫৬ পৃ:, একত্র থাকা কোথায় সম্ভব

ও কোথায় অসম্ভব ৫৮ পৃঃ, আদর্শ ঘোষ-পরিবার ৫৯ পৃঃ, কর্তব্য কি ৭ ৬০ পৃঃ, বার্থপরতা ৬০ পৃঃ, একত্র থাকার অমূল্য কতকগুলি নিয়ম ৬১ পৃঃ, শকুনির চেষ্টা ৬২ পৃঃ, চিন্তাসংঘ ৬৩ পৃঃ, সমদৃষ্টি ৬৫ পৃঃ, আগেকার দিনের হুঁচলাগণ ৬৭ পৃঃ, সহর ও পল্লী ৬৮ পৃঃ, মেয়েদের চলাকৈরা ৭১ পৃঃ, ফুলের বাগান ৭২ পৃঃ।

স্মৃতিহীনীর কর্তব্য ৭৫-৯১ পৃঃ।—আরাধনা ৭৫ পৃঃ, ভাঁড়ার ৭৬ পৃঃ, আরশোলা ৭৬ পৃঃ, জিনিষ রৌদ্রে আনা ৭৭ পৃঃ, মাসিক বন্দোবস্তের দোষ-গুণ ৭৭ পৃঃ, তৈলচুরি ৭৯ পৃঃ, করলার দরুণ বেতন কাটা ৭৯ পৃঃ, ওজন ৭৯ পৃঃ, সঞ্চয় ৭৯ পৃঃ, ঘটিবাটির ধোঁজ রাখা ৮০ পৃঃ, বস্ত্রাদি ৮১ পৃঃ, ড্রেন ৮৩ পৃঃ, রান্নাঘর ৮৪ পৃঃ, উড়ে বায়ুনের লবণগ্রন্থতা ৮৫ পৃঃ, রান্নার বিবেচনা ৮৬ পৃঃ, পরিবেশন ৮৬ পৃঃ, ভিখারী ৮৭ পৃঃ, অন্ধ আতুরের প্রতি দয়া ৮৮ পৃঃ, হারান জিনিষ খোঁজা ৮৯ পৃঃ, খরচের হিসাব ৯০ পৃঃ, ছদ্ম-বালি ৯১ পৃঃ, নিমন্ত্রণে বেনী খরচ ৯১ পৃঃ।

দাস-দাসীীর প্রতি ব্যবহার ৯১-১০১ পৃঃ।—আগেকার দিনের দাস-দাসী ৯২ পৃঃ, এখানকার দাস-দাসী ৯৩ পৃঃ, বাজার ৯৪ পৃঃ, অসাক্ষাতে জটলা ৯৫ পৃঃ, উহার সামান্য মাহুয ৯৬ পৃঃ, খাওয়াইবার বন্ধ ৯৭ পৃঃ, দোষ ধরা ৯৭ পৃঃ, চঠাৎ ছাড়াইয়া দেওয়া ৯৮ পৃঃ, বেতন আটকাইয়া রাখা ১০০ পৃঃ, হুঁসিলাত ভৃত্য ১০০ পৃঃ, শিশু-রক্ষার ভার ১০১ পৃঃ।

গুরুজননের প্রতি ব্যবহার ও অশ্রান্ত কথা ১০২-১১৮।—পিতামাতার কষ্ট ১০২ পৃঃ, তাঁহাদের রেহ ১০২ পৃঃ, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা ১০৩ পৃঃ, সংঘ ও চিন্তাভুক্তি ১০৫ পৃঃ, বধুর কর্তব্য ১০৫ পৃঃ, গুরুজনকে প্রণাম ১০৬ পৃঃ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সত্বে ১০৬ পৃঃ, লজ্জা ১০৭ পৃঃ, রাতাঘাট ১০৮ পৃঃ, রাতার সতর্কতা ১০৯ পৃঃ, পুত্রকন্টার বিবাহে ১১১ পৃঃ, জ্বীলোকের গহনা পরা ১১৪ পৃঃ, এক পাগলের কথা ১১৫ পৃঃ, গহনা না দেওয়া ১১৬ পৃঃ, দোষীতা মাতার রেহের বাড়াবাড়ি ১১৬ পৃঃ, কুসংসর্গ ত্যাগ ১১৮ পৃঃ।

দাম্পত্য জীবন ১১৮-১৩১ পৃঃ।—বিবাহের বাধ্যক কল ১১৮ পৃঃ,

রূপ ও গুণ ১১৯ পৃঃ, বস্ত্রের দেশ ও বাস্তবরাজ্য ১১৯ পৃঃ, সংঘেষের পথ ১২০ পৃঃ, পদের মান রাখা ১২১ পৃঃ, অভ্যাচার ও মিথ্যাচার ১২১ পৃঃ, বাক্যসংঘম ১২২ পৃঃ, দোষ সন্ধান ১২৪ পৃঃ, সন্দিগ্ধা স্ত্রী ১২৫ পৃঃ, কপণ স্বামী ১২৬ পৃঃ, চরিত্রহীন স্বামী ১২৮ পৃঃ, সন্দিগ্ধ স্বামী ১৩০ পৃঃ।

শেষের কথা ১৩২-১৩৯ পৃঃ।—নিরাশ্রয়ের সাহসনা কি ? ১৩৩ পৃঃ, সংকল্প ও প্রেম ১৩৪ পৃঃ, মৌখিক অপ বৃথা ১৩৫ পৃঃ, তিনি নিতাই আসেন ১৩৬ পৃঃ, চাঁদরায় ১৩৬ পৃঃ, বৃক্ষের অমৃতপান ১৩৮ পৃঃ, আশ্বাদান ১৩৮ পৃঃ।

গৃহ-চিকিৎসা গ্রন্থের ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম্ ডি মহাশয় লিখিত (এ্যালিওপ্যাথিকমতে) ১৪০-১৬০ পৃঃ। ১ম অধ্যায়। আঁতুড় ঘবে, শিশুর অনুঘ, ১৪০ পৃঃ। ২য় অধ্যায়। অন্নবরক শিশুর পীড়া, শিশুর খাভ, পেটের অনুঘ, জ্বর, নাড়ী ও শ্বাসপ্রশ্বাস, ঠাণ্ডা, জোষ্ঠ, কাম, বসন্ত ইত্যাদি ১৪৫ পৃঃ। ৩য় অধ্যায় ঔষধ। ১৫২-১৫৬ পৃঃ। ৪র্থ অধ্যায়। আকস্মিক বিপদ,—কাটিরা গেলে, দন্ড হইলে, বিষাক্ত দংশন, ধেঁত হইলে, মচ্কাইলে, কানে বা নাকে কিছু ঢুকিলে, চক্ষে পড়িলে, গলার আটকাইলে, বিষাক্ত কিছু খাইলে, জলে ডুবিলে, ঔষধের তালিকা, ১৫৬-১৬০ পৃঃ।

চিকিৎসা (হোমিওপ্যাথিকমতে) গ্রন্থের ডাক্তার সতীশচন্দ্র বরাট মহাশয় লিখিত ১৬০-১৭১ পৃঃ। তরুণজ্বর, ভুলবকা, কল্পজ্বর, ছাড়িরা ছাড়িরা জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর, জলে ভিজা প্রকৃতি কারণে জ্বর, দ্ব্যাদি আহারের ফলে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, অন্ত্রাশ্র উপসর্গযুক্ত জ্বর; ১৬৩-১৬৫ পৃঃ। রক্তমাশা, রোগের বিবিধ উপসর্গ, পথা, ১৬৩-১৬৫ পৃঃ। উদরাময়, বিবিধ লক্ষণ, ১৬৫ পৃঃ। অজীর্ণ-দোষ ১৬৬ পৃঃ। শিশুর দন্তোদগম ১৬৮ পৃঃ। অপরাপন রোগে, ঔষধের মাত্রা ও পরিমাণ ১৬৯ পৃঃ।

চিকিৎসা (কবিরাজী-মতে) বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ সেন বিজ্ঞানভূষণ এম্ এ, মহাশয় লিখিত ১৭১-১৭৪ পৃঃ। সন্তোষাত শিশুর পরিচর্যা ১৭১ পৃঃ। জ্বর, সন্দি, পেটের অনুঘ, কাশপাকা, জরে দাও, পেট গরম

হইয়া অর, ম্যাগেরিয়া, টাইকরেড্, আমাশা, দস্তশূল, গলনালীকোলা, কোঁড়া, খোস, দক্ষরোগ, কাটিয়া গেলে, ক্ষিপ্ত কুকুর বা শূগল কামড়াইলে, জ্বরোগ ইত্যাদি ১৭৩-১৭৪ পৃঃ।

কৃষি-পঞ্জিকাক শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিত ১৭৫-১৮৩ পৃঃ। বৈশাখ—ওল, চিচিকা, ঝিঙ্গা, শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, পুঁই, ডেকো, নটে, ১৭৫ পৃঃ। জ্যৈষ্ঠ—লাউ, কুমড়া, চাঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসা, বর্ষাতি মূলা প্রভৃতি ১৭৬ পৃঃ। আশ্বিন—সীম, লঙ্কা, শীতের শসা প্রভৃতি ১৮১ পৃঃ। শ্রাবণ—লাউ, বরষাটি প্রভৃতি ১৮১ পৃঃ। আশ্বিন—চৈত্রের তরীতরকারী ১৮২-১৮৩ পৃঃ।

ভূত্যা ও কর্মচারীদের বেতনের হিসাব

২৮	দিনে	মাস	হইলে	১৮৪-১৮৫ পৃঃ।
২৯	"	"	"	১৮৬-১৮৭ পৃঃ।
৩০	"	"	"	১৮৮-১৮৯ পৃঃ।
৩১	"	"	"	১৯০-১৯১ পৃঃ।

অণ, সের, পোয়া, ছটাক প্রভৃতি ওজননের জিনিষের হিসাব ১৯২-১৯৪ পৃঃ।

সাংসান্নিক আন্ন-ব্যয়ের হিসাব শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত করিবার মহাশয় কর্তৃক লিখিত ১৯৫-২০২ পৃঃ।



গৃহশ্রী

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে

গৃহিণীর উপরই গৃহ-সুখ নির্ভর করে। শুধু প্রচুর অর্থ থাকিলেই গৃহের ব্যবস্থা ভাল করা যায় না। কোন কোন দরিদ্রের সংসারেও গৃহিণীর নিপুণতায় গৃহটি উজ্জ্বল দেখায়; আবার কোথাও বা প্রচুর দ্রব্যাদি ও নানা মূল্যবান উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সুব্যবহার অভাবে গৃহটি একবারে শ্রীশূন্য হইয়া যায়। অনেক বাড়ীতে দেখা যায়, বহুমূল্য কিংখাপের শয্যা খুলার লুটাইতেছে; সুন্দর সুন্দর তামা-কাঁসার দ্রব্যাদি যথা-তথা পড়িয়া গড়াগড়ি বাইতেছে; সেগুলি উত্তমরূপে মাজা না হওয়াতে তাহাদের দীপ্তি নাই; বড় বড় হল নানা প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া ব্যাপারীর নৌকার মত বোঝাই হইয়া আছে। বাড়ীতে অনেক ভৃত্য ও পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও কার্যের শৃঙ্খলার অভাবে তাহারা কাজে কাজে নিযুক্ত থাকিয়া গৃহস্থালীর কোনও উপকারে আসিতেছে না। কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ বা ক্রমাগত বাজারে ঘুরিতেছে; একবারে বাহা আনিতে পারে, তজ্জন্ত দশবার ঘুরিতেছে। বাহা কিছু গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও যেন কিছুতেই সংসারের অভাব মিটিতেছে না। গৃহবানি রাশি রাশি উপকরণ লইয়াও শোভাসৌন্দর্যে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

আবার এমন অনেক সংসারও আছে, বাহাতে সকল জিনিষই সুন্দর দেখাইতেছে; তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলিও যেন দৃঢ়স্বভাব হইয়া দারিদ্র্যের মলিনতা ঢাকিবার জন্ত প্রাপণ চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ একটা বিজ্ঞাপনের

ছবি বাশের ফ্রেমে বাধাই হইয়া ঘর আলো করিতেছে; অতি সামান্য শব্দা পরিষ্কার চান্দর ঢাকা থাকিয়া স্নন্দর দেখাইতেছে; গৃহের উঠানটি ধ্বংসে, তাঁড়ারে চাল-ডাল অতি যত্নসহকারে রক্ষিত; দরিদ্রের সংসার, তবুও দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীর হস্তের কুশলতা যেন সমস্ত মালিন্য ঘুচাইয়া দিয়াছে: গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভুল করিয়াছে বলিয়া যেন শঙ্কিত হইয়া আছে।

ধনীর বাড়ীতে বহু খরচ-পত্র হইতেছে। বড় বড় রুই-কাতলা আসিতেছে; ভাল বি ও নানাবিধ শাক-সবজী মাথায় করিয়া মুটে দিনরাত্রি আনাগোনা করিতেছে; কিন্তু হয় ত ব্যবহার অভাবে তাগ কাহারও তৃপ্তিসাধন করিতে পারিতেছে না। ভাঁড়গুলি মলিন, তাহাদের গায়ে তৈল, বি, ময়দা প্রভৃতিসহ সঙ্গে বহুদিনের ময়লা জমিয়া গিয়াছে। তাঁড়ারে চাল-ডাল-ময়দা কতক কতক মজিতে পড়িয়া আছে, ঘরে যে ইচ্ছা, সে সেই ভাবে তাহার ব্যবহার করিতেছে; ইন্দুর, কাক, আরশোলা সেখানে দস্তুরমত বাসা করিয়া আছে; রান্নাঘরে কয়লা ও তৈলের শ্রদ্ধা হইতেছে; চাকর-চাকরাণীরা ও রাঁধুনি সুবিধা পাইলেই চুরি করিতেছে ও নানা খাপ্তদ্রব্য ও মিষ্টানের সমাগম সঙ্গেও হয় ত কর্তা ও শিশুগণ খাবার সময় অনেক জিনিষই পাইলেন না। বাহার অসুখ, সে সময়মত পথ্য পাইল না; ঔষধ খাইবার সময় দেখা গেল, একটা অসুপান ভুলক্রমে আসে নাই; রাতে হঠাৎ কাহারও অর হইলে দেখা গেল, তাঁড়ারে এক টুকরা মিশ্রি নাই, বালি খাওয়ার সময় একটু কাগজি-লেবু পাওয়া গেল না, তখন বাজার বন্ধ।

কেবল অর্থে সংসারের সুখ হয় না, এবং অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থা সঙ্গেও গৃহস্থ গৃহ-সুখ হইতে বঞ্চিত না হইতে পারেন। গৃহিণীর গুণপনা ও কার্য-কুশলতার উপরই সংসারের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। একজন আমাদের ঘেরেঘিগকে একরূপ শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাহাতে তাঁহারা ভালরূপ গৃহস্থালী শিখিতে পারেন। বাহাদের অবস্থা খুব ভাল, তাঁহাদের গৃহেও যদি গৃহিণী স্থনিপুণ ও কার্যকুশলী না হন, তবে সে গৃহও অনেক সুখ হইতে বঞ্চিত

থাকে ; আর বাঁহারা দরিদ্র, তাঁহারা স্নগৃহিণীর অভাবে সংসারের সমস্ত সুখ হইতেই বঞ্চিত হইবেন ।

কোন কোন গৃহিণী প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে পারেন ; তাঁহাকে রান্নাঘরে বসাইয়া দাও, তিনি বড় বড় ডেগ ও কড়াইয়ের সঙ্গে সখা-স্থাপন করিয়া দিবারাত্র রাঁধিতেছেন ; এবং বাঁহা রাঁধিতেছেন, তাঁহা খাইয়াও হয় ত লোকে সুখ্যাতি করিতেছে । পূর্ব্ববঙ্গে একরূপ গৃহিণীর সংখ্যা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু ত্রীলোক শুধু রান্নার কার্য্যে নিপুণ হইলেই কি স্নগৃহিণী-পদবাচ্য হইবেন ?

এমনও দেখা যায় যে, সেই গৃহিণীর শিশু-পুত্র রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া আলপিন গলিতেছে, কিংবা কেরোসিনের ডিবির কালী মুখে মাখিতেছে, কিংবা জলের কলসী ফেলিয়া দিয়া জলের মধ্যে গড়াগড়ি গৃহিণী শুধু রাধনী বা পরিচারিকা নহেন বাইতেছে ; গৃহিণী কড়াতে তৈল প্রদান ও মংস্তে হলুদমাখা কার্য্যে এত ব্যস্ত যে, শিশুপুত্রের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর পাইতেছেন না ; অথবা যদি সেই দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, অমনট উঠিয়া এক বৎসর-বয়স্ক শিশুর পৃষ্ঠে কবیرা চড় মারিতেছেন । হয় ত অবস্থা তেমন ভাল নহে, বেশী চাকর-চাকরানী নাই, সেই সময় স্বামী আফিসে যাইবার সময় তাঁহার জামা খুঁজিয়া পাইতেছেন না, এবং আখবণ্টাকাগ খুঁজিয়া চীৎকার করিতেছেন ; গৃহিণী রান্নাকার্য্যে মনোযোগ বেশী থাকাতে, সে দিকে মোটেই লক্ষ্য করিতেছেন না । একপভাবে অনেক সময় অহেতুক কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

যিনি রান্না করিবেন, তাঁহার এটাও দেখা উচিত, যে সকল বস্ত্র শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে কি না ; ছোট ছোট শিশু সকলের কে কোথায় কি অবস্থার আছে ; বাঁহারা যে সময় খাইয়া থাকেন, তাঁহারা খাইয়াছেন কি না ; ক্রম ব্যক্তির খাদ্য বণ্যাসময়ে প্রদত্ত হইয়াছে কি না ; বাড়ীর সকলের অভাবাদির কি কি পূরণ হয় নাই এবং শিশুরা রান্নার ঘুমিয়া কেরীওজালায় নিকট হইতে ভাঙ্গা-কড়াই কিনিয়া খাইতেছে কি না । এই

কার্য্য দ্রুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যকে ঘরে আনিতে হইলে বিনা তপস্যায় চলিবে কেন? চারিদিকে মনোযোগ না রাখিলে গৃহস্থালী সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি কর্ত্তী হইবেন, তাঁহাকে সেই সকল শিক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাঁহার অনেক পরিচারক ও পরিচারিকা আছে, তাঁহারও মনটি এইভাবে দশদিকে রাখিতে হইবে। তিনি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চাকরদিগকে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যে নিযুক্ত করিবেন। মূল কথা, গৃহস্থালীর সমস্ত চিন্তাটি যে রমণীর মাথায় থাকিবে, তিনিই গৃহিণীপদের যোগ্য। এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, গৃহিণী শুধু রাঁধুনী নহেন, তিনি শুধু পরিচারিকা নহেন, তিনি গৃহাশ্রম চালাইবার শুধু একটা যন্ত্র নহেন। গৃহের বাহা কিছু, তিনি তাহার সকলের নিয়ন্ত্রী। এই জন্তই শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।”

কোন কোন গৃহিণীর নিজের রান্নাবান্না করিবার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তথাপি রান্নাঘরের তিনিই কর্ত্তী, রাঁধুনী নহেন। তাঁহার ইচ্ছাতে রাঁধুনী পরি-

রান্নাঘরে

চালিত হইবে, কারণ, কোন্ জিনিষটি বাড়ীর কে খাইতে ভালবাসেন, সেই গৃহে তাহার শরীরের পক্ষে কোন্ খাদ্য উপযোগী, এ সমস্ত গৃহিণীই জানেন; রাঁধুনী উনানে আগুন চড়াইয়া ডেগ ও ইড়ি নামাইয়া দিলেই খালাস, সুতরাং তাহার উপর একেবারেই নির্ভর করা চলে না। বিশেষ বাহার উপর সম্পূর্ণরূপে জীবন নির্ভর করে, সেই খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করার ভার বেতনভূক্ত ব্যক্তির উপর দিয়া নিশ্চিত থাকে চলে না। সুতরাং অবস্থা উন্নত হইলে যে, জীলোক রান্নার সঙ্গে সম্পর্কবজ্জিত হইবেন, এ ধারণা ভুল। কোন সময়ে তিনি স্বয়ং রান্নাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন—তখন তাঁহার অপরূর্ণা-মূর্ত্তি। তিনি শুধু রান্না করেন ও পরিবেশন করেন, একজন্ত তিনি অপরূর্ণা নহেন, রাঁধুনীও তাহা করিয়া থাকে। তাঁহার রান্না ও পরিবেশন সমস্তই মেহ-জড়িত; গৃহে কর্ত্তা হইতে ত্যাগণ, এমন কি, গৃহপালিত কুকুর পর্য্যন্ত—সকলের প্রতিই তাঁহার মেহের দৃষ্টি থাকিলে, সেই রান্না অমৃত-সুস্বাদ

হইয়া থাকে, এই জন্ত তিনি অন্নপূর্ণা। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণ বহু স্থানে এই অন্নপূর্ণা-গৃহিণীর চিত্র করিয়া গিয়াছেন। শিবায়নে পরিবেশন-নিরতা উমার মূর্তি এইরূপ বর্ণিত আছে,—

“দিতে নিতে গত্যাত নাহি অবসর।

শ্রমে হ’ল সজল কোমল কলেবর ॥

ইন্দুসুখে মল্ল মল্ল ঘর্ম্মবিন্দু সাজে।

মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্রোহের মাঝে ॥”

যাহারা স্নগৃহিণীর রীধা অন্ন খান নাই, তাহারা এই অন্নপূর্ণার চিত্র কোথায় পাইবেন ?

কিন্তু যে সময়ে তিনি নিজে রান্না ও শ্রমভার অপরের হাতে দিবে,—তখনও তিনি নিজে পরিবেশনের তত্ত্বাবধায়িকারূপে উপস্থিত থাকিবেন, কারণ, গৃহের এই ব্যাপারটি গৃহিণীর অপরিহার্য্য কর্তব্য। গৃহের কে কি খাইল,—এইজন্ত উৎকর্ষা নারীজনের স্বাভাবিক স্নেহজনিত; এই বৃত্তি নষ্ট করিলে রমণীর স্বভাবের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রী-শিক্ষা

স্ত্রীলোক পুরুষের মত উচ্চ শিক্ষা করিবেন কি না, সেই দ্বন্দ্ব প্রশ্নের আলোচনা এখানে নিম্নরোজন। এখন আমাদের সমাজে যে অবস্থা আছে,

তাহাতে গৃহস্থালী শিক্ষাই তাহার সর্বপ্রধান শিক্ষা।

বর্তমান কালের উপযোগী
শিক্ষা কি ?

সমাজ যদি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাবে ধারণ করে, তবে কেহ বা আজন্ম কুমারী থাকিবেন, কেহ রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা

বিষয়বস্তু-বিভাগে পুরুষের সমকক্ষতা করিতে অগ্রসর হইবেন; বহিঃসত্য সত্যই এরূপ অবস্থান্তর ঘটে, তখন কি ভাল হইবে, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা চিন্তা করিবেন, এখনও সেরূপ চিন্তা করার সময় উপস্থিত হয় নাই। গৃহের

শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই স্ত্রী-শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, বর্তমান সামাজিক অবস্থার তাহাই মনে করিতে হইবে।

এই শিক্ষা কি ? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গৃহের সমস্ত সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, সমগ্রভাবে চিন্তা করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিবার যে শিক্ষা, ইহা তাহাই। এই শিক্ষা যিনি পাইয়াছেন, তিনি কেন যে উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। লেখাপড়া অল্পাধিক পরিমাণে সকলকেই করিতে হইবে; কতকটা সাহিত্য, অঙ্ক ও ইতিহাস জ্ঞান থাকা উচিত, হাতের লেখা সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। ইংরাজীও কিছু জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়, যিনি ইহা অপেক্ষা উচ্চশিক্ষার অভিলাষিণী হইবেন, তিনি সংস্কৃত রামায়ণখানি সম্পূর্ণ পড়িলে গার্হস্থ্য-ধর্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। মহাত্মার তঁ অত্যন্ত বিরাট পুস্তক; মাঝে মাঝে তাহা হইতে উপযোগী অংশগুলি পড়িলে জ্ঞানলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

ইদানীং আমরা দেখিতে পাই, যিনি বিবাহের তত্ত্ব কোন মেয়ে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি আসিয়াই হয় ত জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কি কি বই পড় ?”

বরপক্ষের পরীক্ষা-
প্রণালী

মেয়ে হয় ত “নীতিবোধ,” “সরল-সাহিত্য” এবং একুশ আরও দু পাঁচখানা বহির নাম করিল; খানিকটা পড়িতে দেওয়া হইল, মেয়ে হয় ত তাহাও পড়িয়া

গেল; হাতের লেখা দেখাইল ও ইংরাজী কাঠঁবুক হইতে ভেড়ার গল্পের ৪।৫ ছত্র পড়িয়া ফেলিল; কোন কোন অভিভাবককে দেখিয়াছি, মেরেকে তথ্যংশ ও জৈরশিকের পরীক্ষা লইতে বাইরা তাহাকে কাহিল করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা ছাঁড়া উলের টুপি তৈয়ারী, লেস-বুনান, উলের ছবি তোলা শ্রুতির নমুনা লইয়া ত ঘরে ঘরে মেরেরা প্রস্তুত আছেনই।

এগুলি ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবার পূর্বে আমাদের ‘কি বরকার, তাহাই আগ ঠিক করা প্রয়োজন। মেরেরা গরিয়া গরিয়া লিখিয়া সুন্দর হাতের

পোষাকী বিখ্যা

লেখা দেখাইয়া বরেক্ষ-পিতা ও অভিভাবককে অনেক সময়ে ভুট করেন; কিন্তু অনেক সময়ে তাঁহাদের এই

প্রয়োজনের জন্য এক সেট পোষাকী হাতের লেখা থাকে, তাহা দেখাইয়া তাঁহার প্রশংসালভ করেন। বিবাহের পর কিন্তু অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য চিঠিখানি লিখিতে তাঁহার অনেক ভুল করেন, এবং অক্ষরগুলি আঁচড়-কাটার মত বিক্লি হয়। বাহার্য্য ত্রৈমাসিক পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, কার্য্যকালে দেখা যায়, তাঁহার সামান্য বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে অপটু এবং ধোপার হিসাব রাখিতে বাইরা মোট মিলাইতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। এক্ষণ কেন হয়? তাহার কারণ এই যে, অধিকাংশ স্থলে পিতা কলার শিক্ষার কোন যত্ন লয়েন না, কেবলমাত্র বরপক্ষীয়দিগকে কলার, কোনরূপ মুখোন্স পয়সার মত, একটা কৃত্রিম বিভাবস্তার পরিচয় দেখাইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চেষ্টিত থাকেন।

মেয়েকে যদি অল্প বয়স হইতে বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে দেওয়া হয়, ধোপার হিসাবের ভারও তাহার উপর দেওয়া হয়, এবং তাণ্ডাস্থে জিনিষপত্র কি আছে কি নাই, এবং প্রতিদিন কোন জিনিষের কতটা

মেয়েকে নিত্য নিত্য কি
শিখিতে হইবে?

দরকার হয়, ইত্যাদি নিত্য নিত্য প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা
দেওয়া হয়, তবে বোধ হয়, জ্যামিতি পড়া ও ত্রৈমাসিক

অঙ্ক কষা হইতে অনেক বেশী ফলোদয় হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, বৎসরাবধি চাল, ডাল, তৈল নিজ হাতে গৃহিণী খরচ করিয়াছেন, অথচ মাসে কোন জিনিষ কতটা খরচ হইল, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে পারেন না। সপ্তাহে সপ্তাহে ধোপার বাড়ীতে কাপড় গনিয়া দিয়াছেন, বৎসরে ধোপার হিসাবে কত টাকা গেল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শিশুকাল হইতে এই সমস্ত শিক্ষার মেয়েকে ব্রতী করিলে স্বামী-গৃহে বাইরা তিনি অনায়াসে গৃহবাসী সকলকে স্বীয় পটুতা দ্বারা চমৎকৃত করিয়া তুলিতে পারেন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্য—অর্থৎ ইহাতে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের দরকার। জিনিষপত্রের ওজন খুব ঠিকরূপে জানা, বোণ করিয়া মোট টাকা নামাইতে ভুল না হওয়া প্রভৃতি বিষয় শিশুকাল হইতে শুদ্ধভাবে শিক্ষা না করিলে ভাবী জীবনে নানা প্রকার ক্ষতি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষণ দেখা গিয়াছে যে, যিনি তদ্রাংশ ও

ত্রৈলোক্যকে ব্যাপ্তি দেখাইয়া বধুরূপে মনোনীত হইরাছিলেন, তিনি ধোপাকে কাপড় দিবার সময় একবার গণিয়া বলিতেছেন ৩০ খানি, আর একবার বলিতেছেন ৩৪ খানি ; কিছুতে মোট মিলাইতে না পারিয়া চন্দ্রমুখ মলিন হইয়া যাইতেছে। গৃহে শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গীয় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যদি শিশুকাল হইতে অভিজ্ঞতালভের পথ সুগম না হয়, তবে পোষাকা বিজ্ঞানজ্ঞানে কোন ফল নাই ও তাহা ভবিষ্যতে নানা প্রকার ক্ষতি হইতে গৃহিণীকে রক্ষা করিতে পারে না।

হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া আবশ্যক এবং বর্ণাঙ্কিত না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ; হাতের অক্ষর ভাল হইলে যে শুধু দোষে লেখাটি সুন্দর হইল এবং

হস্তাক্ষর ও বর্ণাঙ্কিত

লোকে দেখিয়া প্রশংসা করিবে, ইহাই মাত্র লাভ নহে ; সংসারে সুন্দর ও শুদ্ধ লেখা গৃহিণীর পক্ষে

দরকার। তিনিই ভবিষ্যতে তাঁহার শিশুসন্তানদিগের গুরু হইবেন, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমার একজন বন্ধু তাঁহার বড় বড় ছেলের শিক্ষক মনোনীত করিবার সময়ও শিক্ষকের হাতের লেখাটি আগে দেখিতে চাহিতেন। শিক্ষক মহাশয় বি, এ, এম এ পাশ করিলেই শিক্ষাকার্য্যের উপযুক্ত হইবেন, ইহা তিনি মনে করিতেন না, তাঁহার হাতের অক্ষর ভাল না হইলে ছেলেদের শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে দিতে তিনি সম্মত হইতেন না, কারণ, যাহার নিজের হাতের লেখা ভাল নহে, তিনি অপরের হাতের লেখা সহজে তার পাইবার উপযুক্ত নহেন, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। ছেলেদের হাতের লেখা সুন্দর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাহারা ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যদি হাতের লেখা খুব ভাল হয়, তবে ছেলেরা ঢের বেশী নম্বর পাইয়া থাকে। অনেক সময় পরীক্ষার হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়ার জন্য প্রকৃতভাবে শতকরা পাঁচ নম্বরের কথা থাকে, কিন্তু লেখা ভাল হইলে প্রকৃতপক্ষে ছেলেরা শতকরা পাঁচ হইতে অনেক বেশী নম্বর পাইয়া থাকে। কারণ, হাতের লেখাটা বেশ সাজান ও ভাল দেখিলে পরীক্ষকের মন স্বভাবতঃই প্রীত হয়, এক তিনি

মুক্তহস্তে নম্বর দিয়া থাকেন। হাতের লেখা কদর্যা হইলে, অনেক সময় পরীক্ষক উত্তরের সকল অংশটা পড়িয়া উঠিতে পারেন না এবং তাঁহার মনও স্বভাবতঃ বিরক্ত থাকে, এ অবস্থায় তিনি কুণ্ঠিত হইয়া নম্বর দিয়া থাকেন। মেয়েদের পক্ষে হিসাব রাখিতে গেলে হাতের অক্ষর সুন্দর হইলে জমা-খরচ পরিষ্কার থাকে এবং তাহাতে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম হয়। অতি শৈশবে যদি হাতের লেখার প্রতি যত্ন না লওয়া হয়, তবে একবার অক্ষরের ছাঁদ বিস্তী হইয়া পাকিয়া উঠিলে চিরকালই তাহা ধারাপ-ধাকিয়া যায়। সেই অতি শৈশবে মাতাই শিশুর আদিকর। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর হইলে তিনি অনারাসে ছেলে-মেয়েদের হাতের অক্ষর সুন্দর করিতে পারেন। বাহার অবস্থা ভাল, সুতরাং যিনি প্রথম হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষেও আনাদের উপদেশ ভুল্যক্রমেই উপযোগী। যদি তিনি নিজে সুন্দর লেখার পক্ষপাতী হন, তবে শুকুমহাশয় শিশুগণের শিক্ষাকার্য্যে কিরূপ বোধ্য এবং তাঁহার শিক্ষাগুণে তাহাদের উন্নতি হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শুধু মাসে মাসে শিক্ষকের বেতন জোগাইয়া নিজের কর্তব্য হইতে মুক্ত হইলেন, এরূপ ধারণা বাহাদের, তাহাদের ছেলে-মেয়েদের অনেক সময়ই বিশেষ কোন উন্নতি হইতে দেখা যায় না। পূর্বে ছেলেরা কলার পাত বা প্লেটে লিখিতে শিখিয়া শেষে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত। এখন তৎস্থলে হুঁপরা দামের খাতাতেই তাহারা অনেক সময় লিখিতে শুরু করেন। যদি হস্তাক্ষরের দিকে প্রথম হইতে মনোযোগ না থাকে, তবে শিশুরা হিজিবিজি লেখে কিংবা এক পৃষ্ঠার এক ছত্র লিখিয়া তাহা ধারাপ হইলে অপর পৃষ্ঠার লিখিতে আরম্ভ করে; এইভাবে প্রতি মাসে তাহারা বহু খাতা নষ্ট করিয়া থাকে। খাতাটি শিশু অতি পবিত্র ও আদরের জিনিষ বলিয়া মনে করিবে, তাহার প্রত্যেক পত্র যেন উত্তমরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাহাতে যে লেখা হইবে, তাহা যেন অতি বস্তুর সহিত তাহারা লিখিতে শেখে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমার ছেলেদের মধ্যে বাহার মাটি কুলসন ক্লাসে পড়ে, তাহারাও

অনেক সময়ে স্টেটে লিখিয়া শেষে খাতার শুদ্ধভাবে যন্ত্রের সহিত তাহা টুকিয়া লয়। যাহারা খাতার তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত হিজিবিজি লিখিয়া থাকে, তাহারা লেখা-পড়ার খুব অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না; তাহাদের অভ্যাস এরূপ খারাপ হইয়া যায় যে, তাহারা শেষে সেলাই করিতে বাইরা লাইন সোজা রাখিতে পারে না, রাখিতে বসিয়া আধসিদ্ধ বাজ্ঞনতরকারী নামাইয়া থাকে, কোন কার্যই তাহারা ধীরতা বা নৈপুণ্যের সহিত করিতে পারে না।

হাতের লেখা স্কুলের হওয়ার যেরূপ প্রয়োজন, বর্ণাঙ্কিত-সম্বন্ধে সাবধানতা প্রথম হইতে অবলম্বন করাও সেইরূপ আবশ্যক। বর্ণাঙ্কিত প্রতি প্রথম হইতে সতর্ক না হইলে শেষে আর তাহার সংশোধন হয় না। অনেকে বি এ, এম এ, পাশ করিয়াও হামাস্ত কিছু লিখিতে ঝুড়ি ঝুড়ি বানান ভুল করিয়া থাকেন। প্রথম হইতে এ বিষয়ে অমনোযোগ থাকার এরূপ ঘটিয়া থাকে।

শিশুর পক্ষে জননীই আদিগুরু। সর্কবিষয়েই জননী হইতে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, শিশুর জীবনে তাহারই প্রভাব সর্ক্যাপেক্ষা বেশী হয়। কারণ, অসীম মাতৃস্নেহ (যাহা জীবনের পক্ষে ভগবানের সর্ক্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান) যে শিক্ষার নিরস্তা, সেই শিক্ষার তুল্য শিক্ষা কোথায়? জননীর মুখ হইতে যে কথা শুনিয়া শিশু ভাষা শিক্ষা করে, সেই ভাষা হইতে মধুর ও শ্রুতিসুখকর ভাষা কে কবে শুনিয়াছে? নিজের সমস্ত স্বার্থ ভুলিয়া, নিজে প্রাণপণ করিয়া, জননী শিশুকে প্রতিদিন যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শিশু হৃদয়ে দেব-ভাষার, দেব-কথার চিরতরে লিখিত থাকে। সুতরাং জননীর কর্তব্য সর্কবিষয়ে পালন

জননীর কর্তব্য

করিবার জন্ত তাহার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। শুধু স্তন দিয়া শিশুকে পোষণ করায়, ও স্নেহ-সুখায় তাহাকে ডুবাইয়া রাখিলেই তাহার উন্নতি হইবে না। তাহাকে সংসারের যোগ্য করিয়া তুলিতেও মাতাই প্রথম সহায় হইবেন, এ সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিত-ভাবে লিখিতেছি।

রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান এ দেশের মেয়েদের চিরন্তন প্রিয় সামগ্রী।
গার্হস্থ্য-ধর্ম শিক্ষার পক্ষে একরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ দেশে আর হইতে পারে না।

সীতা ও সাবিত্রীর হুঃখ, রমণী ও চিন্তার পাতিব্রত্যা
পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিবিধ কষ্টের বিবরণ নয়নের জলে লিখিত ;

তাহা পড়িয়া স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। উপ-
জ্ঞানসেও অনেক সময়ে হুঃখ-কষ্টের বিবরণ থাকে, তাহা পড়িয়াও অনেক সময়
চক্ষু হইতে জল পড়ে। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান উপজ্ঞানাদির
একটা পার্থক্য আছে ! বর্তমান লেখকগণ অনেক সময় শুধু মনে কষ্ট জাগাইবার
জন্ত কোন পারিবারিক ঘটনার বর্ণনা করেন। শুধু হুঃখ-কষ্টের বিবরণ পড়িয়া
মনে বাথা পাওরাতে কি লাভ ? অনেক সময় শিশু যেরূপ প্রজাপতিট ধরিয়া
একটি একটি করিয়া তাহার পাখা ও পা' গুলি ছিঁড়িয়া আমোদ প্রমত্ত, লেখকও
সেইরূপ কোন রমণী বা পুরুষের এক হুঃখ হইতে অপর হুঃখে পড়িবার কথা
কল্পনাস্রবের সহিত বর্ণনা করিয়া বাথা দিয়া তাণ্ডলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু
এরূপ অনর্থক হুঃখ পাঠকের মনে জাগাইয়া কি লাভ হয় ? যদি ধর্মের জন্ত
কিংবা কোন মহৎ ভাবের জন্ত কেহ আত্মত্যাগ করিয়া কষ্ট পান, তবে সেই
বিবরণ পাঠে পাঠকের মন উন্নত হয়, এবং মহৎ ধর্মভাবগুলি হৃদয়ে আগ্রত হইয়া
উঠে। স্বামীর প্রাণলাভের জন্ত বেহুলা কিংবা সাবিত্রী যে কষ্ট স্বীকার করিয়া-
ছেন, তাহা পড়িয়া কোন মহিলার মন বিশ্বয় ও উচ্চভাবে পূর্ণ না হইবে ? কেহ
বা পিতৃসত্য-পালনের জন্ত বনে গিয়াছেন, কেহ বা বালাকালেই সর্কত্যাগী যোগী
সাজিয়া ভগবৎ-আরাধনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কেহ বা পিতৃশ্রদ্ধে চিরকোমারী
অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা নানারূপ ঐশ্বর্যের প্রলোভনের উপর পদাঘাত
করিয়া পাতিব্রত্যা-ধর্ম উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন। এই সকল উপাখ্যানের
অন্তর্নিহিত পবিত্রতা পাঠকের মনকে পবিত্র করিয়া থাকে। তৎইলে কোন
হুঃখীলা ভ্রাতৃবধু অকারণে তাহার দেবর-স্ত্রীকে তরানক বদ্বর্ণা দিতেছে, তাহার
কলে সেই নিরীহ রমণী আক্ৰিম ধাইতেছেন ; কিংবা সকল সম্পত্তি নির্ঝিবাদে

প্রাসের জন্য কোন পিতৃব্য তাঁহার ভাইপোকে ধীরে ধীরে বিবগ্রয়োগ করিয়া হত্যা করিতেছেন, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিলে বা পড়িলে সাময়িক উত্তেজনা বা কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার বিবরণ পাঠ করিয়া কোন উপকার-লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। অত্যাচার দেশের সাহিত্যে এইরূপ ঘটনায় যে একটা নিষ্ঠুর আমোদ পাওয়া যায়, তাহাই লেখক ও পাঠক চূড়ান্ত মনে করিয়া থাকেন! কিন্তু আমাদের দেশে লোক উপন্যাস ভিন্ন বড় বড় কাব্য-গ্রন্থেও অল্প উদ্দেশ্য স্বীকার করেন নাই, এবং তাই বলিয়া যে এই সকল কাব্যে সাহিত্যিক রস-ধারার অভাব হইয়াছে, তাহা নহে; পবিত্র জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আত্মত্যাগ-জনিত নানা কষ্টের কথা জড়িত থাকাতে কাব্য-কথা যেরূপ মনোহারিণী হইয়াছে, সেইরূপ তাহা নৈতিক উন্নতির সহায় হইয়াছে।

উপন্যাস পড়ি একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে আমি বলিতেছি না; কারণ, এখন শ্রোত সেই দিকে বহিতেছে,—এই শ্রোতের বেটুকু খারাপ অংশ, তাহা

উপন্যাস পড়া

আমাদিগকে সামলাইতে হইবে। কতকগুলি উপন্যাস বেশ ভাল আছে, তাহা ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক নির্ধাচন করিয়া দিবেন। কিন্তু বাজে ডিটেক্টিভ-কাহিনী ও গল্প, বাহা রাশি রাশি স্ত্রীলোকেরা পাঠ করেন, সেগুলি পাঠ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। বৃথা কোতূহল-নিবৃত্তির জন্য সেই সকল অসার গল্প পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদের মন সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে।

আমার মনে আছে, গ্রাম-সন্ধ্যায় বা নিবিড় নৈশ অন্ধকারে একটি ক্ষীণ দীপ-শিখার আলোকে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী যখন রামায়ণ ও মহাভারত স্মরণ করিয়া পড়িতেন, তখন আমার মন এই সংসার হইতে এক উন্নততর পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিত। ঠাকুরমাতার মুখে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান শুনিয়া

ধ্রুব-উপাখ্যান

যে আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছিলাম, আর কিছুতে তাহা পাই নাই। ধ্রুব পিতার সত্য হইতে ত্যাগিত হইয়া কঠিন অভিযানে হুঁপিয়া হুঁপিয়া কাঁদিতেছিল, তাহার মায়ের একটি কথাই সে

আরাধনার পথ পাইল,—মায়ের কথায় পাঁচ বৎসরের ছেলের কি পরিবর্তন ঘটিল ! অপূর্ণ বিবাহে পাঁচ বৎসরের ছেলে ঘোর রজনীর আঁধারে চলিয়া গেল—কাহাকে পাইতে ? বাহাকে কত প্রবীণ যোগী আজন্ম তপস্তা করিয়াও পান নাই ; বাহার পাদপদ্মের জন্ত বিশ্ব জুড়িয়া কায়া উঠিয়াছে ; বাহাকে কে পাইয়াছে জানি না, কিন্তু বাহাকে পাইবার জন্ত ত্রাপুরুষ একত্র হইয়া ছুটিয়াছে ; এবং পাঁচ বৎসরের শিশু বনে বনে তাঁহারই সন্ধানে পাগলের মত ছুটিল । কত উপবাস, কত তপস্তা, কত কান্নার শ্রোত বহিয়া গেল । অবশেষে সেই বনের কুলগুলি একত্র হইয়া বনমালা হইয়া গেল, তাহাদের অপূর্ণ সুগন্ধিতে বালক দিশেহারা ও চঞ্চল হইয়া উঠিল,—সরোবরের পদ্মগুলি যেন একত্র হইয়া এক বিরাট পাদপদ্মের আভাস দেখাইল ; আকাশের নক্ষত্রগুলির দীপ্তি রাজরাজস্বরের অপূর্ণ মুকুটমণি হইল, সমস্ত বিশ্বের ক্লম ও নীলজ্যোতি এক বরবপুর কান্তিস্বরূপ হইল, এবং চক্ষের জলে কি দেখিল, কি যেন পূর্ণরূপে দেখিতে পাইল না ;—তাহার কর্ণ শত শত বীণাধ্বনি শুনিল, তাহার নাসিকা শত শত কুসুমের সুরভিতে মত্ত হইল । কিন্তু সেই রূপ চক্ষের জলে সে ভাল দেখিতে পাইল না । সেই ক্রবের মূর্তি—বালক যোগীর মত তন্ময়ভাব প্রবীণের অনায়ত্ত, ভক্তিবোগে লভ্য—সেই পরমানন্দের আভাস, আমি বাহা ঠাকুরনাতার মুখে পাইয়াছিলাম, তাহা আর কোথায় পাইব ? বাহার গৃহিণী হইবেন, তাঁহার লিঙ্গকাল হইতে এই সকল ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখুন,—তাঁহাদের শিশুরা তাহা হইলে এ দেশের প্রকৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে । কারণ, মায়ের মুখের কথায় এই সকল ছবি শিশুর প্রাণে বেকরুপ অঙ্কিত হইবে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু বা রবি বর্ম্মার তুলিতে তাহা হইবে না ।

সাংসারিক কাজেরজন্ত যেরদের ইতিহাস শিক্ষার খুব একটা বেশী প্রয়োজন নাই, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক, কনিক, আকবর প্রভৃতি বড় বড় রাজাদের কীর্ত্তিকথা, এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুগণের জীবনী কতক কতক জানা থাকিলে ভবিষ্যতে গৃহিণী বীর সন্তানগণের ইতিহাস-

শিক্ষার বেশ একটা ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারিবেন। ইতিহাসের খুঁটিনাটি, তারিখ বা ছোট ছোট ছোট ঘটনা জানার ততটা দরকার নাই।

ইতিহাস শিক্ষা

ভারতের ইতিহাসের মোটামুটি ধারাবাহিক একটা জ্ঞান থাকিলে কাজে লাগিবে। যে সকল পুস্তকে ইতিহাস সহজ কথায় গল্পের মতন করিয়া লেখা আছে, তাহাই পড়া দরকার। ইংরেজী ভাষায় এই রকমের অনেক বই আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় বেশী নাই, তবে সেরূপ পুস্তকের সংখ্যা এখন ক্রমশঃ বাঙ্গালা ভাষায় বেশী হইতেছে, এরূপ মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস অপেক্ষা বঙ্গদেশের ইতিহাসের জ্ঞান একটু বেশী চাই। সিংহবাহুর কথা, বড় বড় পাল ও সেনরাজগণের কথা এবং হুসেন সাহ প্রভৃতি মুসলমান সম্রাটগণের কথা ও আধুনিক শাসনকর্তাদের কাহিনীর মোটামুটি একটা জ্ঞান থাকা চাই। কেহ মেয়েদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় গল্পের মতন করিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রণয়ন করিলে ভাল হয়। একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসে, অপরূপের কথা সংক্ষেপে সারিয়া বঙ্গদেশের ইতিহাস কতকটা বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইলে বোধ হয়, মেয়েদের বেশী উপযোগী হইবে।

ভূগোল সম্বন্ধেও সেই কথা; মোটামুটি পৃথিবীর একটা মানচিত্রে বড় বড় রাজ্য, তাহাদের রাজধানী, বড় বড় পর্বত, হ্রদ, সমুদ্র, নদ-নদীর নাম ও সংস্থান জানিয়া রাখিলে কাজ চলিবে। ভারতবর্ষের বড় বড় নগর, পর্বত ও নদ-নদীর নাম ও সংস্থান জানা চাই, কিন্তু বঙ্গদেশসম্বন্ধে একটু বেশী জানা দরকার। শুধু নদ-নদী ও নগরের নাম জানিলেই যথেষ্ট হইবে না, বাঙ্গালার কোন্ পল্লীতে কোন্ ধর্ম্মনেতা বা মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তিনি কোন্

ভূগোল-শিক্ষা

বংশ উদ্ভূত করিয়াছেন, কোন্ পল্লী কোন্ শিল্প-সামগ্রীর জন্য প্রসিদ্ধ, এ সকল ভাল করিয়া জানা দরকার; বড় বড় রেলের লাইন কোন্ দিকে হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ধারে কোন্ কোন্ নগর ও প্রসিদ্ধ পল্লী আছে, সেগুলিও জানা উচিত।

আনি যে সকল শিক্ষার কথা বলিলাম—ইহার জন্য খুব বড় বড় বই পড়িবার

দরকার নাই। প্রতি গৃহেই মেয়েদের জন্য অনায়াসে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা

হইতে পারে। অনেক স্কুল-পাঠশালার এইরূপ
মুখস্থ করা বিদ্যা

শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু শিক্ষকগণ অনেক সময়
জানেন না, মেয়েদের সেই বিষয়গুলির শিক্ষার কি লাভ। তাহারা সনাতন-পদ্ধতি
অনুসারে পড়া বুঝাইয়া যাইতেছেন ও মেয়েরা কলরব করিয়া মুখস্থ করিয়া
যাইতেছে। আমি, অন্নদিন হইল, একটি বালিকা-বিজ্ঞান পরিদর্শন করিতে
গিয়াছিলাম, দেখিলাম, শিক্ষক মহাশয় একটা ইতিহাস-পুস্তকের দুইটি সমগ্র পাতা
কোন এক শ্রেণীর বালিকাদিগকে মুখস্থ করিতে দিয়াছেন, তাহারা ঐয়কালে
গলদ্বন্দ্ব হইয়া সেগুলি বিকালে ও সকালে মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে, তৎপর যখন
পাখীর মত গলা বাড়াইয়া তাহারা আবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন আমার মনে
হইল, তাহারা সত্যি তোতাপাখী ; তাহারা যাহা এত কষ্ট করিয়া মুখস্থ
করিয়াছে, তাহার কিছুই তাহারা বোঝে নাই। অমৃত-তুলা নখর বৃদ্ধদেবকাহিনী
তাহারা মুখস্থ করিয়াছিল। কিন্তু এই উপদেশ বিষয়কে সমস্ত রস হইতে বঞ্চিত
করিয়া শিক্ষক মহাশয় এমন শ্রমসাধ্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছিলেন যে, আমার
মনে হইল, তিনি সন্দেহকে কুইনাইন মাখাইয়া সেবন করিতে দিয়াছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষা-সম্বন্ধে অবশ্যই কতকটা মতবৈধ থাকিবে। কিন্তু সমাজের

ইংরাজী-শিক্ষা উপর যখন যে শ্রোত আসিয়া পড়ে, উহা নিজের ইচ্ছার

অনুকূল না হইলে দেখিতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে রোধ
করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না ; যদি না থাকে, তবে সেই শ্রোতের
বিকল্পে না দাঁড়াইয়া সেই শ্রোতকে স্বীয় সমাজের যথাসাধ্য অনুকূল করিয়া আনা
উচিত। গল্পে আছে, মিস্ প্যারিসটন নামক জনৈক বুদ্ধা রমণী আটলান্টিক
মহাসাগরের তীরে কুটির বাধিয়াছিলেন। একদা আটলান্টিক মহাসাগর তীর
অতিক্রম করিয়া সেই কুটিরের দিকে আসিতেছে দেখিয়া বুদ্ধা বাঁটা-হস্তে তাহার
গতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তদবধি “মিস্ প্যারিসটনের বাঁটা” প্রবাদ-
বাক্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহার অর্থ অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা। আমাদের

সরুপ বিকল চেষ্ঠা করার কোন কারণ নাই। মেয়েদের কতকটা ইংরাজী লেখাপড়ার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চিঠিখানি বাড়ীতে আসিলে কাহার নামে উহা আসিয়াছে, তাহা পড়িতে পারা গেল না, বাড়ীর পুরুষবর্গ অল্পপস্থিত থাকিলে জরুরী পোষ্টকার্ড বা টেলিগ্রামের অর্থবোধ হইল না, ইহাতে অনেক সময় নানা প্রকারে অসুবিধা ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। একত্র সামান্য ইংরাজীর জ্ঞান গৃহস্থের ঘরে একান্ত প্রয়োজন। শিশুকে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শিক্ষা জননীই দিতে পারেন। আজকাল ইংরাজী-শিক্ষার পথ এত সুগম হইয়াছে যে, অভিভাবকগণ সহজেই যেরূপদিককে কিছু কিছু ইংরাজী শিখাইতে পারেন। অসচ্ছল অবস্থায় যখন ছোট শিশুর জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করার সুবিধা হয় না, তখন স্ত্রী গৃহকার্যের অবকাশে শিশুকে খেলা দেওয়ার ছলে একটু একটু ইংরাজী শিখাইলে সংসারের অনেক উপকার হইতে পারে।

এই শিক্ষা কেমন সহজে দেওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে দু-একটা উদাহরণ দিতেছি। এগুলি অবশ্য অতি সহজ—‘জানা’ কথা। কিন্তু অনেক সংসারেই এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দেখি নাই। শিশুকে come বলিয়া কাছে আনা এবং go বলিয়া সরিয়া যাইতে বলা, sit down বলিয়া বসিতে আদেশ করা ও stand up বলিয়া দাঁড় করান, eat বা take বলিয়া থাইতে দেওয়া, এবং drink বলিয়া জলপান করিতে বলা,—এই ভাবে ছোট ছোট ইংরাজী ক্রিয়ার অর্থ ও ব্যবহার দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে অনায়াসে গৃহিণী ছোট ছেলে-মেয়েকে শিখাইতে পারেন। তাহা ছাড়া, this is rice, this is water, this is table, this is chair, এই ভাবে ছোট ছোট নাম শব্দ শিখানোও বেশী কঠিন নহে। ইহার পরে go quickly (তাড়াতাড়ি হাঁট), go slowly (ধীরে ধীরে হাঁট), speak loudly, (উচ্চৈঃস্বরে কথা বল), speak slowly (ধীরে ধীরে কথা বল) প্রভৃতি ভাবে ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার শিখাইতে পারা যায়। Open the door (দরজা খোল), shut the door (দরজা বন্ধ কর), what is this ? (এটা কি), it is a jack (এটা কাঁটাল), it is a mango

(এটা আম), it is fish (ইহা মাছ), প্রভৃতি ছোট ছোট কথা শিশু মায়ের কোলে বসিয়া বিনা শ্রমে শিখিতে পারে। এই ভাবে এখানে আমি একটা ইংরাজী ব্যাকরণের পতন দিতেছি,—কেহ একরূপ ভয় পাইবেন না। আমি সে ভয় দেখাইতেছি না। আমি এই বলিতে চাই যে, মাতার নিকট শিশু যদি প্রথমকার পাঠশালা কথাবার্তার মধ্যে অভ্যাস করিয়া লয়, তবে তাহা শেষে খুব উপকারে আসিবে। গুরুমহাশয়ের কুঞ্চিত ক্র, আরক্ত চক্ষু ও উদ্ভত বেজের মধ্য হইতে সরস্বতী বালককে যে উগ্রমুষ্টিতে দেখা দেন, তাহাতে বিছার সঙ্গে অনেক সময় সম্ভাব প্রথম হইতে চটয়া যায়। খেলার প্রাঙ্গণে মায়ের আঁচল ধরিয়া হাসি এ কোতুকের মধ্যে যদি অজ্ঞাতসারে সরস্বতীর সঙ্গে মিলন ঘটে, তবে বিজ্ঞানদেবীও মাতার মত শেষকালে শিশুর আশ্রয়রূপ হইয়া উঠেন।

ত্রীলোকের গীত-শিক্ষা সম্বন্ধেও মতবৈধ আছে। কিন্তু উর্দুগবান্ রমণীর কোমলকণ্ঠ অনেক সময়ে গানের বিশেষ উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। বাহা
গান-শিক্ষা
স্বভাবগুণে মধুর, এবং যাহা পবিত্র ভাব উদ্দীপনার সহায়
হইতে পারে,—তাহা হইতে সংসারকে বঞ্চিত রাখিয়া

কোমল-কণ্ঠে গান শুনিবার তৃষ্ণা-নিবৃত্তি করিবার অল্প আবার কে কোন্ কুপে বাইরা পড়িবে? গঙ্গা কলধ্বনি করিয়া সাগরে যাইতেছেন, যমুনার ডেউ কত গান শুনাইয়া ছুটিয়াছে! উত্তর-পশ্চিমে হিন্দু-রমণীরা গান গাইতে লক্ষিত নহেন, আমাদের বঙ্গ-পল্লীই কি শুধু ভ্রমরগুঞ্জন ও কোকিল-কাকলি হইতে বঞ্চিত থাকিবে? এ সম্বন্ধে আমাদের সমাজ এখনও খুব অগ্রসর হয় নাই, সুতরাং আমি সত্যের আমার মত প্রকাশ করিতেছি। বাহারী এ সম্বন্ধে নিতান্ত প্রতিকূল, তাঁহার মেরুদিগকে সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত স্তোত্র ও বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তি শিখাইতে পারেন। ধর্ম্মমূলক স্তোত্র ক্রটিমধুর ছন্দে উচ্চারিত হইলে অনেক সময় সুশ্রাব্য সঙ্গীতেরই মত হৃদয়ে ভাবের উজ্জেক করিয়া থাকে। আপেকার দিনে মহিলারা সুর করিয়া রামায়ণ-মহাভারত পড়িতেন। সেই সুরের রেশ বহু বৎসর পরে এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে।

শেলাই শেখার দিকে আজকাল মহিলাগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু লেস বুন, উলের উপর হরপ তোলা, কিংবা উলের ঝারা কাপড়ের ছবি আঁকা

ইত্যাদি পোষাকী রকমের বিজ্ঞাপিকা বৈশী লাভ নাই।

শেলাই

উহাতে যতটা বাহাহরী, ততটা উপযোগিতা নাই। একজ পেনী, বডিস, সার্ট, কোট প্রভৃতি জামার ছাঁট-কাটা ও তাহা শেলাই করিতে শিখিলে গৃহস্থের অনেক কাজে আসিতে পারে। বাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, বাহাতে সংসারের চপসসা রক্ষা করা যায়, আগে তাহা শেখা উচিত। পোষাকী বিজ্ঞা অপেক্ষা সংসারের অভাব-মোচনের উপযোগী শিক্ষার প্রতি সর্বোপে লক্ষ্য রাখা উচিত।

শেখ হর, এ পর্যন্ত পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতেছেন যে, সাধারণ ভদ্র-গৃহস্থের সংসারের প্রতিই আমার বৈশী লক্ষ্য। বাহারা সোভাগ্যের উচ্চ শেখরে আসীন,

সাধারণ ভদ্রবরের
উপযোগী শিক্ষা

ঔহাদিগের গায় সংসারের অভাব অভিযোগের কাদামাটা লাগিবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে মহিলাগণের শিক্ষা-

দীক্ষার শুধু নৈতিক জীবন উন্নত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের সংসারে এই সকল শিক্ষার অভাব হইলে গার্হস্থ্য রথের চাকা আর চলিতে চার না, সংসারধাত্ম একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমার এই পুস্তকের মূল লক্ষ্য সাধারণ গৃহস্থের সংসারশ্রম। সেইরূপ সংসারের মহিলাগণের সংখ্যাই বৈশী এবং ঔহাদেব উন্নতি অবনতির উপরই আমাদের সমাজের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

জীলোকে উচ্চ-শিক্ষার কেহ জায়তঃ বিরোধী হইতে পারেন না। এই জীলোকের উচ্চশিক্ষা

হিন্দু-সমাজে বহুসংখ্যক রমণী পূর্বকালে উচ্চশিক্ষা পাইয়া ছিলেন; করিমপুর জেলার কোটালিপাড়ার বৈজয়ন্তী দেবীর কথা আপনারা হয় ত শুনিয়া থাকিবেন। দুই শত বৎসর পূর্বে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় যে সকল কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতের সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপ। বিক্রমপুর জপসা গ্রামবাসী জীবন্ত রামগতি সেনের কথা

শ্রীমতী আনন্দময়ী ১৫০ বৎসর পূর্বে জীবিতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের পীঠস্থানের চিত্র তিনি বৈদিক গ্রন্থের নির্দেশানুসারে অঙ্কিত করিয়া বড় বড় পণ্ডিতের বিষয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হরিশীলা কাব্যে তাঁহার সংস্কৃতাত্মক বাঙ্গালার বিরচিত কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। শিক্ষা দ্রৌপদকণ্ঠ সকলেরই উন্নতি-পথের সোপান।

কিন্তু বর্তমান সামাজিক জীবন-রক্ষার জন্য যে শিক্ষা না হইলে সংসারে নানা অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা, আমরা মাত্র সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই লিখিয়া যাইব। যাহারা সঙ্গীতে মীরাবাই, শাস্ত্রালোচনায় গার্গী, গুণপনার অক্ষুণ্ণতা ও কবিত্বে আনন্দময়ী হইবেন, আমরা তাঁহাদের পথে কাঁটার বেড়ার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু আমরা আটপোরে গৃহস্থালীর জন্য যে শিক্ষার দরকার, তাহাই লইয়া এই পুস্তক লিখিতেছি, এটি পুনঃ পুনঃ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমাদের ক্ষুদ্র অল্প এবং তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা বাহাতে হয়, ছেলেদের পীড়ার শুশ্রূষা ও তাহাদিগকে ভদ্র-শাস্ত করিয়া ভুলিয়া উন্নতির পথে প্রবর্তিত করিবার যে শিক্ষা, পুরুষমহিলাগণ বাহাতে সেইরূপ শিক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন, আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছি। এই পুস্তকে তদতিরিক্ত শিক্ষার প্রসঙ্গ বেশী থাকিবে না।

ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত কাহারও সংসার চলিতে পারে না। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত কাহারও ছেলেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। দরজীর

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়
শিক্ষা

সাহায্য ছাড়াও ভদ্রগৃহস্থ জীবন-বাড়া নির্বাহ করিতে
পারেন না। আমরা যে মহিলাদিগকে এই সমস্ত

বিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া বহির্জগতের সঙ্গে কারবার
উঠাইয়া দিতে পারিব, এমন আকাশ-কুসুম-কল্পনা বা অসম্ভব আশা কখনই পোষণ
করি না। যদি হুচার ঘণ্টা ডাক্তারের আসিতে দেয়ী হয়, তখন রোগীর জন্য
পূর্বেই যে সামান্য ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা মহিলাগণের শিক্ষা করা উচিত।

সামান্য কাসি, সর্দি-জ্বর ও পেটের অসুখ প্রভৃতি হইলেই যে ৪৮ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিতে হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। গৃহস্থ অনারাসে এই ক্ষতি পরিহার করিতে পারেন। পূর্বে প্রায় সমস্ত বঙ্গীয় মহিলারাই নানা প্রকার টোটকা ঔষধ জানিতেন। পুরুষেরা কষ্ট করিয়া অর্জন করিবেন, মহিলারা বথাসাধ্য গৃহের ক্ষতি সামলাইয়া লইবেন, পুরুষ ও স্ত্রীর এই সমবেত চেষ্টায় গৃহাশ্রম সুখের হইয়া থাকে। এখন টোটকা ঔষধের উপর নানা কারণে বিশ্বাস চলিয়া বাইতেছে। প্রধান কারণ যে, তাহার মধ্যে নানারূপ তেল ও ভ্রম ঢুকিয়াছে। বাহা হউক, এখন ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধের সঙ্গে সামান্য-রূপ পরিচয় স্থাপন করা প্রত্যেক মহিলার কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ধার্মমেন্টার দিয়া স্নেহের গায়ের তাপ পরীক্ষা করা এবং ঘড়ি দেখিতে জানা এখন ললনা-গণের একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার অঙ্গীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুখের বিষয়, অনেক ভ্রম ঘরে মহিলাদিগের এই বিষয়ে অপরের সাহায্য লওয়ার দরকার হয় না।

ডাক্তারকে ডাকিবার পূর্বে যে সামান্য ডাক্তারী দরকার, তাহা শিক্ষা করা যেমন মহিলাগণের কর্তব্য, সেইরূপ শিক্ষকের হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিবার পূর্বে তাহার যে শিক্ষাটুকু দরকার, গৃহিণী সে শিক্ষার সেইরূপ ভার লইবেন। সত্যতার শ্রীবুদ্ধির সঙ্গে বস্ত্রের দোকানের নানারূপ প্রসার বাড়িয়াছে। বৈদিক যুগের মহিলারা নিজেরা মাকু চালাইয়া বস্ত্র বয়ন করিতেন। এখন সেই সোণার বুন আর ফিরিয়া আসিবে না। তখনকার দিনের সামান্য অভাব অতি সামান্য চেষ্টায়ই পূর্ণ হইত, এখানকার সত্যতা পর্কত-প্রমাণ অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের দোকানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামগ্রীর অল্প ছুটিতে না হয় একজন্ত গৃহিণী সামান্য-রূপ দরজীর কাজ শিখিবেন। ছেলেদের জন্ত সর্বদাই আমার দরকার, যদি সেগুলি অবসরমত গৃহিণী প্রস্তুত করেন, তবে কত উপকার হয়! বদে অনেক গৃহের গৃহিণীরা এ বিষয়ে নিপুণতার পরিচয় দিতেছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। শিক্ষা-বিত্তারের সঙ্গে ঘরে ও বাহিরে একটা স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপিত হইবে। ঘরে কতকটা শিখিয়া বালক বাহিরে বিভাগরে বাইবে, কতকটা ওশ্রবা

ও চিকিৎসা পাইয়া রোগী দরকার হইলে বাহির হইতে ডাক্তার ডাকিবেন। অনেকগুলি সাধারণ সার্ট, কোট প্রভৃতি বাড়ীতেই প্রস্তুত হইবে, তারপর প্রয়োজন হইলে গৃহস্থ বাজারে বাইবেন। এই সকল শিক্ষা অতি সামান্য ও উহা ব্যয়সাধ্য নহে। দরিদ্র-গৃহস্থও মেয়েদের এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।

শিশুদিগের শিক্ষা

মাতার শিশুর প্রতি যে স্নেহ, তাহা প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রতি তাহার রক্ষার জন্য ঈশ্বরেরই দয়ার বাঁধন। মাতার স্নেহে দয়াময়ের দয়ার প্রকাশ, মাতাকে স্নেহ শিখাইতে বাওরার বাতুলতা কাহার হইতে পারে ?

কিন্তু অনেক সময়ে মাতার অত্যধিক স্নেহই শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে। অবশ্য, মাতা যে শিশুর সর্বপ্রকার হিত-ইচ্ছা করেন, এ সন্দেহ সংশয় কাহারও নাই ; যিনি শিশুর শুভ-চিন্তা করিয়া তাহার কল্যাণার্থ অনায়াসে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন, তাঁহার বুঝিবার দোষে শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য পিতৃপালন শিক্ষা করা মহিলাগণের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

কোন কোন মাতা অতি সাবধান ; একটু হিম বী রোদ্র পাছে শিশুর গারে লাগে, এজন্য তাহাকে বাহিরে বাইতে দেন না ; খাওয়া দাওয়া সবক্কে অনেক সময় অতি অল্প কারণে শিশুকে একবারে শুকাইয়া রাখেন। আমি একজনের সন্ধ্যা জানি, তাঁহার ছোট ছেলেদের কেহই তাঁহার ঠিক নিকটে শুইতে চাহিত না। কারণ এই যে, যে শিশু তাঁহার খুব কাছে শুইত, তিনি সারারাত্তিই তাহার গারে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতেন ; এবং কোন সময় যদি তাঁহার কলন। এরূপ হইত যে, শিশুর গায় একটু তাপ বেশী হইয়াছে, অমনই পরদিন তাহার তাত বন্ধ করিয়া দিতেন।

আর একজনকে জানি, তিনি তাঁহার যোগ্য ছেলেকে ঘোবনে বড় নদী উত্তীর্ণ হওয়ার ভয়ে সুশ্লেষী লইতে দেন নাই, সেই ছেলে বৃদ্ধ-বয়সে নির্দাকুণ দারিদ্র্য-কষ্ট পাইয়াছেন। যে শিশুর পিতামাতা ঐশ্বরিক বিধানেন্ত ভয় পাইয়া ইচ্ছানুসারে তাহার গতিবিধির স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করেন, তাহার ফলে সেই শিশু চিরক্লম্ব, দুর্বল ও সংসারবাড়া-নির্কীর্ষের অযোগ্য হয়। শিশুদের ধাবন, লক্ষন, উচ্চহাস্ত ও বীরোচিত উৎসাহ স্বাভাবিক। এই সকলের মধ্যে তাহাদের অন্তপ্রত্যন্ত স্মৃতি পাইয়া সবল হয়। দৌড়াইলে পায়ের গোড়ালি মচুকাইবে, খেলার যোগ দিলে বল আসিয়া মাথার পড়িবে, গজার ধারে গেলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অর হইবে, উচ্চহাস্ত করিলে মাথা ধরিবে, এই আশঙ্কায় সর্ববিষয়ে শিশুর প্রকৃতিকে বাধা দিচ্ছে সে কালে যে একবারে অকস্মাৎ হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসাবধান হইলে কতকটা বিপদ ও পীড়ার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং প্রয়োজনানু-সারে যথোচিত সতর্ক করিয়া শিশুকে যুক্তবায়ুতে খেলা ও কৌতুকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

অনেক পিতামাতা শুধু যে কেবল শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত পরিমাণে ভীত, তাহা নহে। তাহার নৈতিক অবনতি না হয়,—এই ভুল তাঁহারা অতি চিন্তিত। যখন নীতিজ্ঞান কি, তাহা শিশুর ধারণা হয় নাই ও না হওয়াই উচিত, তখন হইতে শিশুকে সাবধান করা হয়। এইভাবে তাহার অর্থশূন্য কাকলিতে বাধা দেওয়া হয়, “আপন মনে বসিয়া কি ছাই বকিতেছিন্?” বলিয়া তিন বৎসরের যেরেক তিরস্কার করা,—চীৎকার করিয়া কথা বলা খারাপ, তাহাকে বুকাইবার চেষ্টাচ্ছলে নানা প্রকার নীতি-মূলক উপদেশ ও গল্পনা দ্বারা শিশুবয়স হইতে তাহাকে ভীত ও পীড়িত করিলে সরল নীতির মূলে কূঠারঘাত করা হয়।

এইরূপে সর্বদা তড়ানা পাইয়া একটি শিশু এরূপ তন্নাতুর হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোনরূপ কষ্ট পাইলে সে মনে করিত, বুঝি কোন অন্তর্য করিয়াছে। তাহার একটা কোঁড়া হইয়াছিল এবং তন্মত্থ খুব বহুগাভোগ করিতেছিল, তখন সে চীৎকার করিয়া কাদিতে কাদিতে “আমি আর কন্ব না।” এইরূপে পালিত ও

বহুত কোন কোন পঞ্চদশ-বর্ষ-বয়স্ক বালককে দেখিয়া ও তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার ভুল হইয়াছে, এ কি পঞ্চাশৎ বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিতেছি ! হঠাৎ সে এমনই বয়সের অতিরিক্ত বড় বড় জ্ঞানের কথা কহিয়া কেলিয়াছে যে, সে সকল কথা যেন তাহার মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে ; তাহার সেই জোঁঠতাভব কিছুতেই শোভনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি নাই । এই ভাবের অকাল-পকতায় শিশু-চরিত্র যে একেবারেই উপাদেয় হয় না, তাহা বলা নিশ্চয়োক্তন ।

শিশুকাল হইতেই কতকটা সংযম শিক্ষা দেওয়া যেরূপ অভিভাবকের কর্তব্য, তাহার চরিত্রের সরলতা ও স্বাভাবিকতা নষ্ট না হয়, ইহাও সেইরূপ লক্ষ্য রাখা দ্রষ্ট ।

এই অতিরিক্ত সাবধানতাও বরং ভাল, কিন্তু তাক্ষিয়া ও অনবধানতার শিশুরা অনেক সময়ই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় । মাতার স্নেহ সর্বদাই আশ্রয়, কোন অবস্থায়ই আমরা তাহার ত্রুটি করণা করিতে পারি না ।

কিন্তু সেই স্নেহ তবিশ্যৎ শুভচিন্তা ও শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত না হইলে শিশু-চরিত্রগঠনে সহায় হয় না । অনেক সময়েই অভিভাবকগণ ছেলেদের কোন যত্নই লন না । মাতা রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়াইয়া—নিজ কর্তব্য সমাধা হইল, এইরূপ মনে করেন,—পিতা তাহাকে খুলে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হন ; ইহা ছাড়া শিশু কি করিতেছে, দিনের কোন্ অংশ কি ভাবে ব্যয় করিতেছে, তৎপ্রতি তাঁহাদের একবারেই লক্ষ্য নাই ।

কলিকাতার ছেলেদের প্রধান বিপদ ঘুড়ি ও মার্কেল খেলা । ইহাতে শত শত ছেলে একেবারে মাদী হইয়া বাইতে দেখা যায় । ঘুড়ি লইয়া খেলা

ঘুড়ি ও মার্কেল খেলা ছেলেদের অনেক সময় একটা নেশার পরিণত হয় ;

এই উপলক্ষে পাড়ার যত অকর্ম্মা দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে শিশুর একটা পরিচয় হয়, এই পরিচয়ই অনেক সময় তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়া থাকে ।

আমি অনেক ছেলেকে দেখিয়াছি, তাহারা ঘুড়ি লইয়া বাড়ী হইতে বাহির

হইয়া যায়, খাবার সময় আসিয়া চারিটি খাইয়া স্কুলে যায় এবং তথা হইতে পলাইয়া কুসঙ্গীদের সহিত মিশে, এবং বিকেলবেলায় পুনরায় ঘুড়ি লইয়া বাহির হইয়া রাত্রি হইলে বাড়ীতে আইসে। পিতামাতা ঘুড়ি উড়ান নির্দোষ আমোদ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু এই ঘুড়ির উপলক্ষে বালক একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ছেলে মিশিয়া কোকেন্ ধরে,—এবং আরও একটু বড় হইলে নৈতিক অবনতির কূপে পতিত হয়। পাড়া-গাঁয় ঘুড়ি খেলাতে এক্রপ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা কম, ক্লারণ, সহরের রাস্তার যেক্রপ দৃষ্ট ছেলেদের আড্ডা, পাড়া-গাঁয় তাহা নহে। অনেক সময় তথায় ঘুড়ি নিজেই উড়াইয়া আমোদ বোধ হয়, কুসঙ্গীর দলে পড়িবার আশঙ্কা কম থাকে। মার্কেল খেলা উপলক্ষেও সেই একই বিপদের আশঙ্কা; এ গলি হইতে ও গলি, এইভাবে নানা গলিতে যাইয়া মার্কেল খেলিতে খেলিতে দৃষ্ট ছেলেদের সঙ্গে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, এই সকল আড্ডা বাগুদলে পড়িলে ছেলেদের আর রক্ষা নাই। ছেলেদিগকে অন্ন বয়সে জুজুর ভয় দেখান হয়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত জুজু এই কুসঙ্গ; জুজু কখনও কোন ছেলেকে ধরিয়াছে বলিয়া জানা নাই, উহা শুধু গল্পের কথা; কিন্তু মার্কেল খেলা উপলক্ষে ও ঘুড়ি উড়াইবার কালে যে কত ছেলে প্রকৃতই কুসঙ্গে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত, ইহা গল্পের কথা নহে। আমাদের পাড়ায় এক্রপ কত ছেলেকে নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন শুধু খাবার, সময় দিন ও রাত্রির মধ্যে এক আধ ঘণ্টা বাড়ী আসিয়া মুখ দেখাইয়া যায়, —তারপর যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, এবং দিন-রাত্রি কি করে—তাহার ঠিকানা নাই। এই সকল ছেলেদের মধ্যে একটা বিকট শিশু

শিশু দেওয়া

দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের একজন

অপর সকলকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত হাত মুখে লাগাইয়া কপোল টিপিয়া সেই উক্ত শিশু-ধ্বনি করে,—সেই শ্রামের বানী বাজিয়া উঠিলে অপরগণ সম্বন্ধী বালকেরা কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না, তাহাদের অঙ্গ একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। যে উপায়ে পারে, সে উপায়ে দলে আসিয়া পড়িবে কি পড়িবেই।

এই সকল ছেলেরা অনেক সময়ে ৪।৫ বর্ষ, এমন কি তাহা হইতেও অল্প বয়সে চুরুট খরিয়া থাকে। অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সাবধানে থাকিবেন—ছেলেরা বিনা অপরাধে শুধু পিতামাতার তাচ্ছিল্যে এরূপ নরকে না পড়ে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। এই সকল আড্ডায় মিশিয়া তাহারা অধোগতির নিম্নতম স্তরে নিপতিত হয় এবং সর্বপ্রকার নীতিজ্ঞান-বিবজ্জিত হইয়া পড়ে; অল্পীল ভাষা তাহাদের কথাবার্তার অঙ্গীয় হইয়া পড়ে; মারামারি ও চুরি প্রভৃতি এই সকল আড্ডাধারীর নিত্য-কর্মে পরিণত হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলেরা সারাটা বৈকাল ছাতে উঠিয়া হাঁ করিয়া উর্দ্ধমুখে ঘুড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে; তাহাদের খাওয়া-দাওয়া জ্ঞান নাই, অল্প চিন্তা নাই, কেবল ঘুড়ির স্ততা ধরিবে কিংবা কোন্ ঘুড়ি ছাতে আসিয়া পড়িবার উদ্ভত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে থাকে। যে রোগের কথা বলিয়াছি, এইখানেই সেই রোগের সূচনা। সহরবাসী অভিভাবকগণ এই বিষয় হইতে শিশুকে অল্প বয়সেই দূরে রাখিবেন, নতুবা এই রোগ বৃদ্ধি পাইলে বিপদের সম্ভাবনা। ছেলেদিগকে যতটা সম্ভব গৃহে রাখাই উচিত। কারণ, কলিকাতার রাস্তায় বড় বিপদ, উহা অনেক সময়ে নরককুণ্ডেরই রাস্তা। ক্রিকেট,

ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন

ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার বিপদের আশঙ্কা অল্প।

কারণ, যাহারা এই সব খেলা খেলে, তাহারা মার্কেল-খেলওয়াড় ও ঘুড়ি-চালকদের শ্রেণী অপেক্ষা সাধারণতঃ ভাল। তাহারা একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া খেলে এবং খেলার সময় বাজে গল্প ও আত্মীয়তা করিবার সুবিধা পায় না। খেলার অবসানে তাহারা এতটা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, শেষে বাড়ীতে আসিতে পারিলে বাঁচে। ছঃঃ গৃহস্থগণেরই বিপদের আশঙ্কা অধিক; কারণ তাহাদের ছেলেদেরই মার্কেল ও ঘুড়ি লইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা বেশী! কিন্তু অতি শিশুকাল হইতে যদি মাতা শিশুকে এইরূপ বাহিরে বাইতে নিষেধ করেন এবং কুসঙ্গ হইতে সতর্ক করেন, তবে তাহার সুবুদ্ধির সফল হইবে এবং নিশ্চয়ই শিশু এরূপ বিপদে পড়িবে না। আসল কথা,

মাতার সৰ্বদা শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত,—শিশুকে বাধিয়া রাখিতে বলিতেছি না,—এবং তাহার স্বাভাবিক উত্তম নষ্ট করিতে কেহই উপদেশ দিবে না। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে মাতার স্নেহাতুর সতর্ক-দৃষ্টি রাখা উচিত। বৃড়িটা আকাশে ছাড়িয়া দিয়া খেলোয়াড় অনেক সময় চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—বুড়ি আপন মনে আকাশপথে বিচরণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে মালিক স্ত্রী তাহা বুড়ির গতিবিধি সংশোধন করিয়া লয়। ছেলেকে ছাড়িয়া দিয়াও পিতা-মাতার সেইভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং সে গৃহ-শাসনের বাহিরে যাইয়া না পড়ে, এরূপ ব্যবস্থা রাখা দরকার।

ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ছেলেকে ছাড়িয়া দিবার পূর্বে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, যে দলের সঙ্গে খেলা করিতে দেওয়া হইবে, তাহারা কি রকমের ছেলে। যে সকল ছেলে স্কুলে ও কলেজে ভাল, এবং বাহাদুর ভাল-বলিয়া সুনাম আছে, সেইরূপ ছেলের দলের সঙ্গে মিশিতে দিলে আশঙ্কার কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেটির শরীরের অবস্থা কিরূপ, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি বুকের অবস্থা, অথবা, মাথা ভাল না হয়, যদি ছেলে রক্ত ও ভয়বান হয়—তবে তাহাকে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাইতে না দেওয়াই ভাল। ব্যাডমিন্টন ও টেনিস্ অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমের খেলা, যদি তাহাও ছেলের সহ্য না হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে বৈকালে একক বা কোন ভাল ছেলের সঙ্গে গঙ্গার তীরে আধ ঘণ্টার জন্য ভ্রমণ করিতে দেওয়া ভাল। ফুটবল খেলা অনেক ছেলের পক্ষেই বিপজ্জনক। আমি দুই তিনটি ছেলেকে ফুটবল খেলার ফলে বিষম ব্যাধির কবলে পড়িয়া চিরকালের জন্য অক্ষম হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু বাহাদুর শরীর বেশ ভাল, নাস্ত্র্য স বল, তাহাদের পক্ষে ফুটবল খেলার কোন হানি নাই। কিন্তু এই খেলা সৰ্বদাই একটু সতর্ক হইয়া খেলা উচিত।

বাহাদুর অবস্থা ভাল, তাহারা নিজেদের বাড়ীর উঠানে ক্রিকেট, টেনিস্ ও ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা রাখিতে পারেন।

কিন্তু ছেলেদের বিপদ শুধু রাস্তায় নহে, তাহাদের প্রধান বিপদ অনেক সময়

স্কুলে। স্কুলে পাঠাইয়া পিতা মাতা নিশ্চিত থাকেন, এই জন্ত এই বিপদ আরও বেশী হয়, কারণ, উহা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে। অনেক স্কুলের ছেলে স্কুলের নামে বাহির হইয়া কুসঙ্গীর দলে মিশিয়া পড়ে, সেই কুসঙ্গী শুধু খুশী ও কুচরিত্র নহে, কোন কোন স্থলে গুপ্তবদ্ভবস্বকায়ী ও দম্ভা—ধর্ম ও উচ্চ উদ্দেশ্যের সুখোস্ পরিয়া বালকের সর্বনাশ করিতে দাঁড়ায়। এই জন্ত অনেক সময় বালকের বয়স মূর্খ হইয়া বাড়ীতে থাকা ভাল, তথাপি যদি সর্বদা তত্ত্বাবধান না করিতে পারা যায়, তবে তাহাদের স্কুলে পাঠাইয়া কোন লাভ নাই, বয়স যোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। যে স্কুল বাড়ীর খুব নিকটবর্তী, তাহাতে পড়িতে দেওয়া হউক; তাহার পর ছেলে যোজ স্কুলে কয়টার সময় যায় এবং কয়টার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসে এবং এই সময়ের মধ্যে ক্লাস হইতে পলায় কি না, এ বিষয়ে সর্বদা অনুসন্ধান রাখা হউক। যদি কোন দিন চারিটার বেশী পরে স্কুল হইতে ফিরে, তবে সেই দেরীর কারণ বিশেষ করিয়া জানা এবং সাধারণতঃ বাহাতে আসিতে বিলম্ব না ঘটে, তৎপ্রতি অভি-ভাবকগণের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নিকটবর্তী স্কুলে ছেলে দেওয়ার কথা লিখিয়াছি, তাহার অন্তঃকোন কারণ নাই, তাহাতে সর্বদা ছেলের সন্ধান লওয়ার সুবিধা হয়; এবং পাড়ার স্কুলে পাড়ার ছেলেদের মুখে সর্বদা তাহার গতিবিধি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তত্ত্ব-সংগ্রহ করা সহজ হয়, এই জন্ত উহা লিখিয়াছি। যদি একটু দূরের স্কুল ভাল হয় এবং তথায় শিক্ষক পরিচিত থাকেন, তথায় পিতামাতা নিশ্চিত হইয়া ছেলে পাঠাইতে পারেন, তাহাতে আপত্তির কোন কারণ নাই।

কিন্তু যদি কুসঙ্গে পড়িবার আশঙ্কা থাকে, তবে ছেলে স্কুলে না দেওয়াই ভাল, কারণ, যে ব্যাপারে লাভ নাই—সর্বস্ব-নাশের সম্ভাবনা, এমন ব্যাপারে কে হাত দেয়? মূর্খ ছেলে স্ফুরিত্র ও বিশ্বাসী হইলে তাহারও একটা শুভ-ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়; কিন্তু হাজার বেধাবী হইলেও ছেলে যদি খারাপ হয়, তবে সে একবারে সমাজের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার বুদ্ধি বত প্রথর হইবে, সে তত বেশী ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে।

ছেলে স্কুলে গেল ও নিয়মিত সময়ে স্কুল হইতে কিরিয়া আসিল, কিংবা যথাসময়ে প্রমোশন্ পাইল, ইহাতেই খুব আত্মসন্তোষ হওয়ার যথেষ্ট কারণ নাই। তাহার পড়াশুনায় কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা নিজেরা না পারিলেও কোন শিক্ষিত আত্মীয় কিংবা বন্ধুর দ্বারা সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত; তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া যে ছেলে ছোট একখানি ইংরাজী পত্র লিখিতে ভুল করিবে, কিংবা সংস্কৃতে ছোট ছোট কথার অনুবাদ করিতে অক্ষম হইবে—সে কিছুই পড়ে নাই। সামান্য ভ্রাতৃশ্রমের অঙ্ক কি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সে সমাধান করিতে পারে কি না,—দেখা দরকার। তাহার হাতের লেখা সুন্দর হইয়াছে কি না এবং লিখিতে বর্ণগুচ্ছ হয় কি না, ইহা পিতামাতা অনেক সময়ে নিজেরাই দেখিয়া লইতে পারেন। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বিধাতার আশীর্বাদে ছেলের যেমন বয়স স্বাভাবিক নিয়মে বিনা চেষ্টায় বাড়িয়া বাইতেছে, স্কুল-মাষ্টারের অনুগ্রহে সে বিনা চেষ্টায় এবং বিনা গুণে সেইরূপ প্রমোশন্ পাইয়া বাইতেছে; তার পর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার সেই শ্রীবৃদ্ধি ক্ষান্ত হইয়া গেল। স্কুলের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সে কিছুতেই আর কলেজে ঢুকিবার পথ পাইল না।

অনেক সময় যখন পিতামাতা কত কষ্টে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়াও ছেলেদের পড়াশুনায় খরচ ঢালাইয়া থাকেন, তখন কষ্টাক্ষিত সামান্য আয়ের বৃহৎ অংশ একবারে নিষ্ফল হইয়া কেন পড়িবে, এটা কি দেখার বিষয় নহে? এই ব্যয় করিয়াই কোন কোন ছেলে জীবনে চরমোন্নতি লাভ করিয়া সমাজের ভূষণ-স্বরূপ হইতেছে, অথচ অধিকাংশ স্থলে মনস্তাত্ত্বিক থাকি সবেও ছেলের ভাবী উন্নতি নিষ্ফল হইয়া পড়িতেছে; পিতামাতা এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন, ইহাই আমার বক্তব্য। ইহা নিশ্চয় জানিবেন, পরের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি এ সংসারে চলে না। নিজের দেখিবার দায়িত্ব না থাকিলে অজ্ঞাতসারে যে ক্ষতি সংসারের উপরে আসিয়া পড়িবে, তাহা অনিবার্য।

মেয়েদের বিভাগে বাইরা কুসঙ্গীর হাতে পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু

তাহাদের অনেক সময় শিক্ষার উন্নতি ভাল হয় না। শিক্ষকের এবং শিক্ষা-প্রণালীর দোষেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক মেয়েদের স্কুলে যাওয়া সময় স্কুলে ৫ ঘণ্টা আবদ্ধ থাকার ফলে মেয়েদের ক্ষুধা কমিয়া যায়, তাহারা রোগা হইয়া যায়। রূপলাবণ্য যখন মেয়েদের একটা প্রধান মূলধন, তখন তাহা ধোয়ান উচিত নহে।

গৃহিণী বতটা শিক্ষিতা হইবেন, সেই পরিমাণে শিশু-সন্তানের উন্নতিসাধনের যোগ্য হইবেন। তিনি সকল বিষয়েই শিশুসন্তানের ভাবী জীবন স্মরণ করিয়া এই সমস্ত বিষয়ে উন্নতির অমুকূল শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। অনেক গৃহিণীই ছেলেদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন না। শিশু যখন হাঁটিতে শিখিল, তখন হইতেই তাহার একটু একটু শিক্ষার দরকার। অনেক সময়েই দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে-মেয়েদেরও অভ্যাসের দোষে বিছানা শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। গৃহিণী অনায়াসে এ সম্বন্ধে ছেলেদের অভ্যাস ভাল করিয়া দিতে পারেন। ঠিক সময়ে শিশুকে শয্যা হইতে নামাইলে তাহার অভ্যাস শীঘ্রই সংশোধন হইয়া

যাইবে। যিনি সংসারের জন্ত বহু শ্রমসাধ্য কার্য্য শয্যা সম্বন্ধে সাবধানতা,

করিতেও কুস্তি নহেন, যিনি রাতাধন উনানের জলন্ত অগ্নির ধারে বসিয়া গাঁহিয়া সাধনা করিতেছেন, তিনি একটু সামান্যরূপ সতর্ক থাকিলেই বিছানাগুলি সময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, এবং ছেলেদেরও স্বভাব প্রশংসাই হইতে পারে। সামান্য ব্যাপারে এই অনবধান-জনিত ক্ষতি ও বিড়ম্বনা কেন হইবে?

অনেক সময় দেখা যায়, গৃহিণীর পরিশ্রম-শক্তি বরে বাহিরে সর্বত্র প্রশংসিত, অথচ তিন বৎসরের শিশু একটু জল খাইতে চাহিল, তখন তিনি তাহাকে কলসী দেখাইয়া বলিলেন, “বা, ঐ কলসী হইতে গ্লাসে ভরিয়া থা।” শিশু

অবিত্যর

কলসী বা কুঁড়া হইতে জল ভরিবার চেষ্টায় কলসীটি উপড় করিয়া সমস্ত জল ফেলিয়া দিল, কিংবা কুঁড়াটি ভাঙিয়া ফেলিল; তখন গৃহিণী নির্দয়ভাবে শিশুকে প্রহার করিলেন। যে, যে

কার্যের উপযুক্ত নহে, তাহাকে তাহার ভার দেওয়া অসম্ভব। অনেক স্থলে দেখা যায়, শিশুগণ কল হইতে জল খাইতেছে বা তথায় যাইয়া আঁচাইতেছে। কল হইতে জল খাওয়া কোন সময়েই উচিত নহে। একটু বেশী বয়স হইলে বালকবালিকা কলে যাইয়া নিজের আঁচাইতে পারে। কিন্তু ৩৪ বৎসরের শিশুকে কলের ধারে যাইতে দেওয়া অনুচিত। তাহার জল বাহির করা বেশ একটা খেলার বস্তু মনে করিয়া দিনরাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কলের কাছে যায়। আঁচাইবার চেষ্টায় জলে তাহাদের মাথা ভিজ়ে এবং তাহাদের জামা ও জ্যাকেট জলসিক্ত হইয়া থাকে। সেই জল মাথার শুকাইয়া যায়, এবং ভিজ়া কাপড় গার শুকাইয়া,—গৃহিণীর অনেক সময় তাহা দেখিবার অবকাশ হয় না। ফলে যখন

•
জলের কলে

ছেলের জ্বর বা নিউমোনিয়া হয়, তখন গৃহিণী সংসার শূন্য দেখিয়া লাঞ্ছনাত্মক দেবতার নিকট মানত করেন।

এবং আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিনরাত্রি যন্ত্রের মত রোগীর শব্দায় বসিয়া শুশ্রূষা করিতে থাকেন। সামান্য ক্রটির জন্য যে এইরূপ অচিন্তিত বিপদ আসিতে পারে, ইহা তাঁহার জানা উচিত।

ছেলেদের বৃত্তিতে ভিজ়া, কলের জলে ভিজ়া, এই 'দুইটি বিষয়ে সাবধান রাখিলে অনেক বিপদ ও ডাক্তারের খরচ বাঁচিয়া যায়; মাতার পক্ষে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া অতি সহজ। তাঁহার যদি এ বিষয়ে লক্ষ্য থাকে, তবে ছেলের প্রথম হইতেই এ বিষয়ে নিজেরা সতর্ক হইবে।

ছেলে মেয়েরা বাহাই করুক না কেন, তাহা প্রশংসনীয়ভাবে করে কি না, তাহা মাতা দেখিবেন। তাজিল্যের সঙ্গে কাজ করিতে অভ্যাস করিলে, পরিণামে নিম্নার ভাজন হইতে হয়। হাতের লেখাটি বেক্রপ যন্ত্রের সহিত বিগুচ্ছ

•
কাধে বস

ও সুন্দর করা দরকার, সংসারের সকল কাজের মধ্যে তেমনই নিপুণতার প্রয়োজন। মেয়েটিকে এক মাস

জল আনিতে বলা হইলে, সে মাসের জল ফেলিতে ফেলিতে লইয়া আসিল; কিংবা মাসের গায়ে মাটি লাগিয়া আছে, তাহা লক্ষ্য করিল না। গৃহিণীর এ সকল

বিষয়ের সূচনাতেই সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, এই তাজ্জিয়া গুরুতর অপরাধ। দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া মেয়েকে সংসারে খুব খাটাইতে হইবে, আমার বলার ইহা উদ্দেশ্য নহে। যে কাজটুকু সে করিবে, তাহা যেন শোভন হয়, তাহাতে তাজ্জিলোর ভাব না থাকে, এই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। পাণ আনিতে বলা হইলে, সে হাতে করিয়া পাণটি লইয়া আসিল। বা' হোক, একখানা রেকাব বা পাণের বাটা বা ছোট পাত্র, এমন কি, কিছু না থাকিলে একটা শালপত্রের করিয়া তাহা আনিলে শোভন হয়। গৃহস্থের গৃহে কত্নাকে অনেক সময়ে ঘর ঝাঁট দিতে হয়। কেহ কেহ একরূপ ভাবে ঝাঁট দেয় যে, গৃহকোণে অনেক আবর্জনা ও ময়লা থাকিয়া যায়;—অসম্পূর্ণ কাজ একেবারেই ভাল নহে। উহাতে যে নিপুণতার অভাব ও মনোযোগের ত্রুটি থাকে, তাহা উত্তরকালে ভাল গৃহস্থালীর অন্তরায় হয়। এষ্ট জ্ঞাত যে কাজই করিবে, তাহা নিপুণভাবে সর্কাদ-সুন্দর করিয়া করার যে শিক্ষা, তাহাই শৈশব হইতে গ্রহণীয়। কচি হাতের ছোট কাজে যদি একটু মনোযোগ ও যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তাহা সেই কচি হাতের সোপার বাগার মতই উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখায়।

দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে' নয় দশ বৎসরের বালিকা হয় ত ছয় মাস কি এক বৎসর-বয়স্ক ভাই কি বোনকে অনেক সময়েই কোলে করিয়া থাকে; ইহা না করিলে সংসার চলিবে কেন? মা হয় ত ভাই-বোন কোলে রাখা রাখিতেছেন কিংবা সংসারের নানা কাজে অক্লান্ত হইয়া খাটিতেছেন, শিশু ভাই বা বোনটিকে কে রাখিবে? কিন্তু সর্বদা ছেলে কোলে করিয়া থাকিলে দেহশ্রী কখনই রক্ষিত হইবে না,—যে সকল মেয়েকে একরূপ করিতে হয়, তাহার প্রায়ই ক্লম ও রোগা হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে উপায়ান্তর নাই, আমি শুধু এ বিষয়ে গিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শিশুরক্ষার শ্রম: সর্কাপেক্ষা বেশী; অল্প সময়ের জ্ঞাত উহা আনন্দকর; কিন্তু সারাদিন এই শ্রমের ভার থাকিলে বালিকার দেহ কখনই পুষ্ট হইতে পারে না। অনেক গৃহে বালিকারা এই শিশু-রক্ষার নিযুক্ত থাকে;

এখনও দেখা যায় যে, তৎসম্বন্ধে সামান্ত ত্রুটি হইলেই সেই কুসুম-কোমলা ধাত্রীটি, পিতা বা মাতার প্রহারে কর্করিত হয়, সেই দৃশ্য বড় কষ্টের। পিতামাতা বালিকাদিগকে এ বিষয়ে যতটা ছুটি দিতে পারেন, ততই ভাল, অন্যর এতদতি-রিক্ত আর কিছু বলিব্যয় নাই।

দরিদ্র-সংসারে শুকনা কাপড় গুছাইয়া রাখা, শয্যা প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা প্রভৃতি কার্যের তার বালিকাগণের উপর দেওয়া যাইতে পারে। গৃহিণী

সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন, বালিকা এ সকল কাজ কি
কাজ করা নয়,
কাজ শিক্ষা।

ঠিক গুছাইয়া বথাস্থানে রাখা হইয়াছে কি না, বিছানা পরিষ্কারভাবে পাতা হইয়াছে কি না, পরিবেশনের সময় বালিকা ধপাৎ করিয়া ডালের বাট কেলিতেছে কি না; কিংবা হাতার করিয়া ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের সময় উহা চারিদিকে এবং ভোজনকারী মহাশয়ের গায়ে ছিটাইয়া পড়িতেছে কি না; কেহ লবণ চাহিলে বালিকা উক্ত সামগ্রী পরিমাণের চেয়ে ঢের বেশী দিয়া গেল কি না,—কেহ ঠৈ খাইতে চাহিলে বালিকা ধান বাছিয়া উহা দিল কি না,—এবং কাগজীনেবু কাটিয়া দেওয়ার সময় কর্তৃত্ব অংশের ভিতর বীজ রহিয়া গেল কি না, গৃহিণী চিকের আড়াল হইতে বা জানালা দিয়া সর্বদা তাহা লক্ষ্য করিবেন। মনে করিতে হইবে, বালিকা কাজ করিতেছে না,—সে শুধু কাজ শিখিতেছে। গৃহিণী সর্বদা চিন্তা করিবেন যে, বালিকা বাহা কিছু করিতেছে—সকলই তাহার ভাবী জীবনের শিক্ষা! সুতরাং যে সকল ত্রুটি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহা শৈশবেই সংশোধিত হয়, একান্ত তিনি সর্বদা চেষ্টিত থাকিবেন।

ছেলেদের ছোটকাল হইতেই, মাতা পরিষ্কার থাকার অভ্যাস করাইবেন,

পরিষ্কার থাকা

জামার ধূলা লাগিলে যে জামাটা ধরাপ হইয়া যায়—

ইহা তাঁহার ইজিতে ছেলেরা বুঝিবে,—নতুবা ক্রমাগত জামা-কাপড় বাড়িতেছেন, কাটিতেছেন, ও বকিতেছেন, একরূপ করার পদ্ধতি

হয় মাত্র। আমি একটি দেড়বৎসর-বয়স্ক শিশুকে দেখিরাছিলাম, তাহার গায়ে সামান্য একটু কান্না কি ময়লা লাগিলে সে অস্পষ্ট ভাষায় তাহার দিকে লক্ষ্য আকর্ষণ করিয়া, যে পর্য্যন্ত সে ময়লা ধোয়াইয়া না দেওয়া হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত হাত কি পা যেখানে উহা লাগিয়া আছে, তাহা বাড়াইয়া দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন তাহার ছয় বৎসর বয়স, তখন তাকে আবার দেখিলাম, তখন সে একটা ধূলি-কাদার পুতুল সৃষ্টিয়া আছে, তাহার কাপড়ে স্থানে স্থানে তৈল ও কালী মিশিয়া ধোপার অসাধা হইয়া আছে, তাহার মাথার চুলে তেলের গান জমিয়া জটা ধরিয়া গিয়াছে, এবং ফরসা পা দুখানিতে স্থানে স্থানে বহুদিনের ধূলি-বালিতে কাল বর্ণের ছোট বড় অক্ষর রেখা হইয়া আছে। একুপ হইবার কারণ কি? তাহার স্বাভাবিক পরিষ্কার থাকার একটা জ্ঞান ছিল,—কিন্তু সে সংসারে ধূলি-বালুতে গড়াগড়ি বাইত, সুতরাং তাহার জন্মের সংসার সেই সংসারে বেশী দিন ভিত্তিতে পারিল না।

কাপড়ে সামান্য একটু ময়লা লাগিলেই শিশুর দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করা উচিত,—এবং তাহা তাহার সম্মুখে মুছিয়া দিয়া বা ধুইয়া ফেলিয়া তাকে বুঝান উচিত যে, কাপড় ময়লা করা ভাল নহে! ইহাতে ক্রমশঃ সে সতর্ক হইবে। অনেক বালিকার আঁচল প্রায়ই ধরাশায়ী হইয়া আছে, সেই অক্ষয়-লগ্ন ধূলিতে অঙ্গ মলিন হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী বালিকার দস্তধাবন হইতে স্নানের সময় পর্য্যন্ত, তাহার অঙ্গ পরিষ্কার রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। পা দুখানি বেশ পরিষ্কার থাকে, গ্রীবা ও কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ময়লা জমিয়া না থাকে,—তৈল ও জলের দ্বারা দেহটি ঝকঝকে ও পরিষ্কার থাকে, এই সকল দেখা উচিত; অনেক ছেলে-মেয়ের গায়ে একুপ ময়লা জমিয়া থাকে যে, তাহা আবিষ্কারের পর ক্রমাগত আট দশ দিন সাবান ধুইয়াও তাহা তুলিতে পারা যায় না।

কোন কোন গৃহিণী গৃহ পরিষ্কার রাখিবার জন্য উৎকট শ্রম করিতেছেন, একুপ দেখা যায়। একবারের জরিগার দশবার ঘরে কাঁট পড়িতেছে। এই কাঁট দিয়া গেলেন, আবার ছেলেরা কাগজ ছিঁড়িয়া, কালী-জল ফেলিয়া ঘর

অপরিষ্কার করিয়া গেল ; গৃহিণী ছেলেদিগকে গালি দিতে দিতে আবার কাঁট দিয়া গেলেন, পুনরায় আসিয়া দেখেন, ধোত কাপড়ের বস্তা নামাইয়া শিশুরা এদিকে ওদিকে কাপড় ছুড়াইয়া ফেলিয়াছে, পুনরায় টুকরা কাগজ ছিঁড়িতেছে এবং গ্লাস ও আপ-খোড়ায় মাটি মাখিয়া উপড় করিয়া রাখিয়া দিতেছে। এই-রূপে গৃহের আবর্জনা কিছুতেই কমিতেছে না, বানের জলের মত ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। গৃহিণীর নিজের যদি গৃহের পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টি থাকে, তবে ছেলে-মেয়েরা তাহার চোখের ইঙ্গিতে সাবধান হইয়া যাইবে ; বাহাতে গৃহ অপরিষ্কার হয়, এরূপ কাজ কখনই করিবে না,—কাগজ ছেঁড়া, ফুল-বালির সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা-স্থাপন, কালোফেলা প্রভৃতি রোগ তাহা হইলে একেবারে সারিয়া যাইবে। শুধু বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া বালকবালিকার পৃষ্ঠদেশ বাস্তবের ঢোলের মতন সময়ে অসময়ে পিটিলে যে সংশোধন হয়, এ বিশ্বাস আমার নাই। স্নেহ ও যত্নে প্রকৃত সংশোধন হয়,—শাসন দ্বারা যে সর্বদা স্থায়ী শিক্ষা হয়, তাহা মনে হয় না। যুহুস্বরে নিজের কষ্ট বুঝাইয়া যদি জননা শিশুকে সাবধান করেন, তবে সে নীরবে মাতার কথা বুঝিবে ও হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। কারণ, মা যদিও শিশুর চক্ষের জল অনেক সময়েই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, মাতার চোখের জল শিশুর প্রাণে বড় লাগে। স্নেহসিক্ত অশ্রুর সঙ্গে মাতা ধীরে ধীরে যে শিক্ষা দান করেন, তাহা কখনই নিফল হইবার নহে। এজন্য অবিরত গৃহ পরিষ্কার করার শ্রম ও বিরক্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, বাহাতে গৃহ মোটেই অপরিষ্কার না হয়, সেই দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা উচিত। গৃহ অপরিষ্কৃত হইলে কাঁটার সাহায্যে তাহা শোধরাইয়া লইব, এই ভরসা না করিয়া, যাহারা গৃহ অপরিষ্কার করিয়া থাকে, তাহাদের স্বভাব সংশোধন করা উচিত। হৃদ্যন্ত ছেলেকে আমি ভয় করি না, যাহার স্বভাব মাতাপিতার তাক্ষিল্যে বিগড়াইয়া গিয়াছে, সেই ছেলেকেই ভয় করিতে হয়।

ছেলেদের আর একটা স্বভাব এই যে, যখন বাস্তবের জিনিসপত্র আসিবে, তখন যাইয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করা ;—হয় ত কেহ একটা আন্ত আলু খাইতে

বসিল ; কেহ বা একটা বেগুন টানিয়া কাটিতে বসিল ; কেহ বা রন্ধনের সময়
মায়ের কাছে বসিয়া এটা খরিয়্যা টানিয়া, ওটা ভাজিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

যদি ছেলে-মেয়েকে তখন সে স্থান হইতে দূরে রাখিতে
জিনিসপত্র লইয়া খেলা

অসুবিধা হয়, তাহা হইলে মাতা তাহাদিগকে
তাহাদের শক্তি অনুসারে কার্যে নিযুক্ত রাখিবেন ; কাহাকেও কোন জিনিস ঠিক
জারগার রাখিতে বলিবেন, কাহাকেও বা আর একজনের হাতে কিছু দিয়া
আসিতে বলিবেন ; এইভাবে তাহাদের স্বাভাবিক উত্তমের একটা ক্ষেত্র আবিষ্কার
করিলে, তাহাদের দ্বারা কিছু কিছু কাজও হইবে, তাহারাও কার্যের একটা
প্রণালী শিক্ষা পাইবে এবং মাতাও আর বিরক্ত হইবেন না। যদি কোন মেয়েকে
ভাঁড়ার হইতে কিছু আনিতে বলা হয়, তবে লক্ষ্য করিতে হইবে, সে জিনিসগুলি
—যথা ডাল কি চাল—ছড়াইতে ছড়াইতে আনিতেছে কি না, কিংবা ভাঁড়ার-
ঘরে সে মুড়ি-মুড়কি এক করিয়া, চাল-ডাল ছিটাইয়া, একাকার করিতেছে কি
না ; গৃহ-কর্মে যদি অতি অল্প বয়স হইতে সাবধানতা শিক্ষা না হয়, তবে গৃহিণী-
পদে অভিষিক্ত হইয়াও সেই স্বভাবের আর পরিবর্তন হয় না। এই সকল ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র বিষয়ে এজন্ত সূচনা হইতেই সুশিক্ষার প্রয়োজন।

আমাদের দেশে “গুচিবানু” বলিয়া একটা ব্যাধি আছে ; কোথায় একটা ভাতের
মত অপবিত্র জিনিসের সঙ্গে বস্ত্রের স্পর্শ হইল ; কোন নৌজাতীয় লোকের

পায়ের জলে ধরণী অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, পাছে সেই
গুচিবানু

অপবিত্র জারগায় নিজের পা পড়ে, যে কাপড় পরিয়া
পুরুষেরা বাহির হইতে আসিয়াছেন, হঠাৎ যদি তাহার কোন অংশ নিজের আঁচলে
ঠেকিয়া যায় ; কোন কাক মুসলমানের বাড়ী হইতে উড়িয়া আসিয়া স্বীয় পবিত্র
রাশ্মিঘরের উপর বসিয়াছে, এরূপ বিপৎপাতে কোন কোন মহিলা একেবারে
বিহ্বল হইয়া পড়েন। মা গঙ্গা অবিরত তাহাদের সেবার লাগিয়াই রহিয়াছেন,
অথচ কিছুতেই তাহারা স্বীয় গুচির আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।
এই গুচিবানু ঝাঝা সত্ত্বেও গৃহ বাস্তবিক পক্ষে কিসে অপরিহার্য হয়, তৎসম্বন্ধে

তাঁহারা একান্ত উদাসীন, গৃহের মধ্যে যদি একটা পচা গোময়ের স্তূপ থাকে, তবে তাঁহারা পরম পবিত্র ভাবে অনুভব করেন; গৃহের কোন জিনিস কিরূপ অন্যদরে মাটিতে পড়িয়া ভাঙিতেছে বা পচিতেছে, সে দিকে তাঁহাদের মোটেই লক্ষ্য নাই। শুচির এই বিকৃত আদর্শ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে গৃহ প্রকৃতপক্ষে পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কেহ কেহ দৈবক্রমে একটা ভাত বা বাঁজনের ছিটা বৃষ্টি গার লাগিল, এমন একটা অমূলক সন্দেহেও লেডি মাক্বেথের হ্রাস কেবলই হাত ধুইয়াও যেন সোয়াস্তি পাইতেছেন না, অথচ ছেলেরা কাদা মাখিয়া কালী-বালিতে অঙ্গরাগ করিতেছে, সে দিকে দৃকপাত নাই; এই অবস্থা ভাল নহে।

অনেক ছেলের দেয়ালে খড়ি বা কয়লা দিয়া লেখার রোগ আছে; কেহ বা লৌহনির্মিত কিছু দিয়া দেয়ালে আঁচড় কাটে; কেহ কেহ বা বাস্ক দেখিলেই

কু-অভ্যাস

তাহার তালার মধ্যে কাটি চালাইতে থাকে; অথবা যে কোন একটা চাবি দিয়া তালা খুলিবার চেষ্টা করে, এই সকল অভ্যাস খারাপ; যাহাতে এরূপ না করে, তজ্জন্ত সূচনাতেই সাবধানতা আবশ্যক; কারণ, এই সকল অভ্যাস বহুমূল হইলে তাহারা সংসারের জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া এবং ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে।

মশারির উপর কোন জিনিস রাখা একেবারেই উচিত নহে। অথচ অনেক বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মশারির উপরটা একটা বড় বাস্কের মত ব্যবহার করা হয়; তাহার ফলে দিনরাত্র ছেলেরা মশারি খরিয়া টানাটানি করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলে। মশারির উপর জিনিস রাখিলে ছাদের সেই অংশটা নীচু হইয়া

মশারির উপর জিনিস
রাখা

পড়ে, এবং খুব ছোট ছেলেরাও তাহা হাতে নাগাল পায়, এবং জিনিস পাড়িবার চেষ্টায় শুধু আমোদ করিবার ভ্রম মশারির ছাদ লইয়া এইরূপ উদঙ ক্রীড়া

করে যে, ঘেরগুলি নীচে পড়িয়া যায় এবং তাহাদের অঙ্গপ্রাণ কিছুতেই সে দৌরাখ্য সহ্য করিতে পারে না।

খাট কিংবা তক্তাপোষের উপর শরনের সময় ভিন্ন অল্প সময়ে ছেলেরা যেন না উঠে ; অনেক ছেলের চৌকি, খাট ও তক্তাপোষ ঝাঁকা কিংবা তাহাদের উপর খুব উত্তমের সহিত নৃত্য করা একটা অভ্যাস।

এব্য সামগ্রী নষ্ট করা বলা নিম্নরোজন ইহাতে ঐ সকল জিনিসের আয়ু অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়। কেহ বা ষটি-বাটিকে খেলার বস্তুতে পরিণত করিয়া ধপাস করিয়া তাহা উপরতলা হইতে নীচে ফেলিয়া থাকে, সিমেন্ট-মাটি বা পাথরের উপর পড়িয়া উহা কুন্ড-মুন্ড হইয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাঁসার খালা-বাটির ফেরিওয়াল। এই জন্ত কোন কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই আমন্ত্রিত হইয়া আনাগোনা করিয়া থাকে। অনেক সময় ভ্রূ-পরিবারের সামাজ্য আরে এই সকল বাজে খরচ মিটাইয়া কিছুতেই সংকুলান হয় না। আমি শুধু সামাজ্য কয়েকটা দোষের উল্লেখ করিলাম। বাহাতে গৃহের দ্রব্য-সামগ্রীর ক্ষতি হয়, তৎপক্ষে উই আর ইন্দুরের মত শিশুর দল প্রায়ই লাগিয়াই আছে, তৎকালে এই যে, উই আর ইন্দুরকে শিখান যায় না, কিন্তু শিশুদিগকে অনায়াসে বস্ত্র দ্বারা সকল বিষয়েই সং-শিক্ষা দিয়া ভাল করা যায়।

অনেক গৃহিণী কোন পরিশ্রমেই পরায়াস করেন না, অনেক অকাজে রাতদিন খাটেন ; কিন্তু বাহাতে পারিবারিক উন্নতি হয়, তৎপক্ষে একেবারে উদাসীন। ছেলেমেয়ে তাহাদের স্বভাব-সুলভ ক্রীড়ানীলতায় এটা-ওটার জন্ত ব্যয়না ধরে, তখন বিরক্তির সহিত নির্দয় ভাবে প্রহার করিয়া থাকেন ; কিংবা তাহাদের খুব ভায়-সম্মত দাবী সহ না করিয়া তাহাদিগকে গালাগালি দেন, অথচ যে সকল বিষয়ে সংশোধন হইলে তাহাদের প্রকৃত উন্নতি হয়, সেগুলি দেখিয়াও দেখেন না। পূর্বে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার অনেকটার দিকে তাঁহারা কতকটা উদাসীনতা দেখাইয়া থাকেন। কোন কোন গৃহিণী রান্নার কার্য লইয়া এত ব্যাপৃত থাকেন যে, অল্পদিকে মোটেই তাঁহার লক্ষ্য নাই ; বয়ঃ-ভরকারী-ব্যাঞ্জনাদির সংখ্যা কমাইলে কোন ক্ষতি নাই ; শিশুদিগের প্রতি একটু বস্ত্র, দাবীর দরকারী দ্রব্যাদির প্রতি একটু মনোযোগ ও সংসারের চারিদিকের

অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি-রাখিয়া এই সকলের দিকে একটু যত্নবান্ হওয়া সর্বদা শুভকর।

শিশুদিগের শিক্ষা ও নৈতিক উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে গৃহেই নানারূপ আমোদ ও কোতুকে রাখিতে হইবে। না হইলে তাহাদের জীবন শুষ্ক হইয়া পড়িবে। ব্যায়ামের জন্ত যে সকল ক্রীড়া বা আমোদ প্রমোদ ভ্রমণাদি আবশ্যক, তাহা অবশ্য-কর্তব্য; তাহা ছাড়া গৃহে ছবির বই হইতে ছবি দেখান, ও নানারূপ গল্প বলা ও গান-বাঁজের চর্চা দ্বারা তাহাদের মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। উপদেশপ্রদ পৌরাণিক আখ্যানিকা শুনাইয়া তাহাদের মনে উচ্চভাব জাগ্রত করিতে পারিলে ভাল হয়। আগেকার দিনে সেই সকল ব্যবস্থা ছিল; তখন ধর্ম্মমূলক যাত্রা ও কথকথা এবং রামমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল প্রভৃতি কীর্তন, পল্লীর শিশুগুলির হৃদয় সরস করিয়া রাখিত। প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে যে সকল পূজা-অর্চনা হইত, তাহাতেও তাহারা নির্ম্মল আমোদ পাইত। চিন্তা সরস থাকিলে দেহের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং রস-বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি উচ্চভাবের সংযোগ থাকে, তবে মশিকাক্ষনের যোগ হয়।

আমাদের সেই উৎসব ও আনন্দ-নিলয় প্রাচীন সমাজ এখন তাকিয়া গিয়াছে; যে সকল আমোদ ও উৎসব আমরা সভ্যতার সোপানে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়াছি, তাহার স্থলে শিশুদিগকে আমরা কি দিতে পারিয়াছি? থিয়েটার। আমরা সমস্ত প্রাচীন বৈভব ত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্ত হইয়াছি। যে সকল প্রাচীন উৎসবে ভক্তি ও স্নেহ-মমতার আদর্শ জাগিয়া উঠিত—বাহা চোখের জলের সঙ্গে শুনিতাম ও দেখিতাম, তাহার স্থলে আমরা থিয়েটার পাইয়াছি। এই থিয়েটার-সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না। বর্ত্তমান বঙ্গীর থিয়েটারগুলির রুচি ও প্রলোভন তরুণবয়স্ক বালক-বালিকা-গণকে যে পথে লইয়া যায়, তাহার শেষ কোথায়, আপনারাই কল্পনা করুন। এই দিকে শিশুদিগের গুরুত্ব নাই, গৃহিণীগণ তাহা দেখিবেন। সে ভূত একবার কাঁধে চাপিলে নামান শক্ত। যদি ধর্ম্ম বা উচ্চভাবমূলক কোন নাটক

অল্পকালের জন্ত ছেলেরা অভিনয় করিতে পারে, তবে ততদূর অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, অনেক সময় তাহা নির্দোষ আমোদের জিনিসই হইয়া থাকে ; কিন্তু এই সূত্রে যদি সাধারণ নাট্যালাপ্তুলির অভিনয় দর্শন করিয়া যোগাতালাভের চেষ্টা হয়, তবে সেই শিক্ষার চেষ্টা অনেক সময় বারাত্মক হইয়া উঠিবে।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় কোন কবি এক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাব এই যে, “হে মন, যদি নৃত্যই দর্শন করিবে, তবে বনে যাইয়া ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া আইস ; আলোকমালাসজ্জিত আসর দেখিবার ইচ্ছা হইলে নক্ষত্রবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের সভা দেখিয়া লও ; যদি গান শুনিবে, তবে কোকিলের কাকিলর মত মিষ্ট কি আছে ? এই সকল দেখিতে বা শুনিতে হইলে বৃথা অর্থক্ষয় হয় না, এবং আসনের তারতম্যচৈতু শ্রোতা বা দর্শকের মনে জাগার উৎপত্তি হয় না ; প্রকৃতির উৎসবের অস্বারিত দ্বার, সেখানে রাজা-প্রজার তুলা অধিকার।”

প্রকৃতি চারিদিকে নিতা যে মহোৎসব করিতেছেন, তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জন্ত চক্ষু ও হৃদয়ের শিক্ষার দরকার, সুতরাং কবি বাহা বলিয়াছেন, তাহা ভাল ; কিন্তু মনুষ্যের সঙ্গীত ও মনুষ্যের নৃত্য দেখা পাণ, এ কথা কেহ স্বীকার করিবেন না। গানে ও নৃত্যে ভগবানকে পাওয়া যায় ; রামপ্রসাদ গান করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব নৃত্য করিয়া তাঁহাকে পাইয়াছিলেন।

আমার বলিবার উদ্দেশ্য, যে সকল আমোদের পরিণাম বিনাশ বা ক্ষতি, তাহা হইতে শিশুগণকে রক্ষা করা দরকার। কোন্ কোন্ আমোদ বা খেলায় শিশুদিগের দুর্গতি হয়, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না, কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে রহিয়াছে। চিত্রশূণ্ডের খাতায় তাহাদের অপরাধের কথা লিখিত থাকুক বা না থাকুক, অনেক দুঃখার্ভা জননীর বুকে ও নিরাশ পিতার মর্মে সেই সকল কাহিনী লিখিত রহিয়াছে।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা গোড়াকার কথাটা বলি নাই, সকল শিক্ষার উপর ধর্ম-শিক্ষা। শিশুকালে এই মূলধন পাইলে সংসার-বাজা সুখের হইবে। আগে আমরা প্রাতে ভগবানের নাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম, তাঁহার নাম

লিখিয়া অপর লেখাপড়া গুরু করিতাম,—সে সকল পাঠ এখন উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু মহিলাগণের মধ্যে এখনও অনেক পরিমাণে ধর্মভর আছে, আমার এই বিশ্বাস। যাঁহারা সংসারের জন্ত নিঃস্বার্থ হইয়া কেবল

ধর্ম-লিখা

স্বামী, পুত্র ও অপরের জন্ত খাটেন,—নিজে না খাইয়া পরকে খাওয়ান, এবং সেই স্বামী, পুত্র যখন তাঁহাদের মধ্যে আঘাত করিয়া অসহ্য কষ্ট দেন, তখন যাঁহারা কিছু না বলিয়া তাহা নীরবে সহ্য করেন,—কখনও বা বুক-ভাঙ্গা কষ্ট সহিতে না পারিয়া অকালে ফুলটির মত ঝরিয়া পড়েন, সেই মহিলাকুল যে তাঁহাদের নীরব দুঃখ-কষ্টের ভার সহিতে সহিতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানকে ডাকিবেন এবং যখন তখন চোখের জলে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহারই পাদপদ্মে শরণ লইবেন, ইহা বিচিত্র কথা নহে।

আমাদের দেশের রমণীরা বিনা অপরাধে শত শত দুঃখ পাইয়া থাকেন। স্বামী সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিলেন; কত চোখের জল কত অনুনয়-বিনয় করিয়াও তিনি তাঁহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না;—তারপর হুদ্দিন আসিল, বৎসামাত্র খাদ্য পতিপুত্রের জন্ত প্রস্তুত করিয়া নিজে অপরের অলক্ষ্যে ক্রমাগত উপবাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কাহাকে ডাকিয়া থাকেন! বিনি নিজের অঙ্গ-অঞ্চল দিয়া মারের মতন গোপনে আসিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দেন, দুঃখের সময় তাঁহারই শরণ লইয়া তিনি সাবুনা পাইয়া থাকেন। এই ভাবে শাস্ত্র না পড়িয়াও ভগবানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। উপবাস ও হুচ্চিকার শরীর ক্লেশ, সমস্ত সংসারের ভার তাঁহার উপর। ছেলে খারাপ হইয়া গিয়াছে, দুই দিন বাড়ী আসে নাই; স্বামীকে বলিতে গেলে তিনি মুখ ভার করেন ও কুপুত্রের নাম শুনিতে চান না,—কিন্তু মাতৃস্নেহ কি কোন কালে ভ্রাতৃ-অভ্যর্থনের বিচার করিয়া থাকে?—তিনি ছহাতে চক্ষের জল মুছিয়া তখন কাহার শরণ লন?—অপরের অদৃষ্টভাবে কাহার পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া দেন? অস্ত্রাঘাতের স্বামী গালি দিয়া গেলেন, কারণ, সাহেবের অপমানে তাঁহার মেজাজ কটু হইয়া আসিয়াছে; হয়ত এত কষ্টের সন্ধান কোন সামান্য ক্রটি ধরিয়া কোন

ছেলে ভাত না খাইয়া উঠিয়া গিয়াছে,—হয়ত সকলকে খাওয়াইয়া নিজের খাইবার বাজনাদি কিছু নাই, ভাতেও কম পড়িয়াছে, এ সমস্ত কাহাকে অবিরত শ্রবণ করিয়া তিনি সহ্য করেন? তাঁহার হৃৎকের কথা অনেক সময়ই বলিবার নহে—“বদন থাকিতে না পারি বলিতে তেঁই সে অবোলা নাম”—হিন্দু-ললনা এইভাবে তাঁহার দেবতাকে দিন-রাত্রি ডাকিয়া থাকেন। কেহ যখন হৃৎক বুঝিবার নাই, হৃৎক বুঝাইবার শক্তি নাই,—তখন দিনরাত্রি তাঁহাকেই ডাকেন—যিনি সকলের অনন্ত-শরণ, একমাত্র গতি। ‘রোগীও পার্শ্বে বসিয়াও সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়কে শ্রবণ করা ভিন্ন তিনি কি করিতে পারেন!

আমাদের দেশে রমণীরা স্বভাবতঃই ধর্মভীরু। তাঁহাদিগকে আমি ধর্মের কথা কি বুঝাইব? তবে তাঁহারা যদি শিশুদিগকে ধর্মের উপদেশ দেন, কোন নিয়মিত সময়ে উপালনা, জপ বা নামকীর্তনের জন্ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তবে এই মাতৃদত্ত মূলধনের বলে তাহারা প্রকৃতই ধনী হইবে। আমি শৈশবে কত মহিলার ভক্তি দেখিয়া ধন্ত হইয়াছি। একদা একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “আপনি মন্দিরে গিয়াছিলেন, কি দেখিয়া আসিলেন?” তিনি বলিলেন,—“ঠাকুর-দর্শন ঘটে নাই,—যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের পায়ে ধুলার কাছে প্রণাম রাখিয়া আসিয়াছি।” গদগদ-কণ্ঠে এই কথা বলার পরে দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিয়াছে। সেই ভক্তিময়ীরা এখনও আছেন,—এই যে তীর্থদর্শনের জন্ত রমণীকুলের এত ব্যাকুলতা, তাঁহার মধ্যে এক আকাজকা। যাহাকে তাঁহারা দিবারাত্রি খোঁজেন, কোথায় তাঁহার উপলব্ধি বেশী হইবে, সেই চেষ্টায় তাঁহারা তীর্থস্থানে বাইবার জন্ত আগ্রহাতুরা।

ছেলেদের প্রাতঃকালে যদি আধঘণ্টা কিংবা পনের মিনিট এই ভাবে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রাখা যায়, তাহার ফল খুব বেশী পাওয়া যাইবে। সংসার কত হৃৎক, বিপদ ও সঙ্কট লইয়া নিরন্তর সম্মুখীন হইতেছে। যদি শৈশব হইতে ভগবানকে ডাকিবার অভ্যাস না হয়, তখন বিপদের দিনে তিনি সাড়া দিবেন কেন? যাহাকে তুমি সুখের সময় একেবারে ভুলিয়া রাখিয়াছ, হৃৎকের

সময় তিনিও ভুলিয়া রহিবেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে মন যদি এমন একটা জায়গা পায়, যেখানে ধ্যানস্থ হইয়া সংসার হইতে একটা উর্দ্ধে উঠিতে পারে, তবে ক্রমশঃ মন প্রকৃত আশ্রয়ের সন্ধান পাইবে; তাহা হইলে যেদিন সংসারের বিষে জন্ম দগ্ধ হইতে উত্তৃত হইবে, সে দিন সে তাহার মনকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া শান্তির জায়গায় লইয়া যাইতে পারিবে। প্রথমতঃ ভগবানের নাম জপ বা উপাসনার সময় দেখা যাইবে যে, অলক্ষিতভাবে মন সংসারের বাজে বিষয় লইয়া আবার বাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। ভগবৎ-বিষয়ে যতই মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিবে, ততই দেখিবে, মন অজ্ঞাতসারে সংসারের চিন্তাজালে জড়িত হইতেছে, ধর্মজীবনের প্রথমাবস্থায় আধবন্টা কাল এই ভাবে চেষ্টা করিলে এই কথার সত্যতা পরীক্ষিত হইবে। কিন্তু যেমন বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া পাথরকেও ক্ষয় করে, সেইরূপ নিত্য নিত্য চেষ্টার ফলে সংসারের আবর্জনা মন হইতে ক্রমে দূর হইবে। অবশেষে অভ্যাসবলে মনঃসংযোগশক্তি একরূপ দাঁড়াইবে যে, অনায়াসে সংসারের নানা কষ্টের ভিতবও মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সহজ হইয়া পড়িবে। তারপরে ক্রমে তাঁহার দয়া স্বরণ ও তাঁহাকে ধ্যান-ধারণা করিলে নিজের সুখ-দুঃখ-বোধ চলিয়া যাইবে। আনন্দময়কে যিনি ঘরে আনিয়াছেন, তাঁহার আবার দুঃখ কোথায়! দেহ-মন তাঁহারই পদে সমর্পণ করিলে সাংসারিক বিপদ দুঃখ তুচ্ছ বোধ হইবে। আমি তাঁহার, আমি আর কাহারও নহি; তাঁহারই নির্দেশে চক্ষু, কণ ও ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য করিবে—আমি নিজের সুখের জন্ত—নিজের ভোগের জন্ত কিছু চাহি না; তিনি যে কার্য্যে প্রীত—আমি সেই কার্য্যের কর্ম্মী, তস্তিন্ন অজ্ঞ কিছু করিব না। তিনি কি কার্য্যে প্রীত, জানিতে হইলে মনকে ধ্যান, ধারণা ও উপাসনা দ্বারা শাস্ত করিয়া উৎকর্ষ হইয়া থাকিতে হইবে, একরূপ হইলে তিনি স্নেহে চুপে চুপে কানে কানে কত মধুর উপদেশের কথা কহিবেন এবং কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—কোন সাংসারিক সমস্যা কি ভাবে পূরণ করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিবেন। কারণ, তিনিই আমাদের গুরু ও উপদেষ্টা, আমরা মহাধনী হইলেও তিনি তিন

আমাদের কেহ নাই, মহা দরিদ্র হইলেও তিনি ভিন্ন আমাদের কেহ নাই। তিনি কখনই আমাদেরকে ভোলেন না, আমরাই তাঁহাকে ভুলিয়া সর্বদা বিপদে পড়ি। আমরা তাঁহাকে চাই না,—কিন্তু তিনিই তাঁহার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আমাদেরকে সর্বদা চাহেন,—এই জন্ত দুঃখ দিয়া তিনি আমাদেরকে তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া লন।

ছেলেদিগকে জননী এই ভাবে ধর্মশিক্ষা দিয়া প্রত্যহ শুইবার পূর্বে যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—কে কতটা মিথ্যাকথা বলিয়াছে, কে কতবার অপরের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে, কে বিনা কারণে ঝগড়া করিয়াছে, তাহা হইলে শিশুরা প্রথম হইতেই নৈতিক বিচার করিতে শিখিবে, এই নৈতিক বিচার হইতেই ধর্মবুদ্ধির বিকাশ। নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিলেই, সেই অপরাধের শেষ ও ধর্মজীবনের আরম্ভ হইবে।

ছেলেদের খাণ্ড-সম্বন্ধে গৃহিণীর সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। কলিকাতার অনেক শিশু ইনফ্যান্টাইল লিভার নামক উৎকট ব্যাধিতে মৃত্যুকালে পতিত হয়। তাহার

ইনফ্যান্টাইল লিভার একমাত্র না হউক, প্রধান কারণ—বাজারের দুগ্ধ-পান। অনেক বাড়ীতে বেক্স একজন গৃহশিক্ষক

রাখিয়াই ছেলের অভিভাবক নিশ্চিন্ত থাকেন, কারণ, তিনি রীতিমত তাঁহার বেতন যোগাইয়া থাকেন, এবং ছেলেও দুই এক ঘণ্টা তাঁহার কাছে বসিয়া চোঁচাইয়া পাঠ বলিতে থাকে, অথবা পেন্সিল লইয়া খাতার উপর আঁচড় কাটে—সেইরূপ টাকার ১৪ সের দুধ কিনিয়াই গৃহস্থ মনে করেন, ছেলের খাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, শিশুর পক্ষে, গোয়ালার দুধ বিবের জ্বর কাজ করে। অযোগ্য গৃহ-শিক্ষকের দোষে বেক্স বালকগণের প্রথম হইতেই কু-শিক্ষা আরম্ভ হয়, এবং সেই শিক্ষার ফল পাকিয়া উঠিলে কিছুতেই আর ভবিষ্যতে তাহার সংশোধন চলে না, সেইরূপ গোয়ালার দুধ খাওয়ার ফলে শিশুর বকুতের যে দোষ ঘটে, শেষে বড় বড় ডাক্তারগণও তাহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না।

এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেকে কিছুতেই গোয়ালার দুধ খাইতে দেওয়া না হয়, ইহাই আমার উপদেশ। আমাদের পরিবারে নানা বিপদ ও দুঃখের

গোয়ালার দুধ

দ্বারা এই বহুদর্শিতা লাভ হইয়াছে—সুতরাং ইহা পুণিগত উপদেশ নহে। যে সকল দুধ গোয়ালার

সারাদিন বিক্রয় না করিতে পারে, ও ফলে বাসি হইয়া যায়, সেই দুধ তাহার কখনই ফেলিয়া দেয় না, তাহা কোন উপায়ে রক্ষা করিয়া নূতন দুধের সঙ্গে মিশায়, ইহাই বিষ হইয়া দাঁড়ায়। শুধু জল মিশাইলে এতটা বিপদের সম্ভাবনা থাকিত না। গোপকুল কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া দুধের বিড়ম্বনা করে, তাহা আমি জানি না,—অনেক রকম অনুমান করিতে পারি, এইমাত্র; সে সকল গুপ্ত বিস্তার মৰ্ম্ম জানারও বেশী প্রয়োজন নাই; তবে ইহা নিশ্চয়, অন্ততঃ একবৎসর বয়স পর্য্যন্ত আপনারা কেহই শিশুকে গোয়ালার দুধ খাওয়াইবেন না। আমি সহরের শিশুদিগের সম্বন্ধেই বলিতেছি, মফঃস্বলের গোয়ালার মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, এ কথাটা বোধ হয়, জানে; কারণ তাহাদেরই কুলে ভগবানের শৈশব ও কৈশোর লীলা হইয়াছিল, এরূপ লিখিত আছে। কিন্তু সেই ভগবান যে নিত্য শিশুরূপে তাহাদের নিকট এখনও দৃষ্টপ্রার্থী, এ কথা মনে থাকিলে সহরের গোয়ালার পুতনা সাজিয়া বিষ-দুধ তাহাদের মুখে দিতে পারিত না। এখন তাহাদের সমাজে নন্দ-বশোদা আর নাই, এখন তাহারা পুতনা ও তৃণাবৰ্ত্ত প্রভৃতির দ্বারা শিশুকুল-সংহারে সংকল্প করিয়া বসিয়াছে।

যাহা হউক, সাধারণতঃ একবৎসর পর্য্যন্তই ইনফ্যান্টাইল লিভার হওয়ার সময়। এই রোগ এরূপ মারাত্মক যে, ইহা হইলে শতকরা ৯৯টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গোয়ালার দুধ এ সময় পর্য্যন্ত শিশু বেন কিছুতেই না খায়, তাহা সহরের অভিভাবকগণ দেখিবেন। অনেক সময় এরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, চাকর, গোয়ালার বাড়ীতে ঘটা হাতে বার এবং তাহার সম্মুখে দুধ দোহাইয়া দেওয়ার কথা থাকে। চাকরেরা অবশ্য ধর্ম্মপুত্র বুদ্ধিষ্ঠির নহে, এবং বেখানে অর্থের লোভ আছে, সেখানে গোয়ালার সঙ্গে তাহার একটু আত্মীয়তা স্থাপন করা অতি

সহজ ; স্মৃতরাং উক্তরূপ বন্দোবস্ত একবারেই নিরাপদ নহে । গরু বাড়ীতে আনিয়া দুধ দোহাইয়া দিয়াছে, অথচ গোয়ালার অনামাত্র হস্ত-চালনার গুণে তাহারই মধ্যে দুধের সঙ্গে কিছু মিশাইয়া লইতে আমি দেখিয়াছি ; একরূপ অবস্থায় যে কোন বন্দোবস্ত হউক না কেন, গোয়ালার দুধের উপর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না । সম্মুখে গরু রাখিয়া দুধ দোহাইয়া দিবে, এই করবারে আমি এক গোয়ালাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম ও আমার একটি ছেলে চাকরকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া দুধ আনিবে, একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল । কিন্তু ২৪ দিন পরে ছেলে বলিল, সেই গোয়ালার গোয়ালে ৩০৪০টা গরু আছে, গোয়াল-ঘরটা আঁধার এবং যে গরু হইতে দুধ দোহা হইবে, তাহা গয়লা সকলের পশ্চাতে রাখিয়া দেয় । ৩০৪০টা শিঙ্গনাড়া খাইয়া ও বিপুল-আয়তন গোবরের মধ্যে হাঁটিয়া যাইয়া সেই আঁধারে নির্দিষ্ট গরুর কাছে উপনীত হইতে হইবে । এই দুঃখে বিগলিত হইয়া কাকুতি করিয়া গোয়ালার বলিত, “বাবু, আপনি কি করিয়া এই কষ্ট সহ্য করিবেন ? আনাদেরই না হয় পেটের দায় সমস্তই করিতে হয়, আপনি এখানে বসুন, আমি দুধ দোহাইয়া লইয়া আসিতেছি ।” ভ্রতাবরও কোন অজ্ঞাত কারণে গোয়ালার পক্ষপাতী, সে বলিত, “না হয় আমি যাই, আপনার আসিবার দরকার কি ?”

এক বৎসর পর্য্যন্ত শিশু যদি সুস্থ মাতার স্তন্য পায়, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট খোরাক তাহার কিছুই হইতে পারে না ; তাহা যথেষ্ট নী হইলে এলেন-বারী ১ কি ২ নম্বর তাহার পক্ষে ভাল । কিছু যদি বেশী ব্যয় হয়, তবে মনে করিবেন, ইনফ্যান্টাইল লিভার একবার হইয়া পড়িলে কি ভয়ানক বিপদ ! তাহাতে ছেলের জীবনসকট ঘটে ও হাওয়া পরিবর্তন ও ডাক্তারের খরচে গৃহস্থ একেবারে বিব্রত হইয়া পড়েন । অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষেও এলেনবারী ফুডের খরচ সে তুলনার অতি সামান্য হইবে । বাহার বরে গরু আছে, তিনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, কিন্তু সহরে কয়জন গরু রাখিতে পারেন ? স্থানের অভাব, বিশেষ দোর্দণ্ড-প্রভাপ মিউনিসিপ্যালিটির টুপি-ওয়ালা পরিদর্শকগণ গৃহস্থের গরু থাকিলে তাঁহাকে অনেক সময় অতি নির্দয়ভাবে ভয় দেখাইয়া থাকেন ;

অতিশুষ্ক মিউনিসিপ্যাল-বিধির প্রত্যেকটি অক্ষর মান্ত করিয়া গরু পোষা কয়-
জনের ভাগ্যে হইতে পারে ?

শিশু বড় হইয়া উঠিলে সৰ্ব্বদাই তাহার আহারের সময় মাতার উপস্থিত থাকা
প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় মাতা তাহাকে কাছে বসিয়া খাওয়াইয়া থাকেন।

ফেরিওয়াল

কিন্তু কোন কোন ঘরে মাতা এ বিষয়ে উদাসীন।

রাধুনীর হাতেই এই ভার অপিত হইয়া থাকে।

কলিকাতার বাড়ী-ঘরের পার্শ্বে নানাবিধ স্বরে ফেরিওয়াল তেলেভাজা জিলিপি,
এক পয়সায় বক্রিশ ভাজা, ঘুগনি, মটর-ভাজা, পাঁপর-ভাজা, ফুল্লুরী প্রভৃতি ফেরি
করিয়া বেড়ায়; তাহাদের আহ্বান অনেক ছেলের নিকট ভ্রমর-গুঞ্জনের স্থায়
মিষ্ট। অনেক সময় মিহি-সুরে ঘুগনি-দানার ছড়া গাইয়া ফেরিওয়ালারা শিশুগণের
মনোহরণ করিয়া থাকে। এই সকল বস্তু কিনিয়া খাওয়া ছেলেদের একটা রোগ
হইয়া দাঁড়ায়; বাজারের পচা খাবার খাওয়ারও অভ্যাস অনেকের আছে। কলি-
কাতার শিশুবর্গ এইরূপ ফেরিওয়ালার হাতে পড়িলে, তাহাদের আর উদ্ধার নাই।
ঐ সকল খাবার শুধু স্বাস্থ্যের হানি করে, এমন নহে, উহাতে একেবারে ক্ষুধা নষ্ট
করে; বালকেরা ঐগুলি দিয়া পেট ভরিয়া ফেলিলে ভাত খাইতে চায় না।
তাহারা ভাত না খাইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়,—কলিকাতা সহরে অনেক ছেলে
১৮—২৫ বৎসরের মধ্যে থাইসিস্ পীড়ায় ভুগিয়া থাকে; অম্মের দ্রুতিক্রম বশতঃই
অনেক সময় এই ব্যাধির সৃষ্টি হয়। মটর-কলাই ভাজা বা চিনে-বাদাম ভাজা
খাইয়া মোটেই ভাতের ক্ষুধা থাকে না;—ভাত না খাইতে খাইতে বালকের হাড়
বাহির হইয়া পড়ে, এবং কালে তাহার পেটের অস্থি হইয়া টাইফয়েড্ জ্বর হয়,
অথবা থাইসিসের চিহ্ন দেখা দেয়; কারণ, শ্রীণজীবগণের উপরই এই সকল
রোগের আক্রমণ বেশী।

এজন্ত ছেলেরা ভাত ঠিকমত খাইল কি না,—মাতা তাহা দেখিবেন; যদি

খাওয়া সম্বন্ধে নিয়ম

ভাত না খায়, তবে কেন একপটি হইল, তাহার কারণ
অমূল্যদানের কলে ফেরিওয়ালার সঙ্গে বালকের গুণ

ঘনিষ্ঠতা বাহির হইয়া পড়িবে। ছেলেরা যখন খাইবে, সে সময়ে তাহাদিগকে গালি দেওয়া উচিত নহে, অপরাধী হইলেও সে সময়ে মাতা অপরাধ ভুলিয়া মিষ্ট-মুখে তাহাকে খাওয়াইবেন,—এ কথা বলা বোধ হয় নিশ্চয়োজন। দরিত্রের সংসারে এক হাতা দুধের সঙ্গে এক বাটি ভাত মাখিয়া ছেলেকে বৈকালে খাইতে দিলে, ঘি নামধারী চর্বিতে ভাজা লুচি, শিঙ্গাড়া ও কচুরী হইতে তাহা ছেলের দৈহিক পুষ্টি-সাধনে বেশী সহায় হইবে। খাওয়া স্বত্বে নিদিষ্ট সময়ের বাধাবাধি থাকা আবশ্যক। অনেক বাড়ীতেই এ স্বত্বে কোন নিয়ম নাই। ছেলেরা সারাদিনই ইতর-জন্তুর স্তায় রোমন্থন করিতেছে, একরূপ দেখা যায়। নিতান্ত ছোট শিশুরা, যে খাইতেছে, তাহারই সঙ্গে বসিয়া ক্ষুধার অক্ষুধার খাওয়া গালে পুরিতেছে। অভিভাবকবর্গেরও কোন জ্ঞান নাই; এই খাওয়া-দাওয়া করিয়া ছেলে গণেশের মত পেট ভাসাইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি নিজে তৃপ্তির সঙ্গে বাহা খাইতেছেন, তাহার একটা ভাগ শিশুকে কবলিত করিতে দিয়া মায়া দেখাইতে-ছেন। শিশু ছোট-দাদা, বড়-দাদা, মেজ-দাদা প্রভৃতি সকলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে খাইতে বসিতেছে ও কতটা ওজনের জিনিস তাহার উদর ধারণ করিতে সমর্থ, তাহা নিজেও ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না, এবং মেহলীল আত্মীয়মণ্ডলীও কেবল খাওয়াইয়াই সুখী হইতেছেন। শিশুর পরিপাক-শক্তির একটা সীমা আছে, তাহা একবারও ভাবিতেছেন না।

আমি কলিকাতার দুই একটি বড় লোকের বাড়ীতে দেখিয়াছি, ছেলেদের খাওয়ার একটা নিদিষ্ট সময় ও খাওয়ার পরিমাণ আছে, তাহা তাহারা সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। যে গৃহে আসিল, তাহারই সঙ্গে নিকিচায়ে আত্মীয়তা করা যেক্রম উচিত হয় না, সেইক্রম নিদিষ্ট খাওয়া ছাড়া আগন্তুক যে খাওয়া আনিল, তাহাকেই শরীরের মধ্যে স্থান দিতে হইবে, তাহা নহে। অনেক জননী দুধ খাওয়াইতে বাইয়া শিশুর হজমশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখেন না; যতটা সাধ্য

ছেলেকে দুধ খাওয়ান

রোরুণ্ডমান শিশুর গলনলীর ভিতর জোর করিয়া
ঝিঁঝুঁক দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিতে থাকেন। এতদুপ-

লক্ষে শিশুর হাত-পা ছোঁড়া ও কান্নাকাটি যত বাড়িতেছে, ততই তাহাকে জোর করিয়া দুধ খাওয়াইবার সঙ্কল্প তাঁহার বাড়িয়া বাইতেছে; একদল মল্লযুদ্ধের কখনও প্রশংসা করা যায় না। অবশ্য, এমন অনেক ছেলে আছে, বাহারা সহজে দুধ খাইতে চায় না, কিন্তু ছেলেকে সংশোধন করা ও নূতন অভ্যাস লওয়াইবার শক্তি ও মাতার আছে—ইহা আমি কখনও অস্বীকার করিতে পারি না। অনেক সময় দেখা যায়, এইরূপ জোর করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময় ছেলে দাঁত বন্ধ করিয়া দুধ খাওয়ার পথে বাধা দিতেছে, ফলে কিছুকের সমস্ত দুধ গড়াইয়া তাহার হুটী কানে প্রবেশ করিতেছে। শিশুগণের কর্ণরোগের এই ভাবে উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং দুধ খাওয়াইবার সময় কানে দুধ না ঢোকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দুধ খাওয়াইতে বসিলে ভাল হয়। একখানা টোয়ালে বা কমান দ্বারা অনায়াসে ইহা নিবারিত হইতে পারে। গুণ্ণুগুণ্ণুরে গান করিয়া বা অল্প কোন-রূপ শিশুর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে সহজে দুধ খাওয়াইতে পারিলে বাড়ীর একটা মস্ত বৃথা কলরব চলিয়া যায়। শিশুদিগকে লইয়া এইরূপ চীৎকার ও উচ্চ কলরব যতই কম করা যায়, ততই ভাল। একজন একটি গল্প বলিয়া-ছিলেন যে, তাঁহাদের পাড়ার একদিক হইতে তাঁহারা ক্রমাগত এক ব্যক্তিকে প্রাণপণ চীৎকার করিতে শুনিতে পাইলেন; সে ব্যক্তি খুব চীৎকার করিয়া কেবলই বলিতেছে—“টান্ দে—বীকা কর, টানিয়া উঠা”—এই অবিরত চীৎকারে কৌতূহল বুদ্ধি পাওঘাতে এবং ভীত হইয়া পাড়ার লোকেরা সেই বাড়ীতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং “মহাশয় কি হইয়াছে” বলিয়া বহুকণ্ঠে একেবারে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। চীৎকারকারী লজ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “মহাশয়, কিছু নয়, ছেলেটাকে ‘ক’ লেখাচ্ছি।” ছেলে লইয়া এইরূপ অভিনয় ও বৃথা কলরব ভাল নহে। অনেক সময় মাতার জননী তাঁহার অষ্টম কি নবম-বর্ষীয়া কন্যার উপর ছোট শিশুটির দুধ খাওয়াইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, অনেক সময় পরিচারিকাদের হাতেও এই ভার পড়িয়া থাকে। কিন্তু জননী সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন, শিশুকে পরিমাণের বেশী দুধ খাওয়ান হইতেছে কি

না, এবং তাহার দুই কানে দুধ গড়াইয়া পড়িতেছে কি না। কোন কোন সময়ে অজ্ঞাত কারণে বাটিতে দুধ নষ্ট হইয়া যায়। হয় পূর্বদিনের দুধের অংশ বাটিতে লাগিয়াছিল, তাহারই সংস্পর্শে আসিয়া দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিংবা অন্য কোন কারণে সেকরূপ ঘটয়া পড়িয়াছে; এইজন্য শিশুকে দুধ খাওয়াইবার পূর্বে সর্বদা সেই দুধ পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। যদি জননী শিশুকে নিজে না খাওয়াইয়া অপরকে দিয়া এই কাজ করান, তবে তিনি এই সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া তবে অপরের উপর শিশুর দুধ খাওয়াইবার ভার দিবেন।

আমি শিশুকালে মারের হাতের অনেক চড়-চাপড় খাইয়াছি। এখন মনে হয়, সে চড় সে থাপ্পড় কত মিষ্ট—অনেকেই এই ভাবের মাতৃপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। যাহারা মাতৃহারা, সেকরূপ প্রসাদ পান নাই, ছেলেকে মারা

তাঁহার কি দুর্ভাগ্য! হয় ত কোন সাধু পুরুষ ভগবৎ কৃপা সম্যক লাভ করিয়া মনে ভাবিবেন, তিনি যত দুঃখ-কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা মাতৃদত্ত চড়-চাপড়ের মতই তাঁহার উপকারে আসিয়াছে। এই চড়-চাপড় ও মারের কথা মনে হইলে মারের করুণার কথাই মনে হয়, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, শিশুর প্রহার আমি একেবারেই পছন্দ করি না। কেহ কেহ এক বৎসর বয়স্ক ছেলের উপর মা'র-ধর চালাইতেছেন, ইহাও দেখা যায়। অবশ্য, মাতা অনেক বিরক্ত না হইলে একরূপ করেন না, মাতাকে স্নেহ শিখাইতে চেষ্টা করার নাম বাতুলতা, ইহা একবার লিখিয়াছি। কিন্তু দুঃখোপায় শিশুর উপর হস্তচালনা অপেক্ষা নৃশংসতা আর কি কল্পনা হইতে পারে? ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই যাহার পিঠে মা'র-পিটের একরূপ মুক্তহস্ত পরিবেষণ আরম্ভ হয়, সে ছেলের স্বভাব একেবারে বিগড়াইয়া যায়, কয়েকবার জেল খাটিয়া আসিলে যেকরূপ কয়েদীর আর জেলের ভয় থাকে না, একবার মা'র-ধর সেইরূপ শিশুর হাড়ে সহিয়া গেলে—সে আর মারকে একেবারেই ভয় করে না। শিশুর গায়ে হাত তোলা ভাল নহে, অনেক সময় এইরূপ মারিতে যাইয়া পিতা-মাতা বড় বিপদে পড়েন।

আমার মামাত-ভাই মহেন্দ্রনাথ সেন বাহির হইতে বিরক্ত হইয়া আসিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার একটি ছেলে উঠানে পড়িয়া কাঁদিতেছে ; তখন রাগের বোঁকে তাহাকে একটা কঞ্চি ছুঁড়িয়া মারেন, সেই কঞ্চীর ডগা বিঁধিয়া শিশুর একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। মহেন্দ্রবাবু এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর আমাকে বলিয়াছিলেন, “দেখ, যদি আমার প্রাণ বা দুটি চক্ষু লইয়া কেহ উহার ঐ চক্ষুটা সারাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার কেনা গোলাম হই।” শিশুকে আঘাত করিয়া বেশী অনিষ্ট না হইলেও মাতা ও পিতার মনে এতরূপ অশুভাপ হইতে পারে। কত মাতা স্বীয় হস্তের চড়ের দাগ শিশুর গায় দেখিয়া নীরবে কাঁদিয়া থাকেন। গায়ে চড়ের দাগে রক্তচিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, সেই স্থানগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, তথাপি শিশু প্রহারকর্ত্রী মাতার মুখ দেখিয়া আপনা ভুলিয়া সন্তোদগত দম্ভ বিকাশ করিয়া হাসিতেছে ; এই দৃশ্য দেখিলে মাতার মন কিরূপ ব্যথিত হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

শিশুর মনে যদি স্নেহজনিত ভয় থাকে, তবেই তাহার উন্নতি হয়। এমন মা অনেক আছেন, যাহার চক্ষের ইঙ্গিত নিদারুণ প্রহার অপেক্ষা ছেলেকে বেশী সংশোধন করে ; এইরূপ এক মা তাঁহার চা’র ‘বছরের ছেলেকে কোন অপরাধের জন্ত সামান্য একটা চড় মারিয়াছিলেন। বালক ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ও তক্তাপোষের নীচে মড়ার মত হইয়া ভয়ে লুকাইয়াছিল ; তারপর মা যখন হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন, তখন সে মায়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কত মাতাকে দেখিয়াছি, ছেলেকে কাঠের চেলা দিয়া নিষ্ঠুরভাবে মারিয়াছেন, অথচ তাহাতে তাহার কোন ভয় হয় নাই ; যতই মার থাইয়াছে, ততই সে বিগড়াইয়া গিয়াছে। এরূপ জননীরা অনেক সময় হুঁং করিয়া বলিয়া থাকেন, “বল, আর কি করিতে পারি ? উহাকে কেবল প্রাণে মারি নাই,—যে রূপ মারিয়াছি, যদি তাহা দেখিতে ! তথাপি ত উহার সংশোধন হইল না।” আমরা বলিব, মা ঠাকুরুণ, উহা আদর্শেই সংশোধনের পথ নহে, আপনি রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছেন, মায়ের হাতে সংশোধনের



এক অমোঘ অস্ত্র আছে—তাহা যাত্ন-স্নেহ। আপনি তাহা ছাড়িয়া গুরুমশায়-গিরি আরম্ভ করিয়াছেন। বেতের লাঠি ক্ষয় হইয়া যাইবে, কিন্তু ছেলের কোন উপকার হইবে না। আপনার হাতের অঙ্গুলিগুলি বাধা পাইবে, কিন্তু ছেলের ব্যথা-বোধ আপনি একবারে নষ্ট করিতেছেন। সৰ্ব্বদা 'যে ছেলেকে "দূর দূর" করা হয়, যাহাকে সৰ্ব্বদা বলা হয়, "তুই কোন কন্ঠের নহিস্," তাহার আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের গোড়া কাটিয়া ফেলা হয়; সে ছোট ছোট অপরাধ হইতে ক্রমশঃ গুরুতর অপরাধের পথে চলিতে থাকে।

আসল কথা, যিনি বিচার করিবেন, তাহার বিচার-বুদ্ধি আগে স্থির হওয়া দরকার। ছেলেকে মারিবার পূর্বে তিনি একবার নিজের মনের দিকে লক্ষ্য করিবেন। যদি তখন বোঝেন যে, তিনি নিজে রাগিয়াছেন, তখন তিনি আর ছেলের গায়ে হাত তুলিবেন না; কারণ, তখন তিনি নিজে অপরাধী হইয়াছেন, —তিনি অপরকে বিচার করিবার অযোগ্য হইয়াছেন। যদি নিজে রাগিয়া না থাকেন,—শুধু ছেলের হিতই যখন তাহার বিচারের লক্ষ্য, তখন তিনি তাহাকে মিষ্ট কি কষ্ট বাহা উচিত বোধ করেন, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারেন। নিজে রাগিলে তিনি এমন একটা ইঞ্জিরের বশীভূত হইলেন—বাহার চক্ষু-কর্ণ নাই; সেই পশুভাব লইয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে গেলে সে শিক্ষা ছেলে লইবে কেন?

অনেক বালক শিষ্টাচার বলিয়া যে একটা জিনিস আছে, তাহা জানে না। তাহার পিতার কোন বন্ধু, আত্মীয় বা বাহিরের কোন ভদ্রলোক বাহিরে ডাকা-ডাকা করিতেছেন, বালককে বাড়ীর কঠোর কথা কি শিষ্টাচার অথবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সে দিকে মনোযোগই দিতেছে না, কিংবা অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া কোন অসঙ্গত ভাবের উত্তর দিতেছে। বাহাতে ছেলেরা বিনীত হয় এবং ভদ্র ব্যবহার শিখে, তদ্ব্যতীত পিতামাতার চেষ্টা করা উচিত। বাহিরের কেহ আসিলে বালক সম্মানের সহিত তাহার কথা শুনিবে ও যদি কোন প্রশ্ন করিতে হয়, "তবে আপনি কাহাকে চান?" এই ভাবে তাহার উদ্বেগ জিজ্ঞাসা করিবে। কাহারও নাম

জিজ্ঞাসা করা শোভন নহে—তবে সে এই তাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারে,—
 “আপনার সখকে আমি কি বলিব ?” বয়স-বড় ব্যক্তিদের প্রতি আগে যে একটা
 সন্মান দেখান হইত, এখনকার শিশুরা তাহা মোটেই জানে না। আমরা যখন
 এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখন একজন এন্, এ, পাশ মাষ্টারকেও আমরা বিস্তার
 জাহাজ বলিয়া মনে করিতাম। তাঁহার কাছে কথা কহিতে হইলে কত বিনয় ও
 ভয়ের সহিত কথা কহিতাম। এখন এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র একজন এন্, এ,
 পাশ মাষ্টারেরও বিস্তার দৌড়ের সমালোচনা করিয়া থাকে, এবং তিনি কোন্
 কোন্ বিষয় ভাল শিখিতে পারেন নাই, হয় ত ক্লাসে বসিয়াই তাঁহাকে তাহা
 প্রকান্তভাবে শুনাইয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে। বিনয়ের এই অভাবে আমা-
 দের সামাজিক শৃঙ্খলা একবারে নষ্ট হইয়া বাইতেছে। অর্কাটান ছেলের
 অকাল-পকতা, সর্ববিষয়ে সমালোচনা-চেষ্টা, নিজের বুদ্ধির অঙ্কুর হইবার পূর্বে
 বুদ্ধিমানে ও গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিদিগের টিকি ধরিতে বাওয়া,—এই সমস্ত দুর্লক্ষণ
 সমাজে বড় বেগী পরিমাণে দেখা বাইতেছে। ধর্মের প্রতি উদাসীনতার জন্ত
 গুরুজনের প্রতি ভক্তি কমিয়া বাইতেছে এবং ছেলেরা হৃদ্যন্ত হইয়া উঠিতেছে।
 আমি বেদী চাপিয়া বসিয়া গুরুগিরি করিতে চাহিতেছি না,—আমি শুধু এই
 বলিতে চাই, শিশু প্রথমতঃ মাতাপিতার দ্বারা আশ্রিত। পাড়াইয়াছিল, তাহার
 চরিত্রটি যদি পিতামাতা গড়িয়া দেন, তবে গৃহের বাহিরেও তাহা উপাদেয়
 থাকিবে। কেবল উপদেশ-কথা বলিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। চশমাচোখে
 দাড়ী নাড়িয়া যে সকল লোক চাপকা-নীতি আবৃত্তি করিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে
 দেখিয়া অনেক সময়ে শিশুর প্রাণ চমকিয়া উঠে ; সেরূপ ভাবে ভয় দেখাইয়া
 নীতিপথে লওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। শিশু যে সকল স্থানে ব্যবহার ও শীলতার
 ক্রটি দেখায়, সেখানে তাহাকে মিষ্ট কথায় ক্রিয় করিতে হইবে, তাহাই বুঝাইয়া
 দিলে উপকার হইবে।

অনেক বাড়ীতে শিশুরা দেশলাই লইয়া খেলা করিয়া থাকে। ছেলের হাতে
 দেশলাই দেওয়া আর তাহার বৃত্তাবণ দেওয়া একই কথা। আমার এক নিকট-

আত্মীয়ের ছেলেকে তাহার জনক-জননী রোজ একটি করিয়া পরসা দিতেন,—

দেশলাই কি নিতে। সে কাপড়-চোপড় পরিয়া দেশলা-
দেশলাই লইয়া খেলা

ইয়ের কাঠি একটি একটি করিয়া জালিত ও হু দিয়া

নিবাইত, তাহার সেই ক্ষুৎকারে কাঠির আগুন নিবাইবার সময় যে হাসির রেখা মুখে ফুটিত, তাহা দেখিয়া জনক-জননী আনন্দে গলিয়া বাইতেন। সে ছেলের পরিণাম যে কি হইল, তাহা আর বলা নিম্প্রয়োজন। ‘শিশুকে আমরা নিজেরা পুড়াইয়া মারিলাম’ বলিয়া যখন তাহার জনক-জননী কাঁদিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অনুতাপ ও শোকে পাষাণ গলিয়া গিয়াছিল। ছেলে যদি কাদিসে হাঁটে, কি রেলিং-এর উপর চড়ে, তবে তাহার কান মলিয়া—দরকার হইলে আরও শক্ত শাসন করিয়া, শোধরাইয়া লইবেন। না লইলে একদিন বাড়ী শুদ্ধ কান্নাকাটি পড়িয়া যাইবে। দেওয়ালীর দিন অনেক ছেলে আলো জালাইতে ও বাজী পোড়াইতে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; সে দিন গৃহস্থ সতর্ক থাকিবেন।

শিশুগণের উপরই ভবিষ্যতে পৃথিবী-পরিচালনার ভার; ইহারাই ভবিষ্যতের সমাজ-নেতা, বিচারক, শিক্ষক এবং ধর্মগুরু; ইহারাই অবহেলার সামগ্রী নহে; ইহারাই শুধু মাতাপিতার স্নেহ পাইবার প্রত্যাশী নহে—ইহারাই পৃথিবীর রক্তমণ্ডে যাইয়া কি অভিনয় করিবে, বাড়ীর আঙ্গিনায় তাহার মঞ্চ দিতে শিখিবে। যে ঘোর শত্রুতার বা গোড়ে পৃথিবী মল্লযুদ্ধে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মাতার ক্রোড়ে বসিয়া শিশু সেই নির্ভরতার দীক্ষা প্রথম গ্রহণ করিতে পারে; আবার বেঁ পুণ্যে অসীম স্নেহের বিনিময়ে শূলে বিদ্ধ হইয়াও সাধু ক্ষমার সহিত বলেন, “হে পিতঃ! বাহার! আমাকে মারিতেছে, তাহাদিগকে তোমারই অজ্ঞান সন্তান বলিয়া মাপ করিবে,” সেই শিক্ষাও বালক মাতার করুণ দৃষ্টি ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার হইতে প্রথম শিখিতে পারে। মাতা শিশুর ইহকাল ও পরকালের সহায়।

একান্নভুক্ত পরিবার

আজকালকার সভ্যতায় একান্নভুক্ত পরিবারে আদর্শ ভাবিতে বসিরাছে, উহা টল্টলানমান।

কিন্তু ভাঙ্গা সহজ, গড়া শক্ত। আমাদের একান্নভুক্ত পরিবার এই সমাজের অনেক অভাব পূরণ করিয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন হইয়া

এ দেশের সমাজ

খড়িলে আমাদের সেই অভাব মিটিবে কিসে? ধরুন,

৫০ টাকা বেতনের এক কেন্দ্রাণী বৃহৎ পরিবারের দায় হইতে আত্মরক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী অসুস্থ কিংবা অসমর্থ হইলে তাহাকে রাঁধুনী রাখিতে হইবে, ছেলেদিগকে দেখিবার জন্ত ও পীড়িতার সেবা-শুশ্রূষার জন্য লোক রাখা চাই। এরূপ বিপদ তাহার বৎসরে একবার ছইবার নহে, বহুবার আসিবে,—কারণ, বাঙ্গালী-গৃহস্থের ঘরে অসুখ-বিসুখ ত লাগিয়াই রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার আর দাস দাসী ও রাঁধুনীর বেতন দিতেই কুলাইবে না। তা ছাড়া সংসারের যাবতীয় খরচ ও ডাক্তারের কি ও ঔষধের দাম ইত্যাদি সে কি করিয়া কুলাইবে?

বিলাতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া লোকে ভিন্ন হইয়া থাকে, সেখানে বড় বড় চিকিৎসালয় আছে। সম্ভান হইবার পূর্বে সেইখানে বড় বড় লোকেয়াও তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সম্ভান কোলে লইয়া স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসেন,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কিংবা নিজের অসুখ হইলে অমনই চিকিৎসালয়ের শরণ লইয়া থাকেন। সেই সকল চিকিৎসালয় সর্বাঙ্গপূর্ণ, তাহাতে থাকার, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির যেকোন সুন্দর ব্যবস্থা আছে, বড় বড় ধনীর গৃহেও সেরূপ হইবার উপায় নাই। যে অবধি সুস্থ থাকা যায়—সে অবধি গৃহ, কিন্তু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসালয়। মাতাপিতা সেখানে শিররে বসিয়া শিশুদের শুশ্রূষা করেন না, শিক্ষিতা ধাত্রী ও ডাক্তারগণের উপরই সেই ভার।

গৃহের পশ্চাতে এই বিশাল আরোজন থাকার তথাকার লোকেয়া আত্মীয়-

স্বজন ছাড়িয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া সংসার চালাইতে পারেন। বিপদের সময় তাঁহাদের কোনই বেগ পাইতে হয় না।

আমরা একান্তরূপ পরিবারের আশ্রয় ত্যাগ করিলাম, কিন্তু বিপদের সময় আমাদেরই ধরিবার লক্ষ্য নাই। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে শিশুদিগকে পাঠাইতে কোন্ ভদ্র পরিবার সম্মত হইবেন? ঘোমটার মুখ ঢাকিয়া ঈহারা আত্মীয়দিগের পারের শব্দ পাইয়া সরিয়া পড়েন, তাঁহারা কি করিয়া সন্তান হইবার প্রাকালে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে বাইবেন? আমাদের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে তাহার বাবস্থাই বা কোথায়? যে প্রচুর অর্থ দ্বারা এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সাধারনের চেষ্টায় হইতে পারে, তাহা এ দেশে কোন কালেই হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না।

এইজন্য আত্মীয়-স্বজন লইয়া আমাদের ঘর-করনা, তাহাদের কেহ বা অকর্ম্মী, কোন কাজই করে না, তাস খেলিয়া, বাঁশী বাজাইয়া বেড়ায়; অনাথা দূর-আত্মীয় বিধবা হয়ত তাঁহার বিবাহ-যোগ্য কন্তা লইয়া আপাততঃ গলগ্রাহের মত হইয়া আছেন; তিনি জপের মালায় অঙ্গুলি ঘুরাইতেছেন ও আতপ-চাউল, কাঁচ-কলা নাড়াচাড়া করিতেছেন। অনেক সময় বিবাদের কথা সমস্তা পূরণ করিয়া এ পক্ষ বা সে পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন; কিন্তু বখন গৃহিণী পারিলেন না, তখন তিনি একাই একশ হইয়া রাঁধিতেছেন; আমিষ-পাকের রান্না সারিতে সারিতে বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারপর প্রসন্ন-মুখে নিজের টিনানে আশুন ধরাইতেছেন। যে ছোঁড়া তাস খেলিয়া, বাঁশী বাজাইয়া কাল কাটাইতেছিল, সে বাড়ীর কাহারও অসুখের সময় রাতে তিনটার সময় ডাক্তার ডাকিয়া বেদানা-দাড়িম কিনিয়া আনিয়া অসুগত ভৃত্যের হ্রাস সমস্ত কাজ প্রফুল্ল-মনে করিতে লাগিল,—কোন পরিবারে কেহ মরিলে এইরূপ অকর্ম্মী লোকেরাই শব-

অকর্ম্মীর কাজ

দাহের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। বিপদের সময় দেখা যায়—ইহারা গৃহস্থের কিরূপ বন্ধু! অল্প টাকা খরচ

করিয়া ভাল অবস্থার লোক বাহা না করিতে পারে,—নিঃস্বার্থভাবে ইহারা তাহা

করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা যে সকল উপকার পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় ইহাদের পাছে খরচ অতি সামান্য।

সুতরাং গৃহস্থালীর পক্ষে একান্তভুক্ত পরিবারের একটা দরকার আছে, তাহা আত্মীকার করিবার উপায় নাই। আমি বড় মানুষদের কথা বলিতেছি না, তাঁহাদের অর্থ থাকার দরুন অনেক সুবিধা হইতে পারে, তাঁহারা একান্তভুক্ত পরিবারে শ্রম গ্রহণ নাও করিতে পারেন; কিন্তু মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের তাহা ছাড়ি উপায় কি? ফলে দেখা যায়, কেহ কেহ নিজের সহোদর ও সহোদরাকে ছাড়িয়া খুশুর-বাড়ীর আত্মীয়দিগকে লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া আছেন। সেই সকল আত্মীয়তা যদি বেশী মিষ্ট হয়, তবে ক্ষতি কি? একভাবে একান্তভুক্ত পরিবার ভাঙ্গিয়া অন্য ভাবে তাহার পত্তন দেওয়া হইল, এই মাত্র! পিতামাতার সম্পর্কিত আত্মীয়ের যে স্বাভাবিক স্নেহ আছে, খুশুর-বাড়ীর লোকের তাহা ততটা থাকিবার কথা নহে; এইজন্য একত্র থাকিতে হইলে নিজ বাড়ীর আত্মীয়দের সঙ্গে একত্র থাকা বেশী সুখের হয়, তাহাতে স্বগৃহের সন্মান অটুট থাকে এবং বংশগত প্রকৃতি ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হয়।

আমি এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বাহা লিখিলাম, তাহা সকলই আর্থিক লাভ-ক্ষতির হিসাব দেখাইয়া। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা সাংখ্যিক দিক আছে। বহু আত্মীয়ের সঙ্গে একত্র থাকায়, যে আত্মত্যাগ, ক্ষমা ও উদার ভাবের চর্চা করিতে হয়— তাহাতে মানুষ উন্নত হয় ও ভগবানের বেশী সম্মুখীন হয়। কোন কোন সংসার ভোগের, কোন কোন সংসার ত্যাগের। শুধু পতি-পুত্র লইয়া যাহারা সংসার

করেন, তাঁহারা যে ত্যাগশীল হইতে পারেন না, এ

একত্র থাকার বিপদ

কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু বৌধ-পরিবারই সেই

ত্যাগের প্রকৃত ক্ষেত্র। যেখানে ত্যাগ নাই, উচ্চ ধর্ম্মভাব নাই, সেখানে যেন কেহ বৌধ-পরিবার গড়িবার বিকল প্রয়াস না পান। আমি এরূপ দেখিয়াছি যে, এক বাড়ীতে পিতা-মাতা এক উনানে রাধিয়া খাইতেছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যেও সর্ব্বদা কলহ হওয়ার দরুন তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে উপবাসী থাকিতেছেন। বড়

পুত্র ও তাঁহার স্ত্রী এবং শিশুগণসহ এক বাড়ীতেই আর এক উনানে রাখিয়া খাইতেছেন। মধ্যমের আর এক উনান এবং এই সমস্ত পরিবারের খুনোখুনি ঝগড়া চলিতেছে; কখন এক ভ্রাতার কি অপরাধ ভ্রাতার খাওয়া-দাওয়া কিংবা চলা-কেন্দ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করার দরুণ হঠাৎ দেখা গেল, সেই ভ্রাতা আসিয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া রক্তাক্ত করিতেছেন; বাড়ীময় পুলিশ আসিয়া সকলের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছে। অবিবাহিত সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কখনও বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিন্দা করিয়া মধ্যম ভ্রাতার প্রাণপ্রিয় হইয়া তাহারই সংসারে কিছু অন্ন-জল পাইতেছেন, কখনও মধ্যম ভ্রাতৃবধূর হঠাৎ কোন দোষ আবিষ্কার করিয়া তাহা সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন করার দরুণ ক্ষমা-নীল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রীত হইয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিতেছেন, “তুই ওখানে আর বাস না, আমারই মধ্যে থা।” কখনও বা সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সত্য কথা বলার দরুণ—উভয় ভ্রাতা-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কাণ্ডারীবিহীন নৌকার জায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে পিতা-মাতার উনানের পার্শ্বে আসিয়া বসিতেছে। কোন আত্মীয় যদি সেই বাড়ীতে গিয়াছেন, তবে মহাবিপদ; তিনি কাহার ঘরে খাইবেন? তিনি যে গৃহ আশ্রয় করিবেন, সে গৃহ হইতে অপরাপর সংসারের লজ্জাকর কেছা তাঁহাকে শুনিতে হইবে, তাহা শুনিবার জন্য দাস-দাসী কান পাতিয়া আছে। তাহার বখানানে সেই সংবাদ পৌছাইয়া দিতে বিলম্ব করিবে না, ফলে সেই আত্মীয়ের আগমন-উপলক্ষে এক সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। স্বয়ং গঙ্গা আসিয়াও নিবাহিতে পারিবেন না। এক পরিবারে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতার বাহু তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র এমনই জোরে কামড়াইয়া দিয়াছিল যে, পিতা তৎক্ষণাৎ পুলিশকোটে নাগিন করিয়াছিলেন এবং পুত্রবর ক্ষমা-প্রার্থনাপত্র কোটে সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিয়া অব্যাহতি পায়। দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চ পরিহাস ও হান্তের কারণ পিতা-পুত্র সেই উভেজনার সময় বৃষ্টিতে পারেন নাই।

আমরা যৌথ-পরিবারের পক্ষপাতী হইলেও যেখানে নৈতিকব্যাধি এরূপ প্রবল

এবং যেখানে দিবারাত্র একরূপ অভিনয় হয়, সেখানে একত্র থাকা কখনই অসম-
 মোদন করি না। পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে মনুষ্যশ্বের
 একত্র থাকা কোথায় সম্ভব
 কোথায় অসম্ভব
 . শোভন করিয়াছে, সেইখানেই বোধ-পরিবারে শুভফল
 দৃষ্ট হয়। বাহারী নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ কিসে বেশী হয়, তাহাই চিন্তা
 করিতে পারেন, বাহারী ক্ষমা ও দয়ার দ্বারা পরকে আপন করিয়া লইতে পারেন,
 তাঁহারাই এক ছত্রের তলে বাস করিবার যোগ্য। প্রাচীনকালে ধর্মবুদ্ধি-প্রভাবে
 সমাজের লোকেরা সেই যোগ্যতা লাভ করিতেন। রামায়ণ তখন সমাজের
 আদর্শগ্রন্থ ছিল। পিতার একটা মুখের কথাই জগৎ পুত্র সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া
 দিতেন, ভাতাকে সেবা করিয়াই কনিষ্ঠ মনে করিতেন, তাঁহার অক্ষয় স্বর্গলাভ
 হইবে; প্রভুকে সন্তুষ্ট করার তুল্য বড় কার্য ভৃত্যের কিছু ছিল না। এই কথা
 আসরে খেলের বাণের সঙ্গে বাজিয়া উঠিত; কথক মহাশয় নানা ছন্দে ইহা হৃদয়-
 গ্রাহী করিয়া শুনাইতেন; পল্লীর যাত্রার দল এই তত্ত্বের অভিনয় করিয়া
 শ্রোতার হৃদয় গলাইয়া দিতেন। সুতরাং যেকোন তরুণজনের মধ্যে গৃহটি ছায়া-
 নীতল হইয়া থাকে,—গৃহ-ধর্ম এই সকল প্রভাবের দ্বারা সেইরূপ স্নিগ্ধ হইয়া
 থাকিত। এখন সে সকল প্রভাব নাই; যে স্ত্রীর বন্ধনে আত্মীয়দের সঙ্গে এক-
 যোগ হইয়া থাকিতে পারা যাইত, উদার ধর্মবুদ্ধি ভিন্ন সে স্ত্রী পরিচালনা
 করিবে কে ?

কিন্তু এই আদর্শটি বাহাতে রক্ষা পায়,—তজ্জগৎ আমাদের চেষ্টা করিতে
 হইবে। অলসতার প্রশ্রয় না দিয়াও বোধ-পরিবার বহু স্বগণের সমবেত চেষ্টায়
 দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ধর্ম-ভাবের সঙ্গে এখনকার কর্মের আদর্শের
 যদি যোগ করা যায়—তবে ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বোধ-পরিবার পুনরায়
 নব-জীবন লাভ করিতে পারে।

এখনও নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ-পরিবারের উৎকৃষ্ট ভাবগুলি মধ্যে মধ্যে
 দেখা যায়। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয় কোন

এক পরিবারের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া দেখেন, প্রায় এক-শত লোক একত্র আছে, তাঁহাদের মধ্যে কোন বিরোধ
আদর্শ যৌথ-পরিবার
নাই। সকলেই একরূপ খান, একরূপ পরেন।

তাঁহাদের প্রীতি দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় বড়ই আনন্দ লাভ করেন; বাড়ীর কর্তা ভোলা-মহেশ্বর; কে তাঁহাকে কর্তা বলিয়া বুঝিবে? কে খাইল, কে না খাইল—কাহার চিকিৎসার দরকার, কাহার কি টাকার দরকার, ইহাই তিনি দেখিতেছেন; সকলের তহবিল এক; তাহা কর্তার হাতে,—অথচ কর্তা নিজের সুখ একবারটিও ভাবেন না। কবিরাজ মহাশয় গৃহ-কর্তার জামাতার চিকিৎসার জন্ত আহৃত হইয়াছিলেন,—পার্শ্বে অন্নবয়স্কা স্ত্রী বসিয়া গুপ্তা করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ মেয়েটি কি আপনি দোজ-বয়ে দিয়াছেন। জামাতার বয়স একটু বেশী দেখিতেছি।” কর্তা বলিলেন, “দোজ-বয়স বটে” এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, “সে কথা আপনাকে গোপনে বলিব।” তার পর কবিরাজ মহাশয়কে নির্জনে বলিলেন, “আমার মেয়েটি মারা গিয়াছে, কিন্তু জামাই চিরকাল আমাদের সংসারে আছেন, তাহার নায়া আমরা ছাড়িতে পারি নাই এবং তিনিও আমাদের গায়ে ছাড়িতে সম্মত নন, এজন্য কি করি, তাঁহাকে আর এক বিয়ে দিগে সেই স্ত্রীকে এখানে রাখিয়াছি। স্ত্রীটি গম্ভী, সে আমার মেয়ে বই কি?” এই বিপুল সংসার ঢালাইবার পক্ষে কর্তার ইঙ্গিতই মূল-মন্ত্র। বেকরূপ কোন বৃহৎ পাদপকে আশ্রয় করিয়া ছোট ছোট তরু-শৃঙ্গ ও লতা বিকাশ পায়, তাঁহারই স্নেহশৃঙ্গে শতাধিক লোক সেইরূপ আবদ্ধ, বহু আত্মীয় একত্র থাকায় যে ত্যাগ স্বীকার ও প্রীতির দরকার, তাহার চিত্র আমরা এদেশ ভিন্ন কোথায় দেখিব? স্বামী-স্ত্রী একত্র থাকিয়াও অনেক স্থলে বগড়া করে। পিতা-পুত্রের মুখ দেখা-দেখি নাই,—অথচ এক বাড়ীতে আছেন। এমন দৃশ্যও যেমন বিরল নহে, তেমনি যৌথ-পরিবারে পূর্ণত্যাগ ও ধর্মভাবও আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। আমাদের কোন্টি অমুকরণীয়? আমরা কোন্টি ছাড়িয়া কোন্টি ধরিব? আমরা সর্বদা স্বার্থের মধ্যে ডুবিয়া থাকিব, না নিঃস্বার্থ হইব? আমরা

কেবল নিজের খাত্তের জন্ত লালায়িত হইব, না পরকে খাওয়াইব ? আমরা
 বর্ধন্য কি নিজকে শুধু স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে বিলাইয়া দিব, না বৃহৎ
 সংসারের সেবার নিযুক্ত থাকিয়া আমাদের যিনি
 প্রাণের প্রাণ, তাঁহার সেবার যোগ্য হইব ?

যদি সামাজিক দুর্গতি একরূপ হইয়া থাকে যে, যাঁহারা মাতার এক উদরে স্থান
 পাইয়াছিলেন, সংসারে তাঁহারা আর কোনরূপেই এক স্থানে বসিয়া থাকিতে
 পারেন না, একের দুঃখে অপর আর দুঃখিত হন না,—বরং হাঁসপাতালে যাইবেন,
 বরং ঋণ করিয়া ভৃত্যের সংখ্যা বাড়াইবেন, তথাপি ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইবেন,
 কিছুতেই একত্র থাকায় স্বীকৃত হইবেন না ; তাহা হইলে বাহা মনের ভাল,
 তাহারই ব্যবস্থা হউক,—এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিতে পারি !

মহিলাগণের নিকট আমার এই নিবেদন, অনেকে আপনাদের উপর এ
 সম্বন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া থাকে । যদি উপার্জন-শীল স্বামীর অকর্ম্মা দুইটা
 বার্ষিক্যপত্রতা ভাই থাকে, তাহারা কি গৃহিণীর স্নেহের কোন
 দাবীই রাখে না ? বাহারা নিজে অযোগ্য, তাহাদিগকে
 একটু স্নেহ দেখাইলে তাহারা কত অমুগত হয় ! সংসারে নিজের সুখের দিকে
 যিনি অতিরিক্ত লক্ষ্য করিবেন, দুঃখ তাঁহার পাছে পাছে যাইবে । নিজের
 শিশুরা বাহা খায় ও পরে, ভ্রাতার শিশুরাও যদি তাহাই খায় পরে—অথচ যদি
 সকলে সত্যবাদী, পরদুঃখ-কাতর চরিত্রবান্ হইবার শিক্ষা পায়,—তবে তাহারা
 সমাজের ভূষণ হইবে । একটা সন্দেহ নিজের ছেলে বেনী থাকিতে পারিবে, বা
 বিলাতী ধুতি না পরিয়া মূল্যবান্ দেশী একখানা ধুতি পরিবে—ইহাই কি প্রকৃত
 লাভের বিষয় ? এই লাভের আশার ঈশ্বর বাহাকে ভাই করিয়া পাঠাইয়াছেন,—
 তাহাকে গৃহত্যাগ করাইতে হইবে,—বাহাকে জননীকৃপণী ভগবতী একত্র
 বসাইয়া তাঁহার মেহমর হস্তধারা এক থালা হইতে খাওয়াইয়া ছিলেন,—সে পথে
 পড়িয়া উপবাস করিবে, আর আমি নিজে নানা সুখাত্ত দ্বারা উদর ভূণ্ডি করিব ;
 একরূপ জব্বল স্বার্থ কি ভাল ?

এখনকার দিনে বহুলোককে একত্র খাওয়াইবার সংস্থান অনেকের নাই ; কিন্তু নিজের বহু ছেলে হইলে তাহাদিগের কোন একটি ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কেহ করেন না,—সেইরূপ বাহাদের কোন গতি নাই, দেবতা বাহাদের সঙ্গে এক সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহারাও কি পরিত্যাগের সামগ্রী ? আমরা পরিশ্রম করিয়া উপার্জন করিয়া থাকি এবং ভাবি যে, সংসার আমরা নিজেরা চালাই-তেছি ; কিন্তু সংসার যাহার রূপা ছাড়া অচল হয়, এবং যে ব্যক্তি নিজে স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া পরের জন্ত কাঁদে, তাহার কান্নার ভগবানের আসন টলে, তিনি সেই সংসারের ভার নিজের হস্তে লন ।

একান্তভুক্ত পরিবারে আত্মীয়গণের জন্ত যে দুঃখ ও ত্যাগ সহিতে হয়, তাহা কখনই গৃহিণী—স্বামীর কানে তুলিবেন না । সকল ছেলেকে সমান চক্ষে দেখিতে চেষ্টা করিবেন । শিশুগণ সংসারের কিছুই জানে না,
 একত্র থাকার অমূল্য
 কতকগুলি নিয়ম
 —তাহাদের সম্পর্কে ভেদ-বুদ্ধি দেখান উচিত নহে ।
 নিজের ছেলের উপর অবশ্য স্নেহ সমধিক হয়,—সেই

গভীর ভালবাসা প্রকাশ্যে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, বাহিরে না দেখাইলে মাতৃ-স্নেহ কমিবে না,—সমুদ্রের কোন ভাটা নাই । অথচ প্রকাশ্যে সমস্ত শিশুদের প্রতি সমান ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন বেশী দৃঢ় হইবে, এবং একজনকে অপরে ঘৃণা করিতে শিখিবে না,—বা একজন আদরের ভাগ, বেশী পাওয়াতে অপর সকলের মুখ ছোট হইয়া বাইবে না ।

একান্তভুক্ত পরিবারের গরম্পরের মধ্যে কাহারও কোন দোষ ঘটিলে তাহার অবর্তমানে সেই দোষের আলোচনা করা সম্ভব নহে । স্বভাবতঃ রাগের সময় যে কথা হয়, তাহার কাঁজ থাকে ; তারপর সেই কথা যদি তৃতীয় ব্যক্তির মুখে অতিরঞ্জিত হইয়া আলোচ্য-ব্যক্তির কানে পৌঁছায়, তাহা হইলে তিল বড় হইয়া ভাল হইয়া পড়িবে । এই জন্ত বাহার সম্পর্কে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাকে বলাই ভাল । অপরাধী ব্যক্তিকে স্নেহের সহিত তাহার দোষ দেখাইয়া দিলে সে লজ্জিত হইবে । কিন্তু সে যদি একরূপ বোঝে যে, তাহার কথা লইয়া বাড়ীতে একটা জটলা

হইতেছে, তবে সে নিজের অপরাধ ভুলিয়া রাগিয়া যাইবে। এই জন্ত যৌথ-পরিবাররূপ জাহাজ সংসার-সমুদ্রের উপর ভাসাইতে হইলে কর্ণধারগণ অসাক্ষাতে আলোচনা-রূপ ঘূর্ণাবর্ত হইতে উহাকে রক্ষা করিবেন। এই আলোচনা হইতে গৃহ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। ঝি, চাকর কি নিজের ছেলেদের মধ্যে প্রথমতঃ এইরূপ সমালোচনা আরম্ভ হয়, তারপর গৃহস্থ গৃহিণীর মুখে সেই আলোচনার সার সংগ্রহ করেন। যাহাদের বিষয় লইয়া আলোচনা হয়, হাজার গোপনে হইলেও তাহারা তাহা টের পায়, এইভাবে মনান্তর ঘটে। তখন একের দোষ অস্ত্রে বাড়াইয়া বলিতে থাকে, সেই অসাক্ষাতের আলোচনায় ক্রোধ ক্রমশঃ জন্মিয়া উঠে। তারপর সামান্য কোন কথা লইয়া বড় বড় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যেমন ভিতরে নালি লাগিলে ঘায়ের উপর শুকাইলে কি হইবে? সেইরূপ ভিতরে যদি বিবেচনের সৃষ্টি হয়, তবে অপরের চেষ্টায় সাময়িক সন্তোষের ভাণ রাখিলে কি লাভ হইবে? কোন সময় দুই শিশুর সামান্য মারামারি উপলক্ষে কোন অভিভাবক অভিভাবিকার ক্ষুদ্র মন্তব্য একরূপ প্রবলাকার ধারণ করে যে, শেষে উকীল ডাকিয়া সেই পৈশাচিক ব্যাপার সবন্ধে মন্তব্য লওয়া হয়—এক ভাই অপরকে কিরূপে জল করিবে, তাহারই প্রাণান্ত চেষ্টা হয়। এটা সকলেরই জানা আছে যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের মত একটা প্রকাশ্য কাণ্ড এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল,—সুতরাং আদালতে যে প্রত্যাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র এই ভাবে নিত্য নিত্য সংঘটিত হইবে—তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

শকুনি মহাশয়ের চেষ্টায় এই সকল ব্যাপার ক্রমশঃ ফাঁপিয়া উঠে, তখন শকুনি মহাশয়েরা এক এক পক্ষের প্রাণাপেক্ষা অন্তরঙ্গ হইয়া উঠেন।

দোষ আলোচনার ফলে এইরূপ যে আত্মীয়তার বৃদ্ধি
শকুনির চেষ্টা হয়, তাহা হইতে অসম্ভব কিছু কল্পনা করা যায় না।

শকুনি পুরুষজাতীয়ই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন, তাঁহাকে কিছুতেই প্রেশ্র দেওয়া উচিত নয়। যৌথ-পরিবারের যে যাহার দোষ দেখিবে, তাহাকে সম্মুখে ডাকিয়া শাসন করিবে। ঘেহের শাসন সকলেই মাখার করিয়া লইতে প্রস্তুত। গুরু-

জনের দোষ দেখিলে যতটা সহিতে পারা যায়, তাহা সহিবে। “যে সহে সে রহে” ইহাই প্রবাদ কথা। যে নীরবে সহ করে, ভগবানের স্নিগ্ধ চক্ষু গোপনে তাহার হৃদয়ের দিকে ত্রস্ত থাকে। যখন অসহ্য হইবে, তখন তাঁহার পারে পড়িয়া ক্লেশ জানাইবে। তখন তাঁহার দয়া হইবে। যৌথ-পরিবারের সুখ-শান্তি স্বর্গীয় জিনিস; উহা সকলের হৃদয়ের নির্মলতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপর দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা যখন পূর্ণ শোভার বিকাশ পায়, তখন ইহাকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই ফুলের বাগান একটা ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে। বিবেচনের কীট ঢুকিলে হুদিনে ফুলগুলির গোড়া কাটিয়া ফেলিবে।

যৌথ-পরিবার রক্ষার আর একটা প্রধান উপায় চিত্ত-সংযম। হঠাৎ রাগিয়া নাহুয এমন কাজ করিয়া বসে যে, প্রীতির বন্ধন সমস্ত একচোটে

ফস্কিয়া যায়। আমার এক বন্ধু বলিয়াছেন, যখন

চিত্ত-সংযম

তাঁহার রাগ হইত, তখন তিনি এক হইতে একশত

পর্যন্ত গণিতেন; রাগের সময় অপরের দোষগুলি বৃহৎ হইয়া চোখের সামনে ঠেকে, এবং ত্রায় অভ্যাসের একটা বিকৃতি যুক্তি মাথার মধ্যে প্রবেশ করে; সেই যুক্তির মধ্যে নিজের দোষের চিন্তা আদৌ থাকে না; কেবল পরের কার্য্য-সমালোচনার চেষ্টা থাকে। নিজের কর্তব্য কি? এই প্রকৃত্ত কথটির খেই হারাইয়া যখন কোন লোক কেবল পরের দোষের চিন্তা করে, তখন সে তাহার কর্তব্য-নিরূপণের একেবারে অযোগ্য হইয়া পড়ে। আপো তাঁহার মন স্থির করা আবশ্যক। রাগের সময় এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণিলে এই সময়ের মধ্যে বড় অনেকটা শান্ত হইয়া যায়, হৃদয়ের বিকার অনেকটা ঘোচে, তখন কথা বলিবার যোগ্যতা কতকটা লাভ হইতে পারে। ঠিক রাগের মুহূর্ত্তে কথা বলিলে জিহ্বা অসংযত হইবে, এবং এমন সকল বাক্য উচ্চারণ করিবে, যাহার জন্ত পরিণামে অনুশোচনা করিতে হইবে। আমার বন্ধু অপেক্ষা আমি একটু বেশী দূরে বাইতে চাই। রাগ হইলে অন্ততঃ ছই তিন ঘণ্টা পরে সেই কথা মাথায় আনা উচিত। আমি পরকে গালি দিব

ইহা অপেক্ষা দুর্নীতি আর কি হইতে পারে ? শিশুর মৃত্যু হইলে মা ভাল-বাসিয়া তাহাকে যে সকল গালাগালি দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও তাঁহার কত কষ্ট হয়। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে গালাগালি দেওয়ার আমাদের কি অধিকার থাকিতে পারে ! যে গালাগালি দেয়, যদি প্রকৃতই কেহ তাহার উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তথাপি সে লোকের সহানুভূতি পায় না। পরকে জিহ্বা দ্বারা পীড়ন করা আমাদের অত্যাচার। যিনি জিহ্বা দিয়াছেন ও কথা শিখাইয়াছেন, তিনি কালই আমার কথা বলিবার শক্তি হরণ করিতে পারেন। বাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছি, বা বাহারা নীরবে আমার অত্যাচার সহ্য করিতেছে, আমার দশা কাল তাহাদের অপেক্ষাও শতগুণে হীন হইয়া বাইতে পারে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে আমরা কখনও রাগিতে দেখি নাই ; আমি একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “আপনি কখনও রাগেন না, এরূপ সংঘর্ষ কিসে পাইলেন ?” তিনি বলিলেন, “আমি কখনও কাহারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করি না ; এইজন্য যে বাহা করুক, আমার কিছুতেই রাগ হয় না।” আপনারা অনেকেই সক্রোতিসের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ কখনও রাগিতে দেখেন নাই। কয়েকজন বন্ধু চেষ্টা করিলেন, তাঁহাকে রাগাইতে পারেন কি না। তাঁহারা সন্ধান করিয়া জানিলেন, সক্রোতিস্ ভাল বিছানা না হইলে শুইতে পারেন না। চাকরকে ঘুম দিয়া তাঁহারা একদিন বিছানাটা অপরিষ্কার করাইয়া রাখিয়া দিলেন ; সক্রোতিস্ পরদিন চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিছানাটা অপরিষ্কার ছিল, ভাল করিয়া রাখ নাই কেন ?” চাকর বলিল, “কাজের তাড়ায় সে উহা করিয়া উঠিতে পারে নাই।” দ্বিতীয় দিনও বিছানার প্রতি কোন বদল লগ্না হয় নাই, সক্রোতিস্ আবার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, চাকর বা হোক একটা কৈফিয়ৎ দিল। কিন্তু তৃতীয় দিন চাকরের অনুতাপ হইল, সে সক্রোতিসের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল এবং বলিল, তাঁহাকে রাগাইবার লক্ষ্য চেষ্টিত বন্ধুদের প্রয়োচনার সে ঐরূপ করিয়াছে, কিন্তু রাগাইতে পারে নাই। সক্রোতিস্ বলিলেন, “তুমি আমার উপকার করিয়াছ, ধারাপ

বিহানার শুইতে আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।” কোন কোন জীলোক হয়ত কাহারও উপর রাগিয়া, সে রাগ বাহিরে সামলাইয়া লইলেন, কিন্তু তখনই স্বীয় নিরপরাধ শিশুটির পৃষ্ঠে বিষম কিল-চড় মারিয়া নবের ঝাল মিটাইলেন। বাহার উপর তিনি রাগিয়াছেন, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিলে মনে করিবেন যে, ঐ কিল প্রকৃতপক্ষে শিশুর উপর পড়ে নাই, তাঁহারই উপ পড়িয়াছে। এই সকল অভিনয় হইতে একারভুক্ত পরিবারের লৌকিকতা সত্য থাকিবেন। কারণ, এইরূপ শিশুর প্রহারে একারভুক্ত পরিবারের ভিত্তি অন্ত সময় নাড়া পড়িয়া থাকে।

গৃহিণী পরিবেশনের সময়ে লক্ষ্য রাখিবেন,—সকলে সমান ভাবে পাইতেছে কি না? কলিকাতার কোন রাজা তাঁহার কর্মচারী ও আত্মীয়গণের সনে একত্রে বসিয়া খাইতেন, তাঁহার বাহা খাইতেন, তিনি নিজেও তাহা খাইতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন, কিন্তু

সমস্যা

তাঁহার এই উদারতার স্বজন ও কর্মচারীগণ তাঁহার প্রতি বৈরূপ আকৃষ্ট ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। নিজের ছেলে ও অপ-রের ছেলের মধ্যে মিষ্টাঙ্গাদি বিতরণের সময় অনেক গৃহিণীই একটু পার্থক্য দেখাইয়া থাকেন। একারভুক্ত পরিবারের পক্ষে এই আচরণ ভাল নহে। তাঁহার এই পক্ষপাত সেই সকল শিশু লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহাদের জনক-জননীরও উহা ব্যথার সঙ্গে অনুভব করেন। নিজের ছেলের মাছ কিংবা মিষ্টানের ভাগ বেশী হইল, দেবরপুত্র বা ভাগিনেররা কম পাইল, এই বিসদৃশ ব্যবহার শিশুরা কিছুতেই ভোলে না। তাহারাই ইহাতে মর্শ্বাস্তিক কষ্ট অনুভব করে, যদিও এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাহার কোন কথা বলে না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন আমি আমার খুব নিকট-আত্মীয় কোন ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সে বাড়ীর গৃহিণী অতি উদার-চেতা, নিজের ছেলে পরের ছেলে তাঁহার নিকট সমান ছিল; অন্ততঃ আহার করিতে বসিয়া আমরা তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে কোন পার্থক্যই অনুভব করিতাম না। একদিন তিনি

আমাকে ও তাঁহার ছেলেকে বাইতে ডাকিয়া দুইখানি খালা আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন, তখনও খান্ড পরিবেশন করেন নাই। আমাকে যে খালা-খানা দিয়া গেলেন, তাহা ভাল, নিজের ছেলেকে একটা ভাঙ্গা খালা দিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে। হাতের সামনে বাহা পাইয়াছিলেন, যে নিকট, তাহাকে তাহাই দিয়াছিলেন। পরিবেশনের সময় তাঁহার কাষ্ঠান্তরে ডাক পড়িল, তিনি স্বীয় দেবর-পত্নীকে পরিবেশন করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। দেবর-পত্নী আসিয়াই আমার খালাটি ভাল ও বাড়ীর ছেলের খালাটি ভাঙ্গা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—“ওগো, এই ভাঙ্গা খালাটা ইহাকে কে দিয়াছে ?” এই বলিয়া সেই ভাঙ্গা খালাটা ঘুরাইয়া আমাকে দিলেন, ও ভাল খালাখানা তাহার সম্মুখে রাখিলেন। যদি প্রথমে ভাঙ্গা খালা পাইতাম, তবে কিছুই মনে হইত না ; কিন্তু এইরূপ বিসদৃশ আচরণে আমি এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম যে, আজ এই দীর্ঘকাল পরেও আমার সেই কথাটি মনে আছে।

একান্তভুক্ত পরিবারে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে হইলে এই ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ইচ্ছাকে দমন করিতে হয়। ইহাতে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বাঁহারা সুগৃহিণী, তাঁহার। কোন কষ্টই অনুভব করেন না ; স্বাভাবিক উদারতার গুণে তাঁহার। সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বাড়ীর সকলের প্রতি ভালবাসা হইতেই আপনা-আপনি চিত্ত-সংগম অভ্যাস হইয়া যায়। স্বগণ এবং ভৃত্যোপাধিও তাঁহার কর্ণধর, ত্যাগ ও সকলের প্রতি সমান দৃষ্টির দরুণ মুগ্ধ হইয়া সেই সংসারে বাঁধা পড়িয়া থাকে।

আগেকার দিনে ঘরে ঘরে সেইরূপ লক্ষ্মীরা ছিলেন। তাঁহার। উলে টুপি বুনিতে জানিতেন না, বা কাঠবুক হইতে ছ-ছয় ইংরাজী পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার। বাড়ীর সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং সকলকে ভালবাসিতেন ; তাঁহার। ক্ষুধার সময় অন্ন দিতেন, পালাপালি দিয়া বিদ্যার করিতেন না ; বাড়ীর কাহারও কোন কষ্ট হইলে তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন এবং আদর ও উপদেশে সেই ব্যথা ঘুচাইতে চেষ্টা

করিতেন; খাইবার ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন কাহার কি অসুখ করিয়াছে, এবং কে কোন্‌ জিনিস খাইতে ভালবাসে, তাহা হয় ত সেই ব্যক্তি নিজে যতটা না জানে, গৃহিণী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানিতেন। প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাঁহার খাটাই-
 তেন না; যে দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে তাড়া দিতেন না; যে একটু শাস্তির দস্ত গৃহে ফিঁসিত, তাহাকে দ্বিগুণ অশাস্তির মধ্যে ফেলিতেন না। তাঁহার সরল কথার দোষ দেখাইতে বিধা বোধ করিতেন না; যে অজ্ঞার করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাসন করিতেন, কিন্তু অজ্ঞারূপ শাসন করিতেন না; যে শাসনে বিগড়াইয়া যায়, সে শাসন করিতেন না; এবং যে আদরে ছেলেদের ভবিষ্যৎ মাটি হয়, সেরূপ আদর দেখাইতেন না। ভাঁড়ার-ঘরের তাঁহারা লক্ষ্মী ছিলেন, রান্নাঘরের তাঁহারা অন্নপূর্ণা ছিলেন, এবং পরিবেশনকালে তাঁহারা দয়াময়ী ছিলেন। তাঁহারা নিজের সুখ খুঁজিতেন না; নিজের দুঃথকে যতটা সরাইয়া রাখা সাধ্য, তাহা রাখিতেন, এবং পরের দুঃথকে নিজের দুঃখের মত মনে মনে করার দরুণ সকলকে আপন করিতে পারিতেন। আমি কি খাইব, কি পরিব, ও সেক্কার বাড়ীর গহনার ফর্দ কিরূপ হইবে, বাজারে নূতন ধরণের কোন্‌ বহুমূল্য লাড়ী আসিয়াছে, স্বামীর কাছে দিনরাত্রি তাহারই বায়না ধরিয়া থাকিতেন না। বাড়ীর সকলে সুখী হইলেই তাঁহার সুখী হইতেন। সকলের সেবার প্রাপণে নিজেকে নিবেদন করিয়া দিয়া—সেই সেবার সকলে সমুদ্র হইলে তাঁহার তাহাই সর্বা-
 পেক্ষা বেশী পুরস্কার মনে করিতেন। স্বামীর প্রতি ভালবাসা লইয়া তাঁহার আড়ম্বর করিতেন না, সেই প্রেম একান্তভাবে গুপ্ত থাকিত; কিন্তু স্বামীর মূহুর্তে তাঁহাদের অপূর্ণ প্রেম ধরা পড়িয়া যাইত, নিজের ছেলেদের নিদারুণ শোক উপেক্ষা করিয়া বিবাহের সময় বেক্রপ নববস্ত্র পরিয়া সিন্দূর মাখার দিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইরূপ নূতন বস্ত্র পরিয়া সিন্দূর-মাখার স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে অগ্নি-যজ্ঞ আশ্রয় করিতেন। বৈধব্যেও তাঁহার পাতিত্রতা ও ধর্মের

কঠোরতা অবলম্বন করিয়া এবং ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যে উন্নত জীবন দেখাইতেন, তাহার তুলনায় এখনকার নভেল-পড়ার উৎপন্ন মনের সাম-
ন্থিক উদ্বেজনাগুলি একান্ত খেলো মনে হয়। তাঁহারা সারাদিন পরিশ্রম করিয়া
রাগা ও পরিবেশনাদি করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর বেলায় পর খাইতে বসিতেন, এমন
সময় অতিথি আসিল—আর নিজের ভাতের খালাটি ধরিয়া তাহাকে দিয়া হাসি-
মুখে উপবাস করিয়া রহিলেন, হয় ত তাহা বাড়ীর কেহই জানিল না। কিন্তু
যিনি লোকের সুখ-দুঃখের নিরস্তা, উহা নিশ্চয়ই তাঁহার দয়ার দৃষ্টি এড়াইতে
পারিত না।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, এ সকল স্ত্রী-জাতির উপর অত্যাচারের কথা,
ইহাতে প্রশংসার কথা কি আছে? পুরুষেরা যে একান্ত স্বার্থপর, ইহাতে তাহাই
প্রমাণিত হয়। কিন্তু যেখানে বাধ্য-বাধকতা নাই, এবং শ্রমের জন্য কষ্ট
স্বীকার করা হয়, সেখানে যে কষ্ট, তাহা তপস্বী; তাহাতে জীবন উন্নত
হয়, সেই কষ্ট খুব বেশী হইলেও তাহা অসহনীয় হয় না, কারণ, তাহা
স্নেহ-মমতার কষ্ট। স্নেহের জন্য মা কি না করিয়া থাকেন? তাহাতে কি
তিনি কষ্ট বোধ করেন? বরং তাহা সুখের, সেই সেবাতে আমাদের জীবন
সকল হয় এবং উহা আনন্দময়ের কাছে আমাদের লইয়া যায়। যিনি বৃহৎ
সংসারে মাতৃরূপিণী, তিনি মাতার মতই স্নেহের সহিত বুক পাতিয়া সেই সংসারের
দুঃখ-কষ্ট সহিয়া থাকেন।

একাদিকৃত গৃহস্থালীর পক্ষে সহর হইতে পল্লী-জীবন উপযোগী। সহরে
ব্যয়বিস্তৃত গৃহস্থ কখনই খুব একটা ফাঁকা জায়গা পাইতে পারেন না। ক্ষুদ্র
বাড়ীতে অনেককে লইয়া থাকার সুবিধা হয় না।

সহর ও পল্লী

সহরে মুড়ি-মুড়কির চা'ল নাই; সকলের জন্য ভাল
জল-খাবারের ব্যবস্থা করা সহজ হয় না। তাহা ছাড়া পচা চর্কি যি বলিয়া
খাইতে হয়, তাহাও অস্বাস্থ্য। টাকার ৮৪ সের হুখের অনেকটাই জল, কিংবা
তদপেক্ষা স্বাস্থ্যের হানিকর দ্রব্যের মিশ্রণ। একটু কোথাও বাইতে হইলে

টানভাড়া, পোষাক-পরিচ্ছদও কতকটা সত্যভাব্য রকমের করিতে হয়, কুত না হইলে একদণ্ডও চলে না। বহুলোক একত্র এক বাড়ীতে থাকিলে পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় বড় অসুবিধা হয়। তাহার জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা হইতে পারে না, এবং দিন-রাত্রি অজস্র-ব্যয় করিয়া গৃহস্থ একরূপ কাহিল হইয়া পড়েন যে, বাড়ীর সকলের দিকে মোটেই নজর রাখার সময় এবং সুবিধা পান না। সুতরাং অনাদরে থাকিয়া ছেলেরা ফেরিওয়ালার নিকট হইতে মটরভাড়া ও চিনা-বাদাম খাইয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করে, এবং ভাঁত খাইল কি না খাইল, ইহার একটা খোঁজ-খবর রীতিমত না হওয়াতে তাহার ভগবানের ক্রুপামাত্র আশ্রয় করিয়া বয়সের দক্ষণ বাড়িয়া উঠে; নানাবিধ পীড়া তাহাদের জন্য অকাল-মৃত্যুর কটক-শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে। তাহার পর অভিভাবকগণের মনোযোগের ক্রটির ফলে তাহার কুসঙ্গীর সঙ্গে লাভ করিয়া ভাবী জীবনে দহ্মা, তস্বর ও হীন-চরিত্র হইবার সুযোগ করিয়া লয়।

সুতরাং সহজে বহু-স্বগণ-পরিবৃত্ত হইয়া থাকার সুবিধা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের পক্ষে ভালরূপ হয় না। পল্লী-জীবনই যৌথ-পরিবারের উপযোগী। তথায় অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীই অন্ততঃ দুই বিঘা লইয়া। গরু রাখিবার ব্যবস্থা সহজে হয়, তরীতরকারী ও গাছের ফল অনেক সময় বাড়ীতেই পাওয়া যায়, পুকুরের মাছও গৃহস্থ পাইতে পারেন। খোলা জায়গায় স্বজনগণ লইয়া থাকার অসুবিধা নাই। এখনও অতি অল্পব্যয়ে পল্লীগ্রামে সংসার চালান যায়। তথায় জমির দাম এত সস্তা যে, খানিকটা জমি লইয়া ফল ও তরীতরকারী জন্মাইতে পারিলে তাহা লাভের হয়, কিছু ধেনো জমি সঙ্গে থাকিলে চা'লের জন্য ভাবিতে হয় না।

কিন্তু অধিকাংশ পল্লী লোকের উপেক্ষায় একরূপ বাসের অযোগ্য হইয়া আছে। বাঁশের ঝাড় ও ভোবাগুলি মশকের হারী রকমের বাসাবাটা বলিলে অত্যাক্তি হয় না। জমল পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। জাতির সঙ্গে বাসলা করিতে বাইরা বাঁহাঙ্গ ঘরবাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন,

তাঁহারা বাড়ীর পার্শ্বে নরককুণ্ডের মত ডোবাটি পরিষ্কার করিবার কথা উঠিলে, পরসার অভাব জানাইয়া থাকেন। অনেক গৃহস্থের বিস্তর জমি পড়িয়া আছে, তাহা বোর অরণ্য হইয়া আছে ; কিন্তু অনেক সময় গৃহস্থ তাহা বিক্রয়ও করিবেন না, পরিষ্কারও রাখিবেন না, বা তাহাতে রায়ও বসাইবেন না। ইহাদিগকে কর্তব্য শিখাইবার জন্ত আইন প্রস্তুত করা আবশ্যক। ইহাঁরাই ম্যালেরিয়ার চির-সহায় ও আশ্রয়দাতা। পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থই পুকুর কাটাইতেন, পানীর-জলের ব্যবহার জন্ত রাজা প্রজা সকলের সমবেত চেষ্টা ছিল। এখন যে পুকুর-গুলি আছে, তাহার জল পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা কেহ করিবেন না ; এ অবস্থায় অনেক পল্লী যে দুঃস্বাসের চরম-সীমার উপনীত হইয়াছে, ইহা আর একটা বিচিত্র কথা কি ?

কিন্তু আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, পল্লী-জীবনই অবলম্বন করিতে হইবে। সহরের বৈজ্ঞানিক আলো আমাদের পথ উজ্জ্বল করিবে না, সহরের ট্রামে আমাদের গন্তব্য স্থির হইবে না ; রক্তমঞ্চের অভিনয় ও ব্যরকোপে আমাদের জীবনে প্রকৃত ক্ষুণ্ণি কিরিয়া পাইব না। আমাদের মেয়েরা যদি এ কথা বোঝেন, তবে আমাদের ইহা বুঝিতে দেরী হইবে না। তাঁহারা সহরে থাকিতে চাহেন বলিয়া আমরা সহরে আসিয়াছি। তাঁহারা যদি এই সকল আমোদ ও আশান্তঃ সুবিধাগুলির মোহে অন্ধ না হইয়া পল্লীর গৃহস্থালীকে বরণ করিয়া লন, তবে পল্লীতে ভক্তলোকগণ কিরিয়া বাইবেন এবং পল্লীগুলির অবস্থা ভাল হইবে। তাহা হইলে আমরা খাইয়া বাঁচিব এবং আমাদের ছেলের দীর্ঘায়ু হইবে। ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে গ্রামগুলিকে কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় দেখাইয়াছেন। তিনি একক বাহা করিয়াছেন, পল্লীবাসিগণ একত্র হইয়া তাহা করিতে পারেন। আমরা যদি এ বিষয়ে বত্বপন্ন না হই, তবে কখনই বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না। সহরে বাস করিয়া মধ্যবিত্ত ভক্তলোকেরা নানারূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ বিলাসের মোহে দুর্গতিকে দুর্গতি বলিয়া মনে করিতেছেন না। পল্লীবাসীগণের মধ্যে

বাঁহারা উপার্জন করিবেন ও লেখা-পড়া শিখিবেন, তাঁহাদের সহরে থাকিতে হইবে, কিন্তু পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রভূমি পন্নী থাকিবে, এই ব্যবস্থা করা ভাল।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের চলাফেরার কোন অসুবিধা হিল না, এখনও নাই। পল্লীবাসিনীরাজলের কলসী কাঁখে লইয়া নদীর ঘাটে অনেকটা হাঁটিয়া যান, এ
 পাড়া হইতে ও পাড়ার তাঁহাদের সর্বদা গতিবিধি ;
 মেয়েদের চলাফেরা

তাঁহাদের লজ্জার খুঁই একটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি নাই। পথে অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাঁহারা একটু বোম্‌টো টানিয়া সরিয়া দাঁড়ান, এই পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া উৎসব ও কোন ক্রিয়া-উপলক্ষে মেয়েরা হাঁটিয়া এ বাড়ী ও বাড়ী যাতায়াত করেন ও গৃহকর্মের অহুরোধে বাড়ী-সংলগ্ন ক্ষেত্রাদির পরিদর্শনও নিজেরা করিয়া থাকেন। দুই ভ্রমরের মেয়েরা পাড়াগাঁয়ে গরুর রাখালি করিতেও বিধা বোধ করেন না।

কিন্তু সহরের অবস্থা তুলনা করুন। মেয়েরা তথায় শিকরের পাখী, এ উপমায় কিছুমাত্র অলঙ্কার দেওয়া হয় নাই। তাঁহাদের সমস্ত গতিবিধি দুই এক-খানি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। বাহিরে জীবদ্বীনতার বড় বড় বক্ষুতা চলিতেছে, কিন্তু সহরের জীলোকদের মত পরাধীন জীব কল্পনা করা যায় না। উপর হইতে কখনও কখনও সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামা এবং দিবারাত্রি প্রায় সমস্ত সময়ই এক ঘরে পড়িয়া থাকা, ইহাতে তাঁহাদের শরীর সকল প্রকার গতিবিধির সুবিধা খোঁওয়াইয়া কিরূপ ব্যাধি ও আগন্তের জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন।

বাঁহারা শিশুকালের পর জীবনে হাঁটিলেন না, তাঁহারা কিরূপ অস্বাভাবিক হইয়া পড়িলেন, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এই সকল জীলোকের সম্ভাবনার যে জন্মাবধি বাতরোগে কষ্ট পাইবেন ও পঙ্গু হইয়া পড়িবেন—তাহা সহজ-সিদ্ধ কথা। আমাদের পারিবারিক জীবন এই ভাবে চলিলে, প্রতি গৃহ বাত-রোগের হাঁসপাতাল হইয়া দাঁড়াইবে; স্বভাবের এইরূপ প্রতিকূলতা কখনই জীবনের

লক্ষণ নহে। অথচ সহরের চারিদিকে অজ্ঞাত লোকের বস-বাস থাকায় জীলোকের গতিবিধি বর্তমান হিন্দু-সমাজের নিয়মামুসারে অধিক স্বাধীন করা যায় না।

এই সকল কারণে মেয়েরা যদি পল্লী-জীবনের পক্ষপাতী হন, তবে আমাদের সমাজের মঙ্গল। পল্লীগ্রামের অসুবিধাগুলি কি ভাবে দূর করিয়া উহাদিগকে বাসযোগ্য করা যায়, তাহা এখন জ্ঞাপুরুষের একত্র হইয়া তাবিবার বিষয় হইয়াছে। বড় লোকদের সম্বন্ধে আমার কথাগুলির বেশী সার্থকতা না থাকিতে পারে। তাঁহারা সহরের উপরই চার পাঁচ বিধা লইয়া বাড়ী ও তাহার আঙ্গিনার পত্তন দিয়াছেন; এবং মেয়েদেরও গৃহপিঞ্জরের রেলিং বা দাঁড় ধরিয়া দিনরাত থাকিতে হয় না। তবে পল্লী-জীবন হইতে দূরে থাকিয়া তাঁহারা দেশের লোক সম্বন্ধে এবং দেশীয় সমাজ হইতে একরূপ ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন যে, অনেক সময়েই তাঁহারা দেশের কোন কাজেই লাগেন না। তাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকিলে তাঁহাদের প্রকৃত পদ-গোরব তাঁহারা বেশী বুঝিতে পারেন,—কারণ, তাঁহাদের সেই স্থানেই রাজত্ব, সহরে তাঁহারা নামে মাত্র রাজা বা বড় লোক। পল্লীগ্রামে যদি বড় লোকেরা থাকিতেন, তবে পল্লীর অবস্থা আজকাল আর একরূপ ধারণ হইত না।

পূর্বে পাড়াগাঁয়ে সকলের বাড়ী সংলগ্ন একটা কুলের বাগান থাকিত। যাহাদের মালী রাখিবার শক্তি না থাকিত, তাঁহাদের ছেলেরা সকালে উঠিয়া

কুলগাছের গোড়ায় জল সঁচিৎ। সকল ছেলেই,

কুলের বাগান

বিশেষতঃ ছোট ছোট মেয়েরা কুল কুড়াইয়া

আমোদ পাইত। পুষ্প-সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিলে মানুষের মন সরস হয় কি না, এবং ধর্মভাব জাগ্রত হয় কি না, তাহা আপনারা বুঝিবেন। কুলের মত সুন্দর দ্রব্য পৃথিবীতে কিছুই নাই; একটা কুল দেখিলে ভগবানের কারুকার্য ও দয়ার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক,—ইহারা নীরবে সেই রস-বন্ধনের আনন্দের কথা কহিয়া যায়। উহাদিগকে লইয়া বাহারা প্রত্যহ খেলা করে, তাহাদের কাছে হঠাৎ তাহারা হয় ত সেই আনন্দের সংবাদ কহিতে পারে। শিশুর পক্ষে উহারা প্রকৃতির মনোরম শাস্ত্র। শিশু নির্মল, কুলও নির্মল। শিশু

ফুলের যোগ্য ও ফুল শিল্পের যোগ্য,—এবং উভয়েই স্বর্গের যোগ্য। ইহাদের একটা সম্বন্ধ থাকিলে তাহা লাভের ও সুখেরই সম্বন্ধ।

কিন্তু সহরের ছেলেরা হাঁ করিয়া ফেরিওয়ারার নিকট হইতে শোনার ফুল কিনিয়া থাকে। কোন কোন বালক বা যুবককে টব আনিয়া ফুলের চারা লাগাইতে দেখিয়াছি। স্বাভাবিকভাবে যে সকল চারা মাটি হইতে রস পাইয়া স্বর্গের বাতাস ও আলোকের দ্বারা পুষ্ট হয়, তাঁহাদের সঙ্গে টবের ফুলের গাছের অনেক তফাৎ। মায়ের কোলে ছেলেটিকে যেমন 'সুন্দর দেখার, খাজীর কোলে কি সেরূপ কখনও দেখাইতে পারে ?

বড় মানুষদের জীবন কতটা কৃত্রিম হইয়া যায়, এই উপলক্ষে তৎসম্বন্ধে চাই একটা কথা বলিব। আমাদের দেশের কেহ যদি এমন একটা বিদেশে যান, যেখানে তুলসী কি নিমগাছ জন্মায় না,—তাহা হইলে হয় ত টবে করিয়া উহা তথায় লইয়া গিয়া—উহার প্রতি সে ব্যক্তি আদর দেখাইবে। উহা তাহার জন্ম-ভূমির স্মারক-লিপির মত। উহার বাহিরের কোন সৌন্দর্য্য থাকুক বা না থাকুক, এ দেশের লোকের ধর্ম্মভাবের ও শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে ঐ গাছের এমন একটা যোগ আছে যে, বিদেশে তুলসীর একটি চারা পাইলে সে তাহার দশগুণ বেশী মূল্য দিয়া কিনিবে এবং সেটিকে প্রাণের বস্তু করিয়া তুলিবে। সাহেবেরা শীতপ্রধান দেশে থাকেন, তাঁহাদের দেশের অনেক কচুপাতা বা বেতের বন বা ফুলহীন পাতায় গাছ, ঐ রকম কোন কারণে তাঁহাদের প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের শত শত সুগন্ধি ও ঘর-আলোকরা ফুল থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা চিরাগত সংস্কারের ফলে ঐ সকল শোভা-সুগন্ধি-শুভ গাছের চারা বেশী পছন্দ করেন। সেগুলি বোর বিদেশে তাঁহাদিগকে স্বদেশের কথা মনে করাইয়া দেয়। হিমালয়ের তুষার-শৃঙ্গের কোন স্থানে তাঁহারা সেই চারা পাইলে একটা অসম্ভব বেশী মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা কি বোকা ! আমরা আমাদের গন্ধের ধনি, শুভ্রতার নির্মালা—বেল জুঁই তুলিয়া ফেলিয়া নোহপ্রস্তের দ্বার অসম্ভব দাম দিয়া কতকগুলি কচু

ও বেত কিনিয়া আনিতেছি, এবং তাহাদের ল্যাটিন নাম শুনাইয়া দর্শকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি ! দর্শকের চক্ষু একান্ত বিকৃত না হইলে, তাহাতে কিছুতেই ভুলিবে না। হে দেশী গোলাপ,—রজনী-গন্ধা, জুঁই, বেল ও মালতী—তোমরা শোভার আকর, তোমাদের শোভা ও সুগন্ধি বৃষ্টির শক্তিও আমরা হারাইয়াছি। লাল বর্ণের ছিট-বৃক্ষ বড় বড় কচুর পাতা তোমাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে ; তাহারা কোন্ কুহকে বড় মানুষদের মন ভুলাইল, ও তোমাদিগকে দেশত্যাগী করিতে চলিল, তোমরা ভাবিয়া পাইতেছ না। আমি একদা মফঃস্বলের কোন রাজ-বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়াছিলাম—একটা বৃহৎ জারগা জুড়িয়া ঐ প্রকার কচু, বেত এবং সাবু গাছের মত বড় বড় গাছ রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি বড় ল্যাটিন নাম আছে ও তাহাদের আনিবার ব্যয় ও কষ্ট সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা গৃহ-কর্তারা আমাকে শুনাইলেন। একজন সামান্য প্রজা বলিল, “মহাশয়, এই জারগায় বেক্রপ নেংড়া, ফজলী আমের গাছ ছিল, তাহার তুলনা বাঙালা দেশে নাই, এবং এই টবগুলি যেখানে আছে, সেখানে আগে প্রাতেকালে বড় বড় গোলাপ ফুটিত ও সন্ধ্যাকালে চাঁপা, রজনী-গন্ধা, নাগেশ্বর ও সন্ধ্যা-মালতী ফুটিয়া স্থানটিতে যেন দ্বিতীয় নন্দনবনের সৃষ্টি করিত।” সে প্রজাটি গোপনে যে ছুঃখের সহিত এই কথাগুলি বলিল, তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল।

মৈয়েরা, এই সমস্ত বিষয়ে পুরুষের রুচি বিগড়াইয়া না যায়, তাহা দেখিবেন। ফুলের বাগান আমাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে দরকার, উহা নিতান্ত বাজে সামগ্রী নহে। তাহা হইলে ভগবান্ প্রতি-গৃহের কোণে, রাস্তার ধারে এবং পুকুর-পাড়ে যথা-তথা উহাদিগের জন্ত আসন রচনা করিয়া রাখিবেন কেন ? উহার ক্রান্তির অপনোদন করে, মনকে প্রফুল্ল করে, উহাদের গন্ধ ও শোভা আমাদের আশ্বাসের পক্ষে উপকারী ; গৃহস্থ উহা বাদ দিয়া বাড়ী করিলে তাহা সিন্দূর-শুভ ললাটের মত অশোভন হইবে। পূর্বে পল্লীতে এমন বাড়ী ছিল না, যাহাতে ফুলের বাগান দেখা না বাইত ! এখন সহরের অধিকাংশ বাড়ীতে বিলাতি মাটির

রক বা চাতালগুলি ধরণীর বকে পাথর চাপা দিয়া রাখিয়াছে, ফুলের গাছ তাহা ভেদ করিয়া উঠিবে কিরূপে ?

সুগৃহিণীর কর্তব্য

সুগৃহিণী কি কি করিবেন, তাহার একটা তালিকা করা শক্ত। প্রত্যবে উঠিয়া গৃহে বাঁট দেওয়া, শিশুদিগের মুখ ধোয়াইয়া দেওয়া, তাহাদিগকে লইয়া ভগবানের নাম করা,—বিছানাপত্র তোলা ইত্যাদি তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য। ইহার মধ্যে অনেক কাজই তাঁহারা এখনও করিয়া থাকেন। যদি চাকর কি দাসীদের উপর কাজের ভার থাকে, তথাপি গৃহিণী প্রত্যবে উঠিয়া তাহাদিগকে খাটাইবেন। চাকর কি দাসীর সংখ্যা বেশী থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য নির্দ্ধারিত থাকিলে ভাল।

ভগবান্-আরাধনার কথা বলিয়াছি, অল্প কথায় তাঁহাকে গৃহের শুভাশুভ নিবেদন করিবেন ;—“এ সংসারে তোমারই ইচ্ছানু-
 আরাধনা
 সারে খাটিতে আসিয়াছি ; হে মালিক, হে প্রভু, আমার কিছুই নাই। গৃহের সকলেই তোমার ; আমি সকলেই তোমার নিবেদন করিয়া দিতেছি। আজ যেন সকলে সাধু-পথে চলে, কেহ যেন নিজের সুখ খুঁজিয়া পরকে কষ্ট না দেয়, এই পরিবারের,—সমস্ত সংসারের মঙ্গল হউক, তোমার বাহা ইচ্ছা, তাহা পালন করিতে যেন আমার কষ্ট না হয় ; তুমি বাহা দিবে, তাহাই তোমার প্রসাদ বলিয়া মাথায় করিয়া লইব, আমি নিজের সুখ খুঁজিব না।” ঠাকুরের নিকটে এইরূপ আরাধনা করিবে, গলবস্ত্র হইয়া ঘোড়-হাতে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিবে ! যদি গৃহে বিগ্রহ থাকেন, সেই গৃহের ধূলি কপালে মাখিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে ; যদি বিগ্রহ না থাকেন, তবে জগৎপতি সর্বত্র আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া উক্ত ভাবের আরাধনা করিবে। ছেলেরা

বলিবেন, “আমাদের আজ স্মৃতি হটক, আমরা আজ ভাল হইব। ভাল হইবার শক্তি আমাদের দিয়াছে, আমরা কেন মন্দ-পথে চলিব? আমরা নিজেরা চলিতে জানি না। হে জগৎপিতা! তুমি আমাদের হাত ধরিয়। স্পৃহা লইয়া যাও।”

গৃহীণীর প্রধান কর্তব্য ভাঁড়ার রক্ষা; ভাঁড়ারে যদি মাসের সমস্ত জিনিস থাকে, তবে তাহা গুছাইয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক সামগ্রীর উপরই যেন

ভাঁড়ার ঢাকা থাকে। ঢাকা না থাকিলে ইন্দুর ও আর-শোলায় উহা নষ্ট করে এবং বিক্রী করিয়া ফেলে।

অনেক ধুলেও সেই সকল চাল ডালের দুর্গন্ধ যায় না। ইন্দুরের অত্যাচার বেশী হইলে অনেকে কল পাতিয়া থাকেন, এই ভাবে ইন্দুর মারিতে স্বভাবতঃই কষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সংসারে আমাদের অনেক জীব-জন্তুকেই কষ্ট দিতে হয়। উহা আমাদের অদৃষ্টের ফল, তাহাদেরও অদৃষ্টের ফল, আমাদের না করিয়া উপায় নাই। আরশোলা, ইন্দুর ও মশা লইয়া, কেহই ঘর করিতে পারেন না। তবে যদি কল না পাতিয়া বিড়াল পোষা যায়, তবে কতকটা ভাল; কারণ বিড়ালের উপর ইন্দুরগুলির বিনাশের ভয় বিধাতা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু কলের মত তাহারা সমস্ত ইন্দুর মারিবার সক্ষম করিয়া থাকে না; ছই একটা ইন্দুর মারা পড়িলেই ইন্দুর-পাড়া বেশ একটা ভয়ের সঞ্চার হয়। বিড়ালের আবির্ভাবে ইন্দুরগুলি ঘর ছাড়িয়া যায়। আমরা মারিতে চাই না, তাড়াইয়া দিতে চাই।

যে সকল স্থান কতকটা আঁধার, সেই আঁধার আরশোলারা পরিবার লইয়া বাস করিয়া থাকে। তাহারা যদিও দেখিতে বৃহদাকার, তথাপি বোণীরা বেরূপ অগ্নিমা, লঘিমা প্রভৃতি শক্তির দ্বারা দেহ কখনও বা সজ্জিত, কখনও বা প্রসারিত করিতে পারেন, ইহারাও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র ফাঁক পাইলে নিজের দেহ আশ্চর্য-রূপ সজ্জিত করিয়া তাহার মধ্যে ঢোকে এবং

আরশোলা

আবার শেষে বেশ বড় হইয়া বাহির হয়। ইহাদিগকে তাড়ান বড় শক্ত। এই তাড়ান গেল, আবার ক্ষুদ্র পয়েই কোথা হইতে

আসিরা ইহারা আসর জমাইয়া বসে। ইহাদের বড় বড় গোপ ও গম্ভীর মুক্তি দেখিরা ইহাদিগের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাবও সময় সময় আসা স্বাভাবিক। বাহা হউক, ভাঁড়ার-ঘরে কোনরূপেই ইহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত নহে। অনেক দিন যে সকল জারগার খাঁট পড়ে না এবং যে সকল গৃহকোণ অনেক সময় গৃহিণীর দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে—সেই সকল স্থানে ইহারা বাস করার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লয়। অগ্নির উত্তাপ ইহারা সহ করিতে পারে না, সুতরাং অল্প উপায়ে দূর করিতে না পারিলে,—সেই জ্বলন্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না করিয়া আর কি করা বাইতে পারে? যদি সেই আগুনে ইহারা সম্প্রাচীর মত পাখা হারায়, বা মহাবীর হনুমানের মত ইহাদের মুখ দগ্ধ হইয়া যায়, তবে গৃহিণী কি করিবেন! বতটা দয়ার সঙ্গে ইহাদিগকে ঘর ছাড়াইতে পারা যায়, ততটা দয়া দেখান দরকার। যদি দয়ার না হয়, তবে বিদ্রোহতা না করিলে উপায় কি? ইহারা ঘর না ছাড়িলে আমরা বুদ্ধদেবের মত জীবের প্রতি দয়া দেখাইবার অল্প ঘর ছাড়িতে পারিব না। আরশোলার বাসস্থানে যদি প্রচুর আলোক প্রবেশের পথ করিবার সুবিধা হয়, তবে উহারা আপনিই পলাইবে—তাহা হইলে উহাদের উপর নির্দয় হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

ভাঁড়ারের জিনিসপত্র যথাসম্ভব রোজই একবার রৌদ্রের সাম্নে আনা উচিত। অনেক ঘরে দেখা যায়, ঠাণ্ডা লাগিয়া চা'ল-ডাল খারাপ হইয়া গিয়াছে।

তাহাতে খুব ক্ষতি হয়; এবং সেই ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জিনিস রোজই আনা
অল্প যদি সেই সকল খাদ্যের রান্নার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহাতে পীড়া জন্মে।

অনেক গৃহস্থ একমাসের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী ঘরে আনিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কারণ, সেগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায়
মাসিক বন্দোবস্তের
দোষ গুণ
অনেক জিনিস নষ্ট হইয়া থাকে। যেখানে এক

পোয়া তৈলেই বেশ কাজ চলিতে পারে, সেইখানে
আধমণ তৈলের তাঁড় হাতের কাছে পাইয়া, যিনি তৈল লইয়া যাইবেন, তিনি

দেড় গোয়া লইয়া যান, এবং স্বচ্ছন্দ-মনে কতক নষ্ট করিয়া কতক ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়ই দেখা যায়, গায়ে তৈল মাখার জন্ত যে তৈলের বাটী দেওয়া হয়, তাহাতে কতকটা পড়িয়া থাকে, এবং তাহা নষ্ট হইয়া যায়,—সে বাটী যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিল, কাকে ঠোকুরাইয়া বাটীটা উন্টাইয়া ফেলিয়া কা কা শব্দে চীৎকার করিয়া চলিয়া গেল। সুবন্দোবস্ত থাকিলে ঘেরূপ এক মাসের জিনিস-পত্র একত্র কিনিলে দ্বাদশ সত্তা ও কাজের সুবিধা হয়, ব্যবহার অভাব হইলে, জিনিস-পত্রের কৈবল্যই লোকসান হয়, এবং এক মাসের যোগ্য সমস্ত জিনিস তিন সপ্তাহে বা তাহা হইতেও অল্প সময়ে খরচ হইয়া যায়। চিনি ও মিশ্রি সে অবস্থায় দ্বিগুণ লাগে। যেহেতু, শিশুরা আরশোলার মত দরজার ফাঁক পাইলেই ভাঁড়ারে প্রবেশ করে ও উক্ত দুই সামগ্রীর ভাঁড় আক্রমণ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় গৃহিণীকে সর্বদা সতর্কতার সহিত ভাঁড়ারের জিনিসপত্র মাণিয়া দিতে হইবে। চাকরদের যদি ইহা করিতে হয়, তথাপি তিনি উপস্থিত থাকিয়া, কি জিনিস কি পরিমাণে গেল, তাহা স্বয়ং দেখিবেন। ভাঁড়ার-ঘরটা বাড়ীর দুর্গের মত থাকিবে, যখন তখন যে সে সেই দুর্গ আক্রমণ না করে, তাহা দেখা উচিত। সাধারণতঃ দিনে দুইবার উহা খুলিলেই ভাল হয়। যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, যখনই দরকার হইবে, অমনি মাঠাকুরগের নিকট চাবী লইয়া ভাঁড়ার খুলিতে পারিব, তবে যে সকল দ্রব্যের আয়ু একমাস নির্দ্ধারণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহা ১৫ দিনে নিঃশেষ হইয়া যাইবে; ভাঁড়গুলি শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকিবে। এরূপ বাড়ীতে শীত্র অর্থাভাবে হাহাকার শব্দ উঠাও আশ্চর্য্য নহে। কারণ, লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর নৈবেদ্যের দিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়; তাহার পূজা সপ্তাহে একেবারে শেষ হয় না; তিনি নিত্য পূজা চান, ঘরের প্রতিদিনের হিসাব দেখিতে চান; তাহা না হইলে তিনি সে ঘরে তিষ্ঠিবেন না, কারণ, তিনি চঞ্চলা।

রাধুনীরা তৈল ও চা'ল-ডাল সর্বদা চুরি করিয়া থাকে। তৈলের দিকেই তাহাদের বেশী লক্ষ্য। এই তৈল লইয়া গেল, তৈল ফুরাইয়াছে বলিয়া আবার

আলিয়া বায়না ধরিয়া কতকটা লইয়া গেল, অথচ তৈলের অভাবে বাহা তাকা

তৈল চুরি

হইবে, তাহা পোড়াইয়া পাতে পরিবেশন করিয়া দিয়া
গেল। ইহাদের অনেকের গুপ্ত চুঙ্গী আছে, একটু

ফাঁক পাইলেই তাহা ভুঁটি করিয়া লইয়া যায়। স্মৃতরাং হাজার অবস্থা ভাল
হইলেও গৃহিণী রান্নাঘরের চার্জ রাধুনীকে বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে
পারেন না। অনেক রাধুনী, কয়লা অনেকটা জলিয়া গেলে শেষে উপস্থিত
হইয়া উনানের ধারে শ্মীর আসনে চাপিয়া বসেন।* যে কয়লা তাঁহার বিলম্বে

কয়লার দরদ
বেতন কাটা . .

হরত হইয়া যায়। পরের ক্ষতি যে ক্ষতি, ইহা বুঝা-
ইতে কতকটা নির্মমতা অবলম্বন না করিলে সংসারে
অনেকে তাহা বোঝেন না;—ইহার উপায় কি?

ভাঁড়ার-ঘরে মাপ করিবার ওজনগুলি থাকা চাই, এবং গৃহিণীর দ্রব্যাদির ওজন-
সম্বন্ধে একটা বিগত জ্ঞান থাকিলে ভাল। ভাঁড়ারের জিনিসপত্র একেবারে

ওজন

নিঃশেষ করিয়া ফেলা কখনই উচিত নহে। কতক-
গুলি দ্রব্য সময়ে অসময়ে দরকার হয়। যথা—মিষি,

বাণী, চিনি ইত্যাদি; এগুলি হঠাৎ রাত-দুপুরে দরকার হইতে পারে, একজ্ঞ
ভাঁড়ারে ইহার একটা স্থায়িক সঞ্চয় থাকা দরকার, অর্থাৎ এগুলি ফুরাইবার
পূর্বেই আবার কিছু কিনিয়া আনা উচিত।* হয়ত

সঞ্চয়

বেশী রাখে কোন অতিথি অভ্যাগত আসিলেন,

তাঁহাদের খাওয়ার আয়োজন করিতে হইবে; একজ্ঞ রোগীর জ্ঞ যেরূপ বাণী,
মিষি ও কাগজি লেবু গৃহস্থের সর্বদা রাখা উচিত, তেমনিই কিছু আলু, বি ও
ময়দা সর্বদা ভাঁড়ারে প্রস্তুত থাকিলে, অসময়ে আত্মীয়স্বজন আসিলে অপ্রস্তুত
হইয়া পড়িতে হয় না। যেখানে গৃহিণীগণ ভাল, সে সকল বাড়িতে এই সঞ্চয়
জিনিস-পত্র সর্বদাই পাওয়া যায়। কিছু আমসব ও চাটুনি প্রভৃতিও ভাঁড়ারে
সর্বদা সঞ্চিত রাখা উচিত। যেখানে গৃহস্থালীর অভাব, সেই সকল ঘরে সর্বদা

ঐ জিনিসগুলি আনিয়াও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারা যায় না। যে পর্য্যন্ত নিঃশেষ না হয়, শিশুরা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। গৃহিণীর শাসন করার শক্তির অভাবে অথবা মনোবোগের ঐক্যে বাহা অসময়ের অল্প তুলিয়া রাখা উচিত, তাহা এইভাবে খরচ হইয়া যায়, প্রয়োজনের সময় পাওয়া যায় না। পানের ভাল মসলাও একসেট পোষাকীভাবে তুলিয়া রাখা উচিত। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে সেগুলি দরকার হয়, যিনি আসিয়া আধ ঘণ্টা থাকিবেন, তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য বাজারে লোক পাঠাইবার অবকাশ থাকে না। সুতরাং গৃহস্থের নানারূপ প্রয়োজনের জন্য কিছু কিছু জিনিস ছেলেদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তুলিয়া রাখা বিধেয়। কখনও কখনও কোন আত্মীয় বালক-বালিকা ঘরে আসিলে তাহাদিগকে মিষ্ট দিয়া আদর করিতে হয়। যে গৃহে এতদ্ভিন্ন বাজারে ছুটিতে হয়, তদপেক্ষা যে গৃহে এই সকল দ্রব্য কিছু কিছু সঞ্চিত থাকে, তাহা ভাল। দরিদ্র গৃহস্থও কিছু নাড়ু, বড়ি বা মিশ্রি, কিস্মিস ও বাদাম রাখিতে পারেন। যে সকল গৃহের বন্দোবস্ত ভাল নাই, সে সকল গৃহের শিশুরা ঐরূপ জিনিসের সন্ধান পাওয়া মাত্র তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলে।

অনেক বাড়ীতে কয়টা বাটি, ঘটী ও কয়খানা খালা, রেকাব নিত্য ব্যবহারের জন্য বাহিরে আছে, তাহার ঠিক খবর কেহ রাখেন না; হয় ত এক সপ্তাহ পরে

খোঁজ পড়িল, খোঁকার ছুখ খাবার বড়-বাটীটা
ঘটী-বাটির খোঁজ রাখা

কোথায়? চাকরেরা সেগুলি চুরি করার বেশ সুবিধা পায়। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, একটা বাটিতে কি রেকাবে কাহাকেও কিছু জল-খাবার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সেই ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য লইয়া একমাস বাবৎ তক্তাপোষের নীচে কি চৌকির উপর কি বখাতখা পড়িয়া আছে, তাহাদের কোন খোঁজই নাই! কি আছে কি নাই, কি হারাইয়াছে, তাহাদের সন্ধান কে রাখে? গৃহিণী শিশুদিগের লইয়া অথবা রান্নার কার্যে এরূপ ব্যস্ত যে, তাঁহাকে সে কথা লইয়া কিছু বলিলে তিনি বিরক্ত হন। এই সকল গৃহে যদিও বা সস্ত্রী আসিয়া থাকেন, তবে প্রায়ই যে তিনি বিরক্তিসহকারে অকৃত্রিম করিয়া

স্থানত্যাগের সক্ষম করেন, তাহা বাঁহাদিগের দেবতাদিগের গতিবিধি দেখিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা ই মাত্র বুঝিতে পারেন।

যে সকল খালা ষটি বাটী বাহিরে আছে, তাহাদের একটা ঠিক হিসাব রাখা দরকার এবং রাত্রে আহাৰান্তে সেগুলি গণিয়া ঠিক আছে কি না দেখিতে হইবে। যদি কোন আগন্তুক ব্যক্তির খাবারের অন্ন বা অন্ন কোন প্রয়োজনে ষটি-বাটী বাহির করিতে হয়, তবে প্রয়োজন শেষ হইলে সেই জিনিস যেন যথাস্থানে আবার রাখা হয়। ভৃত্য হয় ত গায়ে মাখাইবার তৈল দিয়া গেল। তৈল মাখা হইলে সেই তৈলের বাটিটি আবার সে যথাস্থানে আনিয়া রাখিবে—তাহাকেই এজ্ঞ দায়ী করা হইবে এবং এই দায়িত্ব যেন সে বুঝিয়া রাখে। যদি সে ইহার মধ্যে কার্য্যান্তরে যায়, তবে সে অপর কাহার উপর যেন সেই ভার দিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, সেই কাজ হইয়াছে কি না। ছোট বালক-বালিকারা যদি ঐরূপ কোন বাটী বা ষটি প্রয়োজনানুসারে অন্ত্র লইয়া যায়, তবে সেই কাজ হইয়া গেলে জিনিস আবার যথাস্থানে আনিয়া রাখিবে। এই সকল শিক্ষা ছোট কাল হইতে হইলে ভাল। মোট কথা সংসারটিকে তাজিলোর হাত হইতে সৰ্ব্ব-বিষয়ে রক্ষা করিতে হইবে।

বাড়ীর কাপড় প্রভৃতির সবক্ষেণে সেইরূপ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, পূৰ্ব্বদিন স্নানান্তে কেহ কাপড় ছাড়িয়া গিয়াছেন,

আজও তাহা কলতলার পড়িয়া আছে। কোন

বস্ত্রাদি

শিশুর শিকের জামা বায়ুবেগে উড়িয়া উঠানে একটা

ড্রেইন কি অপরিষ্কার জায়গার পড়িয়া পর্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র সহ করিতেছে, তাহার ফলে স্ত্রীপুত্রের হাড় পচিয়া জামাটা অকালে ধ্বংস পাইতেছে, কিংবা তাহার শেষ দশাপ্রাপ্তির পূৰ্বেই হয়ত কোন পরিচরিকা তাহা সামান্য নেকড়ায় পরিণত করিয়া কর্দম-জলে অভিসিক্তপূৰ্ব্বক তাহার দ্বারা বস্ত্র মুছিতেছে। কাপড়-গুলির প্রতিও একটা দৃষ্টি রাখার দরকার। কোন কাপড়গুলি শুকাইতে হইবে, কোনগুলি তুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহা যেন ঠিক থাকে। অনেক গৃহস্থের

বাড়ীতে দেখা যায় যে, কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহারা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, তবু তোলা হইল না ; হঠাৎ বৃষ্টি হইয়া গেল, সেগুলি পুনরায় ভিজিল ; কিংবা একবার শুকাইবার পরে শীতরাত্রের হিমে ভিজিয়া তাহারা ম্যালেরিয়া অরাক্রান্ত রোগীর জ্বর একবার শরীরে জ্বালা ও পরক্কে শীত বোধ করিতে লাগিল।

ধোপা-বাড়ীর কাপড় আসিল, হয় ত সেগুলি স্তূপাকৃতি হইয়া একস্থানে পড়িয়া রহিল। ছেলেরা কর্দমাক্ত হাতে সেগুলি ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহাদের কোন কোনটির উপর আঙ্গুলের ছাপ বসাইয়া দিল ; কোনখানা বা তক্তাপোষের নীচে খানিকটা জলের উপর পড়িয়া আর্দ্র হইয়া রহিল। ধোপা-বাড়ীর কাপড় আসিলে তখনই যার যার কাপড় ভাগ করিয়া তুলিয়া রাখা উচিত। শিশুদের যদি প্রত্যেকের একটি ছোট তোরঙ্গ থাকে, এবং তাহারা যদি নিজ কাপড় বহুপূর্বক শুকাইয়া রাখার সংশিকা পায়, তবে ভাল। এ সকল ব্যাপার যে খুব শ্রম-সাধ্য, তাহা নহে। প্রথম হইতে শিশুরা যদি নিজ নিজ পুস্তক শুকাইয়া রাখিতে শিখে, নিজেদের কাপড় তুলিয়া রাখিতে পারে,—এমন কি স্নানান্তে নিজের কাপড়খানি শুকাইতে দেয়,—তবে তাহাতে কোন অপমান বা হীনতা নাই। এইরূপে শিশুকাল হইতে চরিত্রের একটা স্বাবলম্বন ও গৃহস্থালীর যোগ্যতা তাহারা লাভ করিতে পারে।

মোট কথা, সংসারকে তাচ্ছিল্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু দরকার, গৃহিণী সর্বদা তাহা চিন্তা করিবেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি গৃহের দাসী নহেন,—গৃহের কর্তা ; তিনি শুধু খাটিতে আসেন নাই, তিনি খাটাইবেন ও শিক্ষা দিবেন। গৃহের সমগ্র চিন্তাটি তাঁহার মাথায় খেলিবে, তবেই সেই গৃহের মঙ্গল।

শীতাস্ত্রে লেপ তোষক উঠাইয়া রাখিবার ভাল ব্যবস্থা করা উচিত। পাকা-ঘরে বিমের উপর ছক্ লাগাইয়া অনেকেই তাহা টাঙ্গাইয়া রাখেন, এ ব্যবস্থা ভাল। ইহুরের হাত হইতে সেগুলি রক্ষা পায়। কিন্তু অধিক ঘরে ও কার্পণ্যে অনেক সময় গরম জিনিস নষ্ট হয়। অনেক শাল, বনাত, সার্জের চাদর ও

বিলাতী কবল বন্ধ করিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখেন এবং খুব বিশেষ দরকার হইলে তাহা বাহির করেন, ফলে সেগুলি অনেক সময় পোকায় কাটে।

এই সকল জিনিস সাবধানতার সহিত সৰ্কদা ব্যবহার করিলে ভাল থাকে। বিলাতী কবল প্রভৃতি অনেক সময় বিছানায় পাতিয়া রাখিলে বেশ থাকে। পোষাকী করিয়া রাখিলে তাহারা সহজে কীটের মুখে পড়ে। শীতের কাপড় বাহা বাক্সে সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হয়, তাহা মাসে মাসে খুলিয়া রৌদ্রে দেওয়া দরকার এবং পোকা নিবারণের জন্য সেগুলির মধ্যে স্ত্রাপখালিন দিয়া রাখা উচিত।

পিতল-কাঁসার জিনিষ বাহা সৰ্কদা ব্যবহারে না লাগিলে, তাহাও মাসে অন্ততঃ একবার বাহির করিয়া মাজিয়া রাখা দরকার; নতুবা তাহাদের মধ্যে একরূপ সব ময়লা কালো কালো দাগ পড়িলে যে, তাহা ভীমের মত বলবান্ ভূতেরাও জোরের সহিত ঘষিয়া উঠাইতে পারে না। পূজার বাসন-পত্র, ডেগ ও খালাগুলি লইয়া শারদীয় উৎসবের সময় চাকরেরা একরূপ মলমুদ্ধ করিয়া থাকে, অথচ এত চেষ্টা সবেও সেগুলি খুব ভালরূপ পরিষ্কার হয় না। মাসে একবার মাজা পড়িলে সেগুলিতে ময়লা পড়িতে পারে না, এবং প্রয়োজনের সময় সামান্য চেষ্টাতেই তাহা ঝকঝকে হয়।

অনেক বাড়ীতে গ্লাস ও ঘটি-বাটী চাকরেরা একরূপ খারাপ-ভাবে মাজিয়া থাকে যে, তাহাতে জল কি খাদ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুতি হয় না। আবার একরূপ বাড়ীর অভাব নাই, যেখানে কাঁসার বাটি-গ্লাস রূপার মত ঝকঝক করিতেছে; যেখানে দাস-দাসী বিজ্রী করিয়া ঐ সকল জিনিস মাজে, সেখানে গৃহিণী নিজেই একটি বাটি-গ্লাস মাজিয়া দেখাইবেন, সেগুলি কি ভাবে মাজিতে হইবে।

বাড়ীর উঠানটি বাহাতে পরিষ্কার থাকে, সৰ্কদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক বাড়ীতে ড্রেনের মুখে ভাত-ডাল জনিয়া যায় এবং উহা বন্ধ করিয়া ফেলে।

ড্রেন

চাকরানী যে জায়গায় বাসন-পত্র মাজে, উদ্ভূত ভাত-

ডাল ও তরকারী সেইখানেই ফেলে, আলস্তবশতঃ বাহিরে লইয়া যায় না; তাহার ফলে ড্রেনের মুখ বন্ধ হইয়া জল দাঁড়াইয়া যায়

এবং গৃহে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি করে। উঠানে কোনরূপ আবর্জনা জমিতে দেওয়া হইবে না। যদি চাকরগণ বলে যে, অল্প সময়ে ফেলিয়া দিবে, তাহা বিশ্বাস না করিয়া তখনই উহা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, ঐরূপ আবর্জনা জমাইবার অভ্যাস হইয়া গেলে, শেষে গৃহটি আবর্জনা হইতে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রান্নাঘর বাহাতে খুব পরিষ্কার থাকে, তাহা গৃহিণী দেখিবেন। পূর্ব-বন্ধের মেরেরা রান্নাকাঠো খুব নিপুণ, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিষ্কার থাকার অভ্যাস নাই। পীড়ার উপর বলিলেই হয়, তথাপি রান্নাঘর তাঁহারা কুণ্ডে বসিবেন; অনেকে আবার জীলোকের পীড়ার উপর বসটা অহুচিত মনে করিয়া সেই কুসংস্কারের অল্প বস্ত্রাদি শীত হই মরলা করিয়া ফেলেন। অনেক জীলোক হলুদ বা সরিষা বাটিয়া ও তৈল ঘাটিয়া হাত আঁচলে মোছেন। ইহার ফলে পরিষ্কার বস্ত্র নানারূপ খাদ্য-জ্বরের কিছু কিছু নমুনা বুক পাতিয়া লইয়া চিত্র-বিচিত্র হইয়া পড়ে। বাহারী এক্রূপ করেন, তাঁহাদের ছেলের পরিচ্ছন্নতার ভার কিছুতেই জমিতে পারে না। মাসে মাটি আছে, কিংবা তর মধ্যে জলে পোকা ভাসিতেছে, এগুলিও কেহ কেহ লক্ষ্য করেন না। রাঁধেন বাড়েন, অথচ গারে কালীর একটু মাগ নাই, পরিষ্কার বস্ত্র ধুধু করিতেছে, এক্রূপ ঘেরেও অনেক আছেন; কলিকাতা-অঞ্চলে তাঁহাদের সংখ্যা বেশী। রাঁধিবার সময় সেমিজ না পরা নিরাপদ; অনেকে আমার এ কথা স্বীকার নাও করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে দুই একটি জীলোক রান্না করার সময় সাড়ীতে আপ্তন লাগিয়া অন্নবরসে মারা পড়িয়াছেন; সেমিজ পরা না থাকিলে হয় ত তাঁহারা রক্ষা পাইতেন, এই ধারণা আমাদের হইরাছে।

রান্নায় তাড়াতাড়ি করিলে অনেক সময় রান্না মাটি হয়। আগেকার দিনে জীলোকেরা রাঁধিয়া শিশুদিগের কাছাকাছি দিয়া তাহা চাখাইয়া লইতেন। এখন সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। বাহা খাইতে দিতে হইবে, তাহা কিরূপ হইল,

এটা আগে পরখ করা মন্দ নয়। হয় ত কোন তরকারীতে ছুন বেশী পড়িয়াছে, বা কোনটাতে তরপণীত হইয়াছে; ঝাল বেশী হওয়ার কোন সামগ্রী অথবা বাহ্যের হানিকর হইয়াছে,—ইহা খাইতে বসিয়া আবিষ্কার করা হইলে গৃহিণী অনেক সময় অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। একজ্ঞ চাখিয়া দেখার রীতিটা বেশ ছিল। মুহু জ্বালে ধীরে ধীরে ভাত রাঁধা ভাল হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনাদি কড়া জ্বালে জ্বাছ হয়। (১) তরকারী বেশী সিদ্ধ হইলে খাইতে ভাল হয়। বাহার্য কলিকাতার উড়িয়া-বামুনের হাতের রান্না খাইয়াছেন, তাঁহার্য 'ভোজন-দুর্গতির নানারূপ বহু-দশিতা লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। উড়ে-উড়ে-বামুনের লবণ-প্রিয়তা বামুনেরা ছুনটা সর্বদাই বেশী দিয়া থাকে। বোধ হয় উড়িয়াদেশটা লবণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত থাকার দরুণ ছুনের সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা বেশী হইয়াছে। আমাদের বাড়ীতে এক উড়ে-বামুন একরূপ লবণ-বিভীষিকা দেখাইয়াছিল যে, এখনও তাহা স্মরণ করিলে তরকারী খাইতে ভয় হয়। ছুন মাখাইবার সময় মেয়েরা উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু বাই তাঁহার্য একটু অজ্ঞ গিয়াছেন, অমনই সে আর কিছু লবণ মাখাইয়া বসিয়া আছে। কতরূপ ভৎসনা, লাঞ্ছনা এবং করিমানা সহিয়াও সে লবণস্বন্ধে কার্পণ্য করিতে স্বীকার পায় নাই। এইজন্ত শেষে আইন করা হইল যে, রান্নাঘরে একটুও লবণ থাকিবে না—ব্যঞ্জনাদিতে আমরা খাইবার সময় লবণ মাখাইয়া খাইব। মেক্সিকোর সন্নিহিত কোন রাজ্যের লোকেরা বুদ্ধবিগ্রহের দরুণ অসুবিধা হওয়াতে ৬০ বৎসর লবণ খান নাই, প্রেক্ষটের ইতিহাসে পড়া গিয়াছে। আমরা এতদূর সহিষ্ণু হইতে পারি নাই। চাকর-বাকরেরা লবণশূন্য তরকারী খাইয়া একরূপ বিদ্রোহী হইল যে, পাছে তাহার্য নিমকহারাম হইয়া পড়ে, আমাদের আশঙ্কা হইল। সে বামুন অনেক অত্যাচার সহিয়াছিল, আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না। এই রোগটি কম বেশী উড়ে-বামুনমাত্রেই আছে।

(১) "বত জ্বালে ভাত নষ্ট।

তত বাসে ব্যঞ্জন নষ্ট।

অনেক সময় অন্ন ক্রটির জন্য প্রচুর আয়োজন-পত্র মাটি হইয়া যায়। গ্রীষ্ম-কাল, হয় ত মাংসাদি রান্না হইয়াছে একটুকু টক হয় নাই,—সুতরাং ভাল খাইয়াও লোকেরা তৃপ্তি পাইলেন না। গৃহিণী যে রান্নার বিষেচনা

কালে যা দরকার—তাহা বুঝিয়া রান্না চড়াইবেন। বেশী বৃষ্টি হইতেছে, খিচুড়ী ও ভাজা দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়; বড় ধরা তখন দই ও টকের ব্যবস্থা চাই; সকল বিষয়ে না বলিয়া দিলেও গৃহিণী বাড়ীর লোকের মেজাজ ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া উপযুক্ত আয়োজন করিবেন। পরিবেশনকালে হাতা ও চাম্চা ব্যবহার করিবেন। চা'ল-ডাল খুব ভাল খুইয়া তবে উনানের উপর বসাইবেন। অনেক সময় খুব ভাল চা'ল ধোয়ার দোষে মলিন দেখায়, একটু যত্ন করিয়া খুইলে তাহা ধবধবে যুঁইফুলের মত হয়। সামান্য যত্নের অভাবে ভাত মাটি হয়।

পরিবেশনকালে কে কতটা খাইতে পারেন, তাহা বুঝিয়া অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ রন্ধ্নে-বাগুন এ বিষয়ে নিতান্ত অসাবধান। মনিবের জিনিষ নষ্ট হইলে তাহার কি ? বারে বারে ভাত-ডাল দেওয়ার কষ্ট যদি

স্বীকার না করিলে চলে, তবে কেন সে তাহা করিতে যাইবে? স্ত্রীপাকৃতি একরাশ ভাত হয়ত একটা

বালকের পাতে ফেলিয়া গেল। বালক তাহার সিকি পরিমাণ খাইয়া, আর এক সিকি পরিমাণ ভুঞে ছিটাইয়া ফেলিয়া, বাকী অর্ধেক ভাত পাতে ফেলিয়া গেল। ঐ অবিলম্বে আসিয়া সে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরিত্যক্ত অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি নর্দমায়া ফেলিয়া দিল। যদি দৈবাৎ কোন বাড়ীর লোক জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, এই একটা ছেলেকে এতগুলি ভাত একেবারে দিয়া সেগুলি নষ্ট করিলে কেন ? ঠাকুর হয়ত উত্তরে বলিল, 'অন্ন ভাত দিলে খোকাবাবু রাগ করিয়া খাইতে বসেন না।' বলা বাহুল্য, এই সকল গুজুহাৎ এবং এইভাবে জিনিষ নষ্ট করা লক্ষীঠাকুরাণীকে গলাধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দিতে বাওয়া যায়। গৃহস্থের পক্ষে এইভাবে জিনিষ নষ্ট হওয়ার মত সর্ব্বশেষে ব্যাপার আর নাই। গৃহিণী

ঠিক ওজনমত সকলের পাতে জিনিস পড়িতেছে কি না,—বারে বারে দেওয়ার পরিশ্রম এড়াইবার জন্য একেবারে অতিরিক্ত জিনিসের পরিবেশন হইতেছে কি না,—সে দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। দ্রব্যাসামগ্রী নষ্ট না হয়,—ইহাই গৃহিণী-পণ্যের প্রথম ও প্রধান সূত্র।

গৃহস্থের গৃহে দরিরের জন্য একটা দরজা খোলা রাখা উচিত; অতিরিক্ত স্নান-শাস্ত্রের চর্চা করিয়া সে দরজাটা একেবারে বন্ধ করা উচিত নহে। একটা লোক হরিনাম গাইয়া গেল,—“তোরা বাড়ী কোথায়—শরীর বেশ পুষ্ট, বাপু, খাটিয়া খাও না কেন?” ইত্যাদি প্রশ্ন দ্বারা তাহাকে বাতিবাস্ত করিয়া তাড়াইয়া

দেওয়া উচিত নহে। এ দেশের লোকেরা হরিনাম-
 ভিখারী কীর্তনটা অনর্থক কুড়ে লোকেব কাজ মনে করেন

না। প্রাতে উঠিয়া ভিখারী রাগে আশ্রয় দিবে বৈষ্ণবেরা সে টহল দিয়া যাইত, তাহাতে পূর্ব ভাঙ্গিয়া পরেই লোকের মনে কি সবস মধ্য-ভাবের উদয় হইত! রাহারা বন্দী রাখিয়া যে আনন্দ পাইতেন, মনো ব্যক্তিরা প্রাতঃকালে ও প্রদোষে নহবতের ব্যবস্থা করিয়া যে আনন্দলাভ করেন, সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিরাও এক মুঠো চাল দিয়া বৈষ্ণব ভিখারীর গানে তদপেক্ষা উদ্দেশ্যের সূত্র ও শিক্ষা পাইতে পারেন। সংসারে ত লোকেরা দিনরাত্র কাটাইবার মত ঘুরিতেছে,—সারাদিন যন্ত্রের মত খাটাই আমাদের কর্তব্য, কিন্তু শুধু এই কি আমাদের কর্তব্য? আর কি কিছুই নাই? আমরা যাহা ভুলিয়া গিয়াছি, যিনি প্রাণের প্রাণ ও রাজার রাজা—যাহাকে ভুলিয়া দিন-রাত কষ্ট পাইতেছি, তাঁহার কথা প্রভাতে বা দিনান্তে যদি কেহ স্মরণ করাইয়া দেয়, তবে কি সে আমাদের উপকারী নয়? এই বৈষ্ণবের দল সমস্ত সমাজে একটা সরস ভক্তির ভাব জাগাইয়া রাখে, ইহারা কি দরকারী নহে? সমাজ এককালে এই কীর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। যাহাকে যে ভালবাসে, তাহার সম্বন্ধে সে কথা কহিতে ও কথা শুনিতে ভালবাসে। পূর্বে সমাজ ভগবানকে ভালবাদিতেন, স্ততঃ এই সকল ভিখারী শিক্ষা করিয়া লোককে তাহারই নাম ও গুণগান

গুনাইয়া বাইত । ইহাদিগকে এক-মুঠো ভিক্ষা দিতে বাইয়া ইহাদের শারীরিক বল পরীক্ষা ও কর্তব্য-সম্বন্ধে বড় বড় উপদেশ দেওয়া পণ্ড-শ্রম মাত্র ।

শারদীয় উৎসবে ভিখারীর দল আগমনী গান করিয়া থাকে—তাহা এত করুণরসপূর্ণ ও তাহা পারিবারিক স্নেহ ও ত্যাগজনিত দুঃখ ও আনন্দ এমন সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেয় এবং ধর্ম-ভাবগুলি এমন উজ্জ্বল করে যে, আমরা শৈশবে আত্মহারা হইয়া উঠা শুনিয়াছি এবং শুনিতে শুনিতে কত কাঁদিয়াছি । যাহা বাড়ীর খুব নিকটে পাওয়া যায়—তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, এবং তাহা বুঝিতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিতে হয় না বলিয়া সেগুলি ছোট বা অনাদরের জিনিস নহে । দৈব সহায় থাকিলে যদিও বনিক পৃথিবী-ব্যাপক কারবারে লাভ পাইল না, সে হয়ত গৃহের কোণে কাচ-খণ্ডের মত যাহা পড়িয়াছিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, সে একখানি হীরক । আমাদের এই ভাবে অনেক হীরক আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা আছে ।

অন্ধ-আতুরের প্রতি দয়া রাখা গৃহস্থের কর্তব্য । বাহার ভগবানের বিধি পালন করে নাই বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছে,—তাহাদিগের প্রতি আমাদের বিরূপ হওয়া উচিত নহে । কারণ, আমরাও ত পলে পলে সেই বিধি অমান্ত করিয়া আসিতেছি । কোন্ মুহূর্তে তাঁহার প্রহার আমাদের জর্জরিত করিবে, কে

অন্ধ-আতুরের
প্রতি দয়া

জানে? সুতরাং দুঃখী ব্যক্তিরা আমাদের সমবেদনার পাত্র । তাহাদের অনেক মোষ আছে,—কিন্তু যখন তাহারা দুঃখে পড়িয়াছে, তখন এমন একটা জারগার আসিয়াছে, বাহাতে তাহাদের পূর্ব অপরাধের আলোচনা অনাবশ্যক । আমাদের হৃদয়ে ভগবান্ দয়া বলিয়া যে সামগ্রী দিয়াছেন, তাহা লোকের চক্ষের জল দেখিলে আপনি আগিয়া উঠে, তাহা বিচার করিতে চায় না । ভগবানের অসীম দয়া হইতে কি কেহ বঞ্চিত ? ছোট বড় বলিয়া কি তিনি তাহা দিতে বিচার করেন ? তাঁহার স্বর্গ্যালোক, তাঁহার চন্দ্রকিরণ, তাঁহার সুশীতল জল, তাঁহার মুক্ত বায়ু,—দীন-দয়িত্ত ও রাজা-মহারাজা, পাপী ও ধার্মিক এক ভাবেই পাইতেছে । একটা

কীটের সম্মুখেও তিনি বিশাল সৌর-জগতের সমস্ত আলো ধরিয়া রাখিয়াছেন, সমস্ত আকাশের মুক্ত বায়ুর মধ্যে তাহার জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বাহ্যকে কষ্ট দিতেছেন, তাহাকে আমরা সাহায্য করি কি না, তিনি চক্ষের এক কোণে তাহার সন্ধান রাখিতেছেন। মাতা শিশুকে প্রহার করেন, কিন্তু আড়-চক্ষে চাহিয়া দেখেন, কোন্ আত্মীয় আসিয়া তাহাকে কোলে করিতেছেন ও আদর করিয়া তাহার ব্যথার স্থলে হাত বুলাইতেছেন। ভগবানও কষ্ট দিয়া আড়-চক্ষে চাহিয়া দেখেন, কে তাঁহা কর্তৃক দণ্ডিত তাঁহার সন্তানকে মাটা বাড়িয়া কোলে লইল ও আদর করিল। কারণ, তাঁহার শান্তি ভালবাসার শান্তি, উহা নির্দমের আঘাত নহে। তাহা না হইলে শিশু যেরূপ মারের হাতে মা'র খাইয়া 'মা' 'মা' বলিয়াই প্রহার-কর্ত্তীকেই জড়াইয়া ধরে, আমরা কি তাঁহার হাতে দুঃখ পাইয়া কাঁদিয়া তাঁহারই শরণ লই না? কাহারও এরূপ অভ্যাস আছে যে, কেহ বিপদে বা দুঃখে পড়িলে তাহা আলোচনা করিয়া বলেন, "উহার ওরূপ না হইলে আর কাহার হইবে? ও লোকটা এই পাপ করিয়াছে।" ব্যথিত ব্যক্তির পূৰ্ব্ব-দোষ আবৃত্তি করিয়া তাহাকে আরও ব্যথা দেওয়া উচিত নহে। দুঃখী ব্যক্তির প্রতি যদি নির্দম হইলাম, তবে দয়া দেখাইব কাহাকে? ছিদ্রাধেবী হওয়া উচিত নহে, কারণ, আমাদেরও যে শত ছিদ্র আছে।

কোন কোন গৃহিণী চাবী কোথায় রাখেন, কাপড়খানি কি আমাটা, বাটটা কি বটিটা কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া একবারে হরহান্ হন। 'এক জন বড় লোকের জীবন-চরিতে পাঠ করিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন—তাঁহার জীবনের অন্ততঃ এক-ষষ্ঠাংশ হারাপ-জিনিস খুঁজিতে গিয়াছে। এমন দিন যায় নাই, যে দিন তিনি চাবীটা কি নোটবুখানি খুঁজিতে ২৩ ঘণ্টা ব্যয় করেন নাই। এইরূপ পণ্ডিত্র ও চিন্তিত্বা অস্বাভাবিক পরিমাণে সকলেই ভোগ করিয়াছেন। শৃঙ্খলার সহিত কাজ না করিলেই এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সাধারণতঃ চাবী খোঁজা ব্যাপারটা লইয়াই অনেকে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেক গৃহিণী

হারাপ জিনিষ
খোঁজা

অকলে চাবী বাঁধিয়া রাখেন, এই রীতি মন্দ নহে। কিন্তু যদি প্রত্যেক জিনিস রাখিবার ঠিক্ ঠিক্ একটা জায়গা থাকে,—যথা এই স্থানে জামা-কাপড় রাখিব, এখানে ঘটা-বাটা রাখিব, এইখানে কাগজপত্র রাখিব, এইখানে চাবী রাখিব, তাহা হইলে আর খোঁজাখুঁজি করিতে হয় না। অনেকের বাস্ত-সিন্দূকের মধ্যেও এরূপ বন্দোবস্তের অভাব যে, একখানি কাপড় কি এক ছোড়া মোজা খুঁজিতে অতল সমুদ্রের মত বড় বাস্ত বা সিন্দূকের সমস্তটুকু আলোড়ন করিতে হয়। কাজ করিবার শৃঙ্খলা থাকিলে অনেক কষ্ট, হুঁশ্চিন্তা ও বৃথা পণ্ড-শ্রমের হাত হইতে বাঁচা যায়।

গৃহিণী আর-ব্যয়ের যে হিসাব রাখিবেন, তাহা মাসের পর মাসে মিলাইয়া ও চিন্তা করিয়া দেখিবেন; হিসাব লিখিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না। কোন্ মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, এবং বাস্তাঃ খরচ উপরি খরচ, চাকরদের বেতন বাবদ খরচ,

ডাক্তারের খরচ, দুধের খরচ, ধোপার খরচ, ট্রামভাড়ার খরচ,
খরচের হিসাব

ছেলেদের স্কুলের মাহিয়ানা, গৃহ-শিক্ষকের বেতন এবং পুস্তক ও খাতা পেঙ্গিন প্রভৃতি কিনিবার খরচ, কাপড় কিনিবার খরচ, এই সকল প্রত্যেক বিষয়ে মাসে মাসে মোট কত খরচ হইয়াছে, অবসর থাকিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটির মোট হিসাব তিনি লিখিয়া রাখিবেন, এবং এই ভাবের মাসিক মোট খরচগুলি সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন—তাহাদের কোন কোনটিতে কিছু অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে কি না, এবং কোন কোন বিষয়ে খরচ কমানি যায় কি না। তাহাদের হুগৃহিণী বলিয়া নাম আছে, তাহাদের খরচপত্র কিক্রপ হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি সন্ধান লইবেন, এবং নিজে গৃহস্থালীর কোন উন্নতি করা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

আমি এক ভদ্রপরিবারের বিষয় জানি, তাহাদের ঘরে অনেকগুলি শিশু-সন্তান। তাহাদের জন্ম সহরে হুখ কিনিতে অনেক টাকা লাগে, তাহা সেই

হুখ বালি

পরিবার বহন করিতে পারেন না; সুতরাং শুধু ভাত-ডাল খাইয়া তাহাদের থাকিতে হইত। গৃহিণী বুদ্ধিমতী, তিনি একসের দুধের বন্দোবস্ত করিলেন। একসের দুধে ১০।১৫টি শোকের কি করিয়া

হইতে পারে ? কিন্তু তিনি সেই হৃথের সঙ্গে প্রচুর বালি মিশাইয়া ও কিছু চিনি দিয়া এক একবাটা ক্ষীর প্রস্তুত করিলেন ও তাহাই এক একটি ছেলেকে খাইতে দিতে আরম্ভ করিলেন । ইহার ফল মন্দ হয় নাই । গৃহস্থ একথাও বলিতেন, কলিকাতার গোয়ালার দুধ ভাল নহে, খানিকটা বালি মিশাইয়া জাল দিলে হৃথের দোষ কাটিয়া যায় । তাঁহার বাড়ীর ছেলেদের বারাম-বারাম আমরা বড় একটা দেখি নাই । তাহারা বেশ ছুট-পুট ।

অনেক মধ্যবিত্ত বাড়ীতে সাধারণ অবস্থার লোকের একটি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হইলে ৫-১০ টাকার মধ্যে খরচ পড়ে । পূর্ববঙ্গের ভদ্র-গৃহস্থেরা ইহার কমে কিছুতেই কুলাইয়া উঠিতে পারেন নিমন্ত্রণে বেশী খরচ নু! কারণ, সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যাহা পান, বাড়ীর সকলেই কম-বেশী তাহার ভাগ পান । কিন্তু কলিকাতাবাসীরা সেই দশ টাকার স্থলে অনেক সময় এক টাকাতেই নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা নির্বাহ করেন । শুধু সেই ভদ্র-লোকটি যাহা খাইবেন,—তাহাই রান্না হয় ; বাড়ীর ছেলেরা হিন্দুদেবতার মত দৃষ্টিভোগ করিয়াই নিরস্ত হন । ইহা ভাস কি মন্দ, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না । যেখানে আর বেশী নহে, অথচ আত্মীয়তা-বান্ধবতা রক্ষা করিতে হয়, সেইখানে এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট । সকল বিষয়ে যে, বাড়ীতে একটা উৎসবের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা নহে । যেখানে অবস্থা ভাল, সেখানে ঐরূপ খরচ কর আনন্দের বিষয় বটে ; গরীব মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘত হইয়া চলা উচিত । বাড়ীর ছেলেদের পক্ষেও ইহাতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই । তাহারা সংসারের অবস্থা বুঝিয়া, বাহ্যতে সংযম শিক্ষা করে,—তাহাই দেখা উচিত ।

দাস-দাসীর প্রতি ব্যবহার

দাস-দাসীরা গৃহস্থালী-রথের চক্র-স্বরূপ, এই চাকা বাহাতে ঠিকমত চলে, গৃহস্থীর তাহা দেখিতে হইবে ।

পূৰ্বকালে অনেক গৃহিণী চাকর-বাকরকে নিজের ছেলেদের মত দেখিতেন,— তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার সৰ্বস্ব তত্ত্ব করিতেন, বাড়ী-ঘরে কে কেমন আছে, তাহার খোঁজ লইতেন ; চাকরদের অনেক আবদার বরদাস্ত করিতেন,—তাহার ফলে কোন চাকর কি চাকরাণী যে বাড়ীতে একবার ঢুকিত, সেই বাড়ীতেই আজীবন থাকিয়া যাইত। এ কাজ আমরা করিব না, এই ভাবের বিতর্ক বা জটলা তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত না। তাহারা যে আগেকার দিনের দাস-দাসী সকলেই সত্যযুগের সোনার মানুষ ছিল, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যেও ভুতের মত একগুঁয়ে,—কুমীরের মত আলসে লোকের অভাব ছিল না। হাজার গালি দিলেও কথা নাই,—তবু ইচ্ছা না হইলে কাজ করিবে না, মধ্যে মধ্যে রাগিয়া উঠিয়া একরূপ চীৎকার আরম্ভ করিত যে, বাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইত,—এই রকম আমরা অনেক দাস-দাসী দেখিয়াছি। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মনিবের বাটীতে তাহারা স্নেহের বন্ধনে বাঁধা ছিল, সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্তত থাকিতে পারিত না। এই স্নেহের জন্ত সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে যখন খাটিত বা কোন কাজে লাগিত, তখন প্রাণপণে খাটিত। মনিবের জিনিসপত্র নষ্ট হইলে তাহাদের বুক লাগিত, ছেলেদিগকে তাহারা অনেক সময় জনক-জননীর স্নেহে লালন-পালন করিত। বাড়ীর ছেলেরাও তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিত না ; নামের সঙ্গে ‘দাদা’ ‘কাকা’ প্রভৃতি আত্মীয়তা-সূচক উপাধি জুড়িয়া দিত। মোট কথা, তখন তাহারা গৃহস্থের বাড়ীর অঙ্গীর ছিল, তাহারা কখনও মনে করিত না যে, তাহারা পর। কর্তা বা কর্তী বাড়ীতে না থাকিলে তাহারা বাড়ীর কার্য-কলাপ-সম্বন্ধে এমনই দারিদ্রপূর্ণ এক একটা কাজ করিয়া বলিত যে, এখনকার নিকট-আত্মীয়েরাও জিজ্ঞাসা না করিয়া সেরূপ করিতে সাহসী হন না। তাহার জন্ত যদি মাঝে মাঝে তাহাদের গ্যালিও শুনিতে হইত, তবে “বৃক্ষ যথা বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়”—এই ভাবে তাহারা সকল অত্যাচার-অবিচার সহিয়া লইত।

কিন্তু এখনকার দাসদাসীরা আমাদের বেতন খাইতেছে ও আমরা বাহা

বলিব, তাহাই করিতে আইনমত তাহারা বাধ্য, এ ভাবটি কিছুতেই আমরা ভুলিতে পারি না। আমাদের সঙ্গে তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা

মনিব, তাহারা ভৃত্য। সহরের অনেক বড় লোকের এখনকার দাস-দাসী বাড়ীতে তাহাদের নামের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূচক শব্দ যোগ

দেওয়া দূরের কথা, তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিলে যে ঘনিষ্ঠতা হইবার সম্ভব, সেটুকু সহ্য না করিয়া, তাহারা চাকরকে ডাকেন, “বেয়ারা।” এই ব্যাপারে যে ভাঙ্কিয়া ও দ্বন্দ্ব আছে, তাহা সেই সকল বাড়ীর চাকরেরা কেবল অপৰ্য্যাপ্ত চুরির লোভেই সহ্য করিয়া থাকে। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা দাস-দাসীকে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, তাহা হইলে তাহাদের দেহে দণ্ডগুণ বল বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা কাজ করিতে আনন্দ বোধ করিবে। তাহারা যখন ‘বেয়ারা’ ডাক আবৃত্তি করেন,—তখন তাহারা সর্বপ্রকারে সংসারের বাহিরে আছে, ইহা মনে করিয়া কেবল শীকারাঘেবী বিভালের মত ছোঁ মারিয়া থাকে—কি ভাবে মালিকের সমস্ত দ্রব্য হইতেই কিছু ভাগ চুরি করিবে।

এদিকে অন্তান্ত কারণেও দাস-দাসীদের সেক্রম আত্মগত্যা করার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এখন ছোট লোকদের মধ্যে আত্ম-সম্মানের জ্ঞান হইয়াছে, ভদ্র-গৃহস্থের রোজগারের পথ যতই বন্ধ হইতেছে, মিল ও বড় বড় দোকানপাট ও সহরগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা বেশী আয়ের পথ পাইতেছে। তাহার পর জাতিভেদ নুতন ভাবে আবার জমিয়া উঠিতেছে, শূদ্র ক্ষত্রিয় হইতেছেন,—কৈবর্ত বৈশ্য হইতেছেন, নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ হইতেছে, স্নাতরাং সমাজে আর কেহ শূদ্র থাকিতে প্রস্তুত নহে।

যে সকল শক্তি-প্রভাবে সমাজের উপর এই সকল পরিবর্তন হইতেছে, তাহার উপর আমাদের আর হাত কি? তবে ‘স্বগৃহীণীগণের বাড়ীর চাকর-বাকরের উপর একটা কর্তব্য আছে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য। মনে করিতেছি।

সহরে আজকাল চাকরদের প্রধান কাজ বাজার করা। এই কাজে তাহাদের

বেশ ছুপয়সা হইয়া থাকে, সুতরাং একবারের স্থানে দশবার বাজারে ঘুরিতেও তাহারা আপত্তি করে না। বাজারে জিনিসপত্রের মোটামোটি একটা দর বাড়ীতে জানা থাকা উচিত। যদি বাড়ীর লোক কেহ চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাজারে যান, তবে ভাল; যদি সেরূপ সুবিধা না থাকে, তবে বাজারে কোন্ জিনিসের কি দর, তাহা কর্তৃপক্ষের মধ্যে কাহারও সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যাইয়াও জানিয়া আসা উচিত। চাকরকে শুধু সন্দেহ করিয়া এ বিষয়ে গালি দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে সে রাগিয়া যাইবে; হয় ত সন্দেহও ভুল হইতে পারে। এই জন্ত যদি তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখান যায়, সে যে দরে জিনিস আনিয়াছে, তাহা হইতে অল্প দরে তাহা পাওয়া যায়—তবে আর তাহার কথা কহিবার উপায় থাকে না। বাড়ীতে মাছ প্রভৃতি যদি মাঝে মাঝে ওজন করিয়া লওয়া হয়, তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঠিক আনিয়াছে কি না। রোজই দাঁড়িপাল্লা হাতে লইয়া বাজারে জিনিসপত্র মাপিয়া লওয়ার দরকার নাই। কিন্তু দুই এক সপ্তাহ পর একদিন সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, মাপিয়া লইলে চাকর সাবধান হইয়া যাইবে। শুধু সন্দেহের দরুন ‘তুই চুরি করিয়াছিস্, বলিয়া ওর্জ্জন না করিয়া ওজন কিংবা দামের একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া কোন গালাগালি না করিলেও তাহার সংশোধন হইবে। গৃহিণী বাজার-সম্বন্ধে সর্বদা নিজেকে অভিজ্ঞ রাখিবেন। আমি এমন দেখিয়াছি, পাশের বাড়ীতে চুড়ীওয়ালী যে দরে চুড়ী বিক্রয় করিয়া গেল, তাহার ঠিক দ্বিগুণ দরে অপর বাড়ীর মেয়েরা তাহা ক্রয় করিলেন। মেয়েরা যদি এ বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তবে নানা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জিনিসের দর জানিতে পারেন। কোন্ কোন্ বাজারে কোন্ জিনিস সস্তা ও ভাল পাওয়া যায়, তাহাও গৃহিণীর এই ভাবে জানা উচিত। বাজারে উৎকৃষ্ট বি বলিয়া যে চর্ব্বি অগ্নি-মূল্যে খরিদ করা হয়,—তাহা হইতে মাখন-মারা বিএর দামের বেশী তফাৎ নাই,—হাৎ সাহেবের বাজার হইতে ভাল মাখন আনিয়া বি করিলে তাহা বাজারের বি হইতে চের উপাদেয় হয়, এবং দরের বেশী তফাৎ হয় না, ইহা আমরা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

চাকরেরা অনেক সময় সত্যার কিনিবার লোভে বাজারের হাত-বাছা তরকারী লইয়া আসে, এই জন্ত বাড়ীর কর্তৃপক্ষের কাহারও মধ্যে মধ্যে বাজারে বাইরা কি ভাবের জিনিষ বাজারে পাওয়া যায়, তাহার নমুনা বাড়ীতে আনিয়া দেখান উচিত। নতুবা উৎকৃষ্ট জিনিষ যে দরে পাওয়া যায়, সেই দর দিয়া বাজারের অধম জিনিষ খাইতে হইবে। এ বিষয়ে কর্তারা উদাসীন থাকিলেও মেরেরা সর্বদা তাঁহা-দিগকে জানাইলে, তাঁহারা একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না।

চাকর চাকরাণীদিগকে শুধু সন্দেহ করিয়া তর্জন-গর্জন করা উচিত নহে, তাহাতে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যায়,—কারণ, কোন কোন সময় হয় ত সন্দেহ অমূলক হয়; ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। বরং মুখে গালাগালি দেওয়া ভাল, কারণ,

অসাক্ষাতে জটলা --

তাহারা তাহাদের নিজেদের পক্ষের হু-একটা উত্তর দিতে পারে। কিন্তু বিরক্ত বা ক্ষতির কারণ হইলেও তাহাদের অসাক্ষাতে এ বিষয়ে জটলা করা একেবারেই উচিত নহে। অনেক পরিবারে প্রকাশ্যভাবে কোন গালাগালি দেওয়া হয় না,—কিন্তু দাস-দাসীর কাজ লইয়া ঘরের মধ্যে সর্বদা আলোচনা করা হয়। অনেক বাড়ীতে বালক-বালিকারা এইভাবে একরূপ হুর্নোতির প্রদর্শন পায় যে, সর্বদাই “মা, ঐ চাকরটা এই করিতেছে,” “ঐ তুমি আদা আনিতে পরমা দিয়াছ, সে ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে,” “মা, কলসোটা খালি পড়িয়া আছে, আমি কল হইতে জল আনিতে বলিলাম, সে কিছুতেই আনিল না,” “মা, ঐ দেখ খোঁকাকে রাখিতে দিয়াছ সৈ, এমন জ্বারে হাত ধরিয়া টানিতেছে যে, তাহার হাতে ব্যথা লাগিয়াছে,” এইভাবে বালক-বালিকারা মায়ের কানে চাকর-বাকরের সম্বন্ধে নানা কথা লাগাইতেছে; শুনিয়া রাগে তাঁহার কপোলদেশ ক্রমশঃই আরক্ত হইয়া উঠিতেছে; চাকরকে কিছু না বলিয়া তিনি কর্তৃপক্ষের কাহাকেও কিছু বলিলেন, ফলে সেই ব্যক্তি বিচার না করিয়া চাকরকে হঠাৎ এক ঘুষি লাগাইয়া দিলেন। বালক-বালিকারা যখন দেখিল, তাহাদের কথায় এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তখন তাহারা যেন রণজয় করিয়াছে, একরূপ উল্লাস বোধ করিতে লাগিল, এবং লাগানি-পোড়ানির

কার্যে আরও ভাল করিয়া দীক্ষিত হইল। এই কুশিকায় ছেলেরা এমন হইয়া পীড়ায় যে, শেষে বড় হইয়া তাহারা গৃহস্থের ঘর ভাঙায়। এই কুশিকা হইতে জননী শিশুদিগকে রক্ষা করিবেন ; চাকর বাকর সবকে কোন আলোচনা তাহারা বেন না করে,—শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে এ বিষয়ে সতর্ক রাখিবেন। চাকরদিগকে যাহা বলিতে হয়, তাহা নিজেরা বলিবেন। যদি সত্য-সত্যই তাহারা অসঙ্গত কাজ করে, তবে গালি খাইয়া তাহারা বিরক্ত হইবে না। তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলার কোন দরকার নাই ; কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যদি সর্বদা তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতে থাকে, তবে গালি না খাইলেও তাহারা আর সে সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না। কারণ, সমবেদনা বা শ্রীতির চিহ্ন যেখানে নাই, সে স্থান মরুভূমির স্থায় অস্থায়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, দাসগণ ঠিক স্বতীয় কাঁটার মত নিজ কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য,—তাহারা বাজারে যুধিষ্ঠির এবং সর্ববিষয়ে জ্যোতির্ষ্য বা

সব্যসাচীর মত দক্ষ হইবে। পান হইতে চুণ খসিলেই উহার সামান্য বায়ু

তাহাদের আদর্শ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাদের রাগের

সীমা থাকে না। ভৃত্যেরা যদি এত গুণধর এবং চাকরানীরা যদি এত গুণধারিণী হইবে, তবে তিন-চার টাকা মাহিনার জন্য তাহারা পরের দাসত্ব করিবে কেন ? বরং জানিতে হইবে, ইহাদের অনেক দোষ আছে ; ইহাদের রাগ ও বিরক্তি-বোধ আমাদেরই মত ; কিংবা আমাদের অপেক্ষা বেশী ; কারণ, তাহারা শিক্ষিত নহে। যখন পরিশ্রম করিতে আসিয়াছে ও ক্ষুধার কাতর, তখন উহাদের বর্ধার দোষের উল্লেখ করিয়া গালি দিলেও উহারা চটিয়া বাইতে পারে, এবং ক্ষুধার সময় যদি খাওয়ার জব্যাদি কম পড়ে, তবে তাহাদেরও পেটে ক্ষুধা থাকিয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মেজাজ তিরিক্খী হইতে পারে। তাহারা হয় ত বাজারে বাইয়া কোন চেনা-লোকের সঙ্গে আলাপ করার দরুণ বাড়ী করিতে দশ মিনিট দেরি করিতে পারে, এবং ইচ্ছা না হইলে শরীর-অস্থির হুতো ধরিয়া এক ঘণ্টা কাল ঘুমাইয়া লইতে পারে ; ইহা ছাড়া বাত্মা শুনিতে বাইয়া সারারাত আগরণের কলে হয় ত

সকালে ঘুম ভাঙিতে কিছু বেরী হইতে পারে, এবং হঠাৎ শুকনো কাপড় তুলিতে বাইরা হেঁচকা টানে তাহার হৃ-একটা জারগা ছিঁড়িয়াও ফেলিতে পারে; কিন্তু এই সকল কারণেই যে তাহার একেবারে পরিত্যাজ্য ও ভয়ানক গালির পাত্র, তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক ক্ষতি ও রাগের কারণ সহিয়া থাকিতে হইবে, তবেই এই ভব-সমুদ্রে টিকিয়া থাকা যায়। তৃত যে মন্ত্রে বশীভূত হয়, আমি তাহা জানি। সে মন্ত্র—স্নেহ-মন্ত্র, ইহার বলে অনেক গাধাকে মানুষ হইতে দেখিয়াছি।

চাকরদের ভাল খাবার একটু স্নেহের সঙ্গে দিলে, তাহাদিগকে দিয়া অনেক কাজ করান যাইতে পারে। এই মন্ত্রটি এখনকার কোন কোন গৃহিণী জানেন;

পাণ্ডরাইবার ঘড় ~~~~~ পূর্বে সকল গৃহিণীই জানিতেন। মাতা যে শুণে আপন করিয়া তোলেন, ইহা সেই শুণ। যেখানে গৃহিণীর হাতের রান্না ভাল ও তিনি দাস-দাসীকে যত্ন করিয়া খাওয়ান, সেখানে তাহার অনেক অত্যাচার সহিয়াও পড়িয়া থাকে। অনেক বেশী মাহিয়ানার লোভ দেখাইলেও তাহার তথা হইতে বাইতে চাহে না।

বর্ন সময়ে অসময়ে সর্বদা দোষ ধরিয়া দাস-দাসীকে তিরস্কার করা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে বাহারী একান্তই বেশী কথা বলে না, তাহার পর্য্যন্ত জবাব দিতে

দোষ ধরা ~~~~~ শিখে! চাকর-বাকরেরা যদি গৃহস্থের কথায় কথায় জবাব দেয় এবং বাঁকিয়া বলে, তবে তাহাদিগকে দিয়া

কাজ চলে না, এবং সর্বদা অপমানিত হইতে হয়। অনেক গৃহস্থের কাজ চলে না, এইজন্য দারে পড়িয়া এই ভাবের চাকর রাখিতে হয়। চাকরকে কোন কথা বলিলে যদি সে কথিয়া উঠে, এবং মনিবকে তাহার ছবিবনৌ ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতে হয়, ইহা হইতে হুর্গতির বিষয় আর কি অধিক হইতে পারে? কাহারও ক্রমাগত দোষ ধরিলে এবং তাহার পাছে লাগিয়া থাকিলে, শেষে সে নরিতা হইয়া উঠে, মনিব-টনিব গ্রাহ্য করে না।

এইজন্য তাহাদিগকে দিনের মধ্যে অষ্টপ্রহর তাড়া করা, শিওদিগকে দিয়া

গাল খাওয়ার, অথবা তাহাদের পশ্চাতে জটলা করা উচিত নহে। নিতান্ত যাহাকে দিয়া চলিবে না, তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক, কিন্তু যাহাকে চালাইয়া লইতে পারা যায়, তাহাকে খানিকটা স্নেহ দেখাইয়া বশ করিয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। তাহার উপর বিরূপ থাকিব, অথচ তাহাকে দিয়া শুধু প্রয়োজন সাধিয়া লইব, এই চেষ্টা বিকল হইবে।

যদি নিতান্তই অচল হয়, তবে রাগের বোঁকে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত নহে। অনেক গৃহিণী হঠাৎ কোন দাস-দাসীর ব্যবহারে একপ অসহিষ্ণু

হইয়া পড়েন যে কর্তাকে বলিয়া তাকে তখনই জ্বাব হঠাৎ ছাড়াইয়া দেওয়া।

না দিতে পারিলে—তিনি অন্ন-জল ত্যাগ করিতে সক্ষম করেন। রাগের বোঁকে কোন কাজই ভাল নহে। আর কিছু না দেখিলেও নিজের সুবিধা-অসুবিধা ত দেখিতেই হইবে। চাকর হয় ত সত্যই একটা ঘোর অস্তায় করিয়াছে। তাহাকে তখনই বিদায় দিলে যদি শীঘ্র লোক না পাওয়া যায়,—তবে বিপদ। তাহারা ত বন্দীর প্রাজুরেটের ভায় হাটে-পথে চাকুরীর জন্ত বসিয়া নাই। রাগের বোঁকে গৃহিণী চাকর কি চাকরানীকে বিদায় করিয়া তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের সোনার বালাটা বাম-হাতে পরিয়া নিজেই বাসন মাজিতে বসিলেন। কর্তা চাকুরী কিংবা বিষয়-কর্মে একপ ব্যস্ত যে, তাঁহার তিলমাত্র অবসর নাই, অথচ সংসার অচল দেখিয়া তাঁহার জরুরী কাগজ-পত্রের ভাড়া ফেলিয়া তিনি বাজারে ছুটিলেন। বালকগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া এ জিনিস ও জিনিস আনিতে দোকানে ছুটিল, ফলে তাহাদের সন্ধি, কাসি ও জ্বর হইল। গৃহিণীর উপর সমস্ত সংসারের হুশিঙ্গা ও কাজের ভার পড়িল, এ অবস্থায় হয় ত তিনি অসুখ করিয়া বসিলেন। কর্তাকে রাধিতে হইল, বালি প্রস্তুত ও ডাক্তারের বাড়ীতে ছুটাছুটি করিতে হইল, উপরন্তু অকিসের কাজের ক্রটি পাইয়া কিংবা ত্রিক সময় মত বাইতে না পারায় দক্ষণ সাহেব বিরক্ত হইয়া গালি পাড়িতে লাগিলেন। গরীব গৃহস্থের পক্ষে ইহা হইতে বিপদ আর কি হইতে পারে? “কৃত্যাত্মারে ভবতি মরণং” এ শ্লোকটি সফলেই জানেন।

এইজন্য যদি দাস-দাসীকে ছাড়াইরা দেওয়াই স্থির হয়, তবে হুঁচর দিন মনের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া অপর একটি নিয়ুক্ত করিয়া—তার পর তাহার মাহিয়ানা চুকাইরা জবাব দিলে দোষ কি ? সংসারটা যিনি বজার রাখিবেন, তিনিই গৃহিণী । সংসার চলার পক্ষে যিনি পদে পদে বাধা দিবেন, তিনি গৃহিণী-পন্থের ধোঁপা নহেন ।

কিন্তু চাকরদের যদি এমন কোনও অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, বাহাতে একদিনও তাহাকে বাড়ীতে রাখিলে বিপদাপন্ন হইতে হয়—তখন অবস্থার তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত । এক তত্ত্বলোকের বাড়ীর চাকর তাঁহার তিন বৎসরের মেয়েটিকে বেচিবার বড় বস্ত্র করিতেছিল, এরূপ শুনিয়াছি । এই রকম ব্যাপারে তিলানুভূতি তাহাকে প্রভুর দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু এরূপ ঘটনা সংসারে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে ।

অনেক বাড়ীতে চাকর-চাকরাণীকে বারংবার জবাব দেওয়ার ফলে, তাহার এরূপ নিন্দা প্রচার করে যে, গৃহস্থ কিছুতেই চাকর-চাকরাণী খুঁজিয়া পান না । “আচ্ছা মহাশয়, এই আসিতেছি” বলিয়া বাবুটিকে নিশ্চিত করিয়া চাকর আর আসিল না, কিংবা নিতান্ত চঞ্চলজ্ঞায় ঠেকিয়া একবেলা কাজ করিয়াই সে পিটুটান দিল । এইভাবে গৃহস্থ অনেক সময় বড়ই বিপদাপন্ন হইয়া পড়েন । অতিরিক্ত মাহিয়ানার লোভে এবং ভবিষ্যতে নানারূপ উন্নতির আশা-ভরসা দিয়াও কিছুতেই নূতন চাকরকে গৃহে ভিড়াইতে পারেন না । যে গৃহে চাকরেরা একটু স্নেহ-বস্ত্র পায়, এবং গৃহিণী খাওয়া-দাওয়ার তত্বির করেন,—তাঁহার বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী আপনা হইতে আসিতে লাগারিত থাকে—গৃহস্থ এ কথাটি মনে রাখিবেন । যে চাকরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে নূতন চাকর বাহাতে অটলা করিতে না পার, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ, তাহা না হইলে, পুরাতনটি নূতনটিকেও নিশ্চয় ভাঙাইবে । চাকরের মাহিয়ানা হাতে রাখিয়া অনেকে তাহার দ্বারা বেশী কাজ আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করেন । এটা নিতান্ত অস্বাভাবিক রীতি নহে । যেখানে চাকর স্বতাবতই

কাজ-কৰ্মে শিথিল, এবং চুৰ্ছাবহার করিয়া থাকে, সেখানে বাহিরানা আটকাইলে তাহার চরিত্র অনেক পরিমাণে শোধরাইতে দেখিয়াছি। কারণ, টাকা বাহার কাছে পাওয়া থাকে, তাহার নিকট লোকেরা কতকটা অপরাধীর মত থাকে, এবং তাহার মন বোগাইয়া উহা আদায়ের চেষ্টা দেখে। কিন্তু সাংসারিক ব্যবহারে আমি কিছুতেই নিষ্ঠুরতার পক্ষপাতী হইতে পারি না। নিষ্ঠুরতার দ্বারা কাজ আদায় করিতে পারা বাইতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় পাওয়া যায় না। বাহা অধর্ম ও অন্যায়—তাহার প্রশ্রয় দিলে নিজের চরিত্র বিকৃত হইয়া উঠে। ইহা অপেক্ষা ভাল লোকের বেশী ক্ষতি কি হইতে পারে? চরিত্রের সাধুতা রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য হইয়া থাকি।

কোন কোন বাড়ীর চাকর এতদূর অন্তর্য যে, বাহিরের কোন ভদ্রলোক আসিলে তাহার ব্যবহারে তিনি একান্ত ক্ষুদ্র ও অপমানিত হন। সে যেন নবাব খান্না খাঁ—শত প্রশ্ন করিলেও উত্তর দিতেছে না, কেবল হঁকাই টানিতেছে, কিংবা একদম উত্তর দিতেছে যে, আগন্তুক ভদ্রলোক আপাদমস্তকে জালা বোধ করিতেছেন। গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর একদম হুক্মিনীত হইলে, লোকে কিন্তু তাহার

দোষ দেয় না। সাধারণের বিশ্বাস, মনিবের ছাপ হুক্মিনীত ভৃত্য চাকরের গারে পড়ে। গৃহস্থের মনের ভিতরে যদি

অভ্যুত্থা থাকে, তবে চাকর তাহার সুপ্তিমান্ বিগ্রহ-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, এটা যদি চাকরের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে যে, অভ্যুত্থা আচরণ করিলে গৃহস্থ কিংবা গৃহিণী প্রকৃতই বিরক্ত হইবেন, তাহা হইলে সে তাহার উগ্র স্বভাব সহজেই সংবরণ ও সংশোধন করিয়া লয়। গৃহস্থ যতই মৌখিক মিষ্টতার বৃষ্টি বর্জন না কেন, তাঁহার ভিতরটা কিরূপ, তাহা অনেক সময় তাঁহার দাস-দাসীরা আয়নার মত প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখায়। এই ভাবে যখন লোকে চাকরের ব্যবহারটা গৃহস্থের প্রকৃত মনের ভাবের বাহ্য-বিকাশ বলিয়া ধরিয় লয়, তখন গৃহিণী ও কর্তার এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত, এবং বাহিরের লোকের সঙ্গে কিরূপ

আচরণ করিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া রাখা উচিত। অনেক বনেদি বড় মাল্লবের ঘরে দাস-দাসীদের ব্যবহার একরূপ সুলভ্য যে, তাহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়।

অনেক গৃহস্থ, চাকরের হস্তে শিশু-রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিত থাকেন,—কিন্তু ইহাতে অনেক দুশ্চিন্তার কথা আছে। এমনও দেখা যায় যে, চাকর মটর-ভাড়া

শিশু রক্ষার ভার
কিনিয়া খাইতেছে ও মনিবের পেটরোগা ছেলেটাকে
তাহা হইতে দু-দশটা খাইতে দিতেছে, অথচ সে

ছেলে বাড়ীতে বালি খায়। আর ও পেটের অন্থে কাতর আমার একটি ছোট ছেলেকে এক মমতাময়ী কী কতকগুলি কচি পেয়ারা খাওয়াইয়া একরূপ বিপদ ঘটাইয়াছিল যে, তাহাকে বমে-মাল্লবে টানাটানি করিয়া রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কোনও সময় চাকর রকে বসিয়া তামাকু টানিতেছে ও বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছে, ছেলেটা নীচে বসিয়া তামাকের গুল খাইতেছে, নর্দমার জলকাদা মুখে মাখিতেছে, অথবা ঘুঁটের ডেলা মুখে পুরিতেছে। কলিকাতার নিশ্চিত গৃহস্থের স্নেহের দুলালদিগের এই ছুরবস্থা পথে ঘাটে অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

এই অল্প চাকর-চাকরানীর সাবধানতার পরীক্ষা না পাইয়া ছেলেদের ভার তাহাদের উপর দেওয়া উচিত নহে। ছেলেকে কোলে করিয়া বাহিরে পাঠাইবার পূর্বে কয়েকদিন চাকরকে বাড়ীতেই রাখিবার ভার দিয়া পরখ করিয়া লওয়া উচিত। যদি দেখা যায়, সে সতর্ক ও বিশ্বাস-যোগ্য, তাহা হইলে একটু বাহিরে ছেলে লইয়া বেড়াইয়া আসিলে তাহার ক্ষুধা হইবে—কিন্তু অসতর্ক ও অমনোযোগী ব্যক্তির হস্তে গৃহীণী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিশুকে কখনই ছাড়িয়া দিবেন না। শিশুর দেহ অতি কোমল, একটু সামান্য অন্থ হইলে ফুলের মতন তাহাদের মাথা নোওয়াইয়া পড়ে।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ও অন্যান্য কথা

গুরুজনের প্রতি গৃহ-লগনারা কিরূপ ব্যবহার করিবেন, বাংলাকাল হইতেই তাহা শিক্ষার দরকার। বাহার। নিজেরা জননী হইবেন, তাঁহারা কিছুদিনের

মধ্যে বুঝিতে পারিবেন, সন্তানের জন্ম জনক-জননী পিতা মাতার কষ্ট কতদূর করিয়া থাকেন। কত অনিদ্রা, কত হুশিষ্টতা

ও অনাহারে প্রতিদিন এই সন্তানপালন-ব্রত উদ্ঘোষিত হইয়া থাকে। এত কষ্টের ধন যদি বিগড়াইয়া যায়, সে যদি মা-বাপকে মাগ্ন না করে, যদি তাহার নিকট হইতে কিছুমাত্র স্নেহের প্রতিদান না পাওয়া যায়, তবে পিতামাতার প্রাণে কিরূপ হৃৎসহ বেদনা হয়! মাতা শিশুর জন্ম-প্রাণ দিয়া দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রতিদানে কি চান? শিশুর একটু হাসি বা একটিবার ‘মা’ ডাকে তিনি হাতে স্বর্গ পান; তিনি আর কিছু চান না। সন্তান বড় হইলে যদি তাঁহার খোঁজ না লয়, তবে “আহা, ভাল খা’ক, একবার মুখখানি দেখিলে চক্ষু জুড়াইত!”— ইহা ছাড়া তাঁহার আর কোন কামনা থাকে না। এই ত্যাগজনিত স্নেহের তুলনা কোথায়? সেই শিশু বড় হইয়া দুয়ারে দুয়ারে বাইরা আঘাত করিবে এবং দেখিবে, আর কেহ তাহাকে সেই মাতৃস্নেহের শতাংশের একাংশ দিতেও প্রস্তুত হইবে না। জন্মমাত্র নিঃসহায় জীবকে ভগবানের করুণা স্বয়ং মা হইয়া কোলে লইয়া বসিয়াছিল, পিতা হইয়া তাহার রক্ষার জন্ত চিন্তা করিয়াছিল। এই গৃহের দেবদ্বারে বাহার। প্রথম দেখা দিয়াছিলেন, বাহার। খাইতে দিয়াছিলেন ও বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন, কত বৃষ্টিতে ভিজিয়া, কত হুশিষ্টতা করিয়া, মন্দিরে মন্দিরে কত ঘরা দিয়া, ডাক্তারের বাড়ী ঘুরিয়া নিজের খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া দিয়া, বাহার। আমাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপেক্ষা বড় দেবতা কে জানি না,—কোন দেব কি দেবীকে, আমরা ‘মা’ ‘বাবা’ অপেক্ষা উচ্চ নামে

তাঁহাদের স্নেহ

ডাকিতে পারিয়াছি? তাঁহারা যখন ছাড়িয়া যান, তখনও নানা বস্ত্রপাশ পড়িয়া তাঁহাদের স্মরণ করিলেই

আমরা শান্তি পাইরা থাকি। যখন আমরা আর্ন্ত ও নিরাশ্রয় হই, তখন “মা” “বাবা” শব্দ আপনা-আপনি মুখে আসে। রোগে, শোকে, হুঃখে পড়িয়া তাঁহাদেরই চরণ মনে পড়ে। তাঁহাদের প্রতি স্নেহাপরোধ করিলে শেষে তপ্ত অশ্রুজলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। সর্বদা তোমার জন্ত চিন্তা করিতেছেন ও কষ্ট সহিতেছেন—অনায়াস-লব্ধ অসীম স্নেহ পাইরাছ বলিয়া তাহার মূল্য দিতে ভুলিও না, জগতে সেরূপ আর পাইবে না। কত মূর্ত্তি দেখিবে, কত চিত্রকর কতরূপ আঁকিয়া দেখাইবে, কিন্তু মায়ের মুখের কমনীয়তা কোথায় পাইবে,—পিতার স্নেহদৃষ্টি কোথায় দেখিবে ?

পিতামাতাকে ছাড়িয়া অনেক যুবক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, তাহাদের পিতামাতা ভাল কি মন্দ, তাহা আমি জানি না। কিন্তু শিশুর পক্ষে তাঁহারা সর্বাপেক্ষা ভাল হইয়া তাকে রক্ষা করিয়া বড় করিয়াছেন।

তাহাদিগকে ত্যাগ করা
সংসারে কোন সাধু, কোন শক্তিমান্ন পুরুষ বা কোন মহৎ ব্যক্তি বাহা করেন নাই,—বাহা করিতে পারিতেন না, শিশুর জন্ত পিতামাতা তাহাই করিয়া থাকেন। শিশুর পক্ষে তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল কে হইতে পারে ? যদি বৃদ্ধ বয়সের দোষ আবিষ্কার করিয়া পুত্র তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যায়, তবে তাঁহাদের মনে কি ভাব হয়, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব ? পিতামাতা তাহার নিকট কোন প্রত্যাশার চান না ; যে পুত্র পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দিতে ভুল না করে, সেইখান হইতে ভগবান্-স্বয়ং তাহার পূজা গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পিতামাতাকে কষ্ট দিয়াছেন, তাহার পশ্চাৎ তাঁহাদের দীর্ঘনিশ্বাস ঘুরিয়াছে,—তাহারা সংসারের উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া হৃদয়ের আলার হাত কিছুতেই এড়াইতে পারে নাই। এরূপ নিঃস্বার্থ প্রেমের অণুমানে বিধাতা প্রসন্ন হন না। আমি নিজে এ বিষয়ে অপরাধী, এবং সেই অপরাধের বহু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এ কথা লিখিতেছি।

স্নেহময়ী রমণীরা এ কথা ভাল বুঝিতে পারিবেন। যদি অর্জুনশীল পুত্র পিতাকে ত্যাগ করেন, তবে এই অপরাধের জন্ত লোকে সাধারণতঃ পুত্রবধূকে

দায়ী করে। অনেক সময় সত্য সত্যই মূল অপরাধ বধুরই বটে। জী সহধর্মিণী, তিনি তাঁহার স্বামীকে যদি এই মহা অধর্মের পথে টানিয়া ল'ন, কে আর তাঁহাকে উন্নত করিবে? যদি বৃদ্ধ-বয়সে নিরাশ পিতামাতা তাঁহাদের ছোট ছোট শিশু-সন্তান লইয়া দিনরাত্রি দুঃখে ও হুশ্চিন্তার সময় কাটাইতে থাকেন, অথচ যে পুত্রকে তিনি বহুদৃষ্টে মাহুষ করিয়াছিলেন, সে পৃথক্ হইয়া তাহার ভ্রাতাদের বা পিতামাতার খোঁজ না লয়, তবে সে দুঃখ পিতামাতা বলিবেন কাহাকে?—তাঁহারা অবশ্য পতিদানে কিছু চান না,—কিন্তু পুত্রের নির্মমতার তাঁহাদের প্রাণে যে শেল বিদ্ধ হয়, তাহা অনেক সময় তাঁহাদের মৃত্যুবাণ হইয়া পড়ে। ছোট ছোট শিশুগুলিকে নিঃসহায় দেখিয়া তাঁহাদের কান্না পায়। নিজেদের দুঃসহ জীবনের বোঝা নামাইতে পারিলেই জ্ঞান পান, অথচ শিশুদিগের মুখের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন; তাঁহাদের দৈনন্দিন সেই রাশি রাশি দুঃখ যে সন্তানের প্রাণে না লাগে, সে কি নির্মম! যে সাময়িক সুখের প্রত্যাশায় স্বাভাবিক এই মহান্নেহের বন্ধনকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সে আত্মতৃপ্তির স্বর্গের দ্বার নিজ হাতে রুদ্ধ করিয়াছে।

বধু যদি সুবুদ্ধি হন, তবে কখনই তাঁহার স্বামীর সঙ্গে পিতামাতার ঐশ্বরিক স্নেহবন্ধন কাটিয়া কেলিবার জন্ত স্বার্থের ছুরিখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবেন না। বাহা স্বার্থের বিপর্যয়, তাহা কখনও সুখ বা উন্নতির কারণ হইতে পারে না। দোহ-শূণ্যে সংসার। কাহারও কোন একটা দোষ কল্পনায় নিতান্ত বড় করিয়া তোলার দরকার নাই। ডাকের বচনে আছে,—পিতার সঙ্গে যখন পুত্রের ঝগড়া হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে যে রাজা বান, তিনি অবোধ। কারণ, বাহিরের লোক এ ঝগড়ার মূলস্থল ছিঁড়িয়া কেলিতে পারিবেন না। একবিন্দু চক্ষের জলে উহা কোথায় উড়াইয়া লইয়া বাইবে, তাহার ঠিকানা নাই।

সংসারে যেখানে নিজেকে ভাল ও উন্নত করিতে হয়—সেইখানেই আত্মসংযম ও তপস্কার দরকার। দাম্পত্যপ্রেম প্রথমাবস্থায় বড় মধুর, তাহা ভোগের সামগ্রীর মত সহজেই মনকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু যে পথে উন্নতি, তাহা গিঁড়ি জালিয়া

উঠিতে হয়, তাহা গৃহের পূজা-পাঠ ও ভোগবিলাসের পার্শ্বে পড়িয়া নাই। সংসারীর তপস্বী করিতে হইলে, কর্তব্যের দুর্গম পথে বাইতে হইবে। এই অজ্ঞ

ভগবানের লীলা যে জারগার সর্কাপেক্ষা বেশী দেখা
সংঘ ও চিত্তশুদ্ধি

গিয়াছিল, সেই পিতামাতার মন্দিরে সংঘবৃদ্ধি দ্বারা মনকে পবিত্র ও উন্নত করিয়া বাইতে হইবে। নিজের স্বার্থ, সুখ ও ভোগের ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতে হইবে, তবেই তাহাদের পাদ-পদ্ম-দর্শনের অধিকার জন্মিবে। একবার সেই পাদপদ্ম যাহার নয়নগোচর হইয়াছে, তিনি দেখিবেন, তথায় পুষ্প-জল দিলে যত ঠাকুর-দেবতার পদে সেই অঞ্জলি পড়িবে। নতুবা বনের কুল কুড়াইয়া মন্দিরের কাছে আনাগোনা করিলে কোন লাভ নাই! এমন যে চৈতন্যদেব, তিনিও মধ্যে মধ্যে ‘মা’ ‘মা’ বলিয়া কাদিয়া অনুতাপ করিয়াছেন। শচীমাকে ছাড়িয়া যে ধর্ম করিতেছেন, তাহা সকলই কুল বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন। (১)

বধু স্বত্ত্ববাকীর গুরুজন এবং দেবর প্রভৃতির কোন দোষের কথা যেন স্বামীর কানে না তোলেন। এ সম্বন্ধে নিতান্তই যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে তিনি

সংঘত হইয়া স্বাণ্ডীকে বলিতে পারেন; এবং যেখানে তিনি
বধু কর্তব্য

স্বানীকে স্নেহের অপরাধী হইতে দেখিবেন, সেখানে তাঁহাকে ভাল উপদেশ দিয়া শোধরাইতে চেষ্টা করিবেন। নতুবা গৃহের দরজা তালিয়া স্বামীসহ উড়িয়া গেলে, সে গৃহটি ত কাণা করিয়া বাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে নির্ভেঁরাও কোন স্বার্থরূপে পড়িয়া লুটাপুট হইবেন, তাহার স্থিরতা নাই।

ওধু স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বগৃহিণী-পদবাচ্য হন না। যাহার সঙ্গে যে ভাব, গৃহের যে আত্মীয় তাঁহার স্নেহ বা সেবার যতটা জ্ঞানসম্মত দাবী রাখেন, তাহা পূরণ করিয়া পাতিব্রত ধর্ম আচরণ করিলেই এ দেশে সেই রমণী আদর্শ-গৃহিণী-পদবাচ্য হইতে পারেন। নতুবা

(১) তোমার সেবা ছাড়ি করিনু সন্ন্যাস।

বাউল হইয়া আমি ধর্ম কৈলাস নান। চৈতন্যচরিতামৃত।

তাহার-পত্নীকে হৃৎকথা শুনাইয়া, স্বপ্তের তিরস্কার-জনিত রাগের ফলে নিজের শিশুর পৃষ্ঠদেশ পিটাইয়া কিংবা রাগের কোঁকে খালা বাসন ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ও তাহাদের কাংশ-প্রাণের আর্তনাদের সঙ্গে নিজের সুর জুড়িয়া দিয়া কান্না আরম্ভ করিলে, সে মূর্ত্তি স্বামীর চক্ষে বতই করণার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন,—সংসারে অপর সকলে সেই উগ্র ও তাণ্ডব ভাব সহ করিতে পারিবেন না।

বধু ও কস্তুরী প্রাতে উঠিয়া ভগবানকে ডাকার পর জনক-জননী বা স্বপ্ত-স্বপ্তীর পদবন্দনা করিবেন ; সেই প্রণামের ফলে সে দিন শুভ হইবে। যদি কোন অন্তর আচরণের ফলে গুরুজনের মনে কোন হুঃখ বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে, ঐ প্রণাম সেই হুঃখ ও বিরক্তি দূর করিবে এবং

গুরুজনকে প্রণাম

তাঁহাদের মনে অপত্যস্নেহ নির্মল করিয়া তুলিবে।

বধু বা কস্তা যদি গুরুজনের ব্যবহারে মনে কষ্ট পাইয়া থাকেন, ভক্তির সহিত প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দেখিবেন, তাঁহার নিজের মনের ভাবও অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সেই বিরক্তি ও হুঃখের স্থলে তাঁহার হৃদয়ে কেবল আশীর্বাদ-লাভের ইচ্ছা ও স্নেহের ভাব আগ্রত হইয়াছে। গুরুজনকে ভূলাইবার একমাত্র উপায় তাঁহাকে স্নেহ ও ভক্তি দেখান। তাঁহার রাগ বতই উগ্র হইয়া উঠুক না কেন, অপত্যস্থানীয় ব্যক্তির চক্ষে উহা বত বড়ই হউক না কেন, যদি সন্তান বা সন্তান-স্থানীয়গণ তাঁহার ভৎসনা কিছুকাল নীরবে সহিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সে রাগ বানের জলে তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে ; স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিবে, অন্তরের সমস্ত মলা খুচিয়া যাইবে।

প্রতিবেশীও অপর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সহিত ব্যবহারে সর্বদা সতর্কতার দরকার। যদি অপর বাড়ীর একটা শিশু গাছ হইতে একটা আমড়া পাড়িয়া

প্রতিবেশিদের সঙ্গে
সতাব

লইয়া যাইয়া থাকে, কিংবা ছাদের উপর হইতে অপর বাড়ীর একটা শিশু আপনার পুত্র-কস্তাকে দুখ ভেজচাঁর বা লাধি দেখায় ও তাহার পিতা-মাতা যদি

তাঁহাকে শাসন না করিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত কথা বলেন, তবে তাহাই

লইয়া এ বাড়ীর গৃহিণী একটা বড় ব্যাপার গড়িয়া তুলিবেন না। এ সকল সামান্য কথা স্বামীর কানে তুলিবেন না। ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, ছোট ছোট কথা হইতে বড় বড় কথার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাড়ীর গৃহস্বামী আপনাদের সম্বন্ধে গোপনে তাঁহার স্ত্রীকে কি বলিয়াছেন ও সেই বাড়ীতে পক্ষীর আড়ালে আপনাদের সম্বন্ধে কি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে কান দিতে নাই। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে যতই উপেক্ষার ভাব দেখাইবেন, ততই সম্ভাব থাকিবে। একবার কলহের আরম্ভ হইলে তাহার অতি নিকট, তাঁহার অতি বিকট হইয়া পড়িবেন, এবং অনেক অন্বাত্তাবিক ঘটনার সংঘটন হইবে।

বিনয় ও লজ্জা নারীজাতির ভূষণ। নারীজাতি যতই লজ্জাশীলা হইবেন, ততই তাঁহার স্ত্রী দেখাইবেন, কারণ, লজ্জা ও নম্রতাই তাঁহাদের প্রকৃত

সৌন্দর্য্য। এই লজ্জার একটা বাজে অর্থ আছে, আমরা সে

লজ্জা

অর্থে ইহা ব্যবহার করি নাই। লজ্জার অর্থে পাচপোরা

ঘোমটা নহে। কোন বজীর রমণী তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর ঘোড়াটা হঠাৎ ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি লজ্জার ঘোমটা দিয়াছিলেন। কোন কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি, তাঁহার রেল-ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় একরূপ বড় ঘোমটা দিয়া রাস্তার আসিরা পড়েন যে, চক্ষু আবৃত থাকায় তাঁহার হঠাৎ পথিকের গায়ের উপর আসিরা পড়িতে পারেন। ইহা লজ্জা নহে, লজ্জার অভিনয় মাত্র। প্রকৃত লজ্জা জিহ্বাদি-সংযম। সংযত দৃষ্টি, সংযত কথা ও সংযত ব্যবহারেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত লজ্জা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা সকলেই সেইরূপ লজ্জাশীলা মেবী দেখিয়াছি; তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে কোমল-কুশল্যের উপমাশূল। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের চরিত্রে নারীহৃদয়ের বলের অভাব নাই। সে শক্তি সহিষ্ণুতার, সাধুতার এবং পরসেবার ও আত্ম-সমর্পণে সর্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আজকালকার দিনে রেলগাড়ী ও ষ্টীমারে অনেক স্ত্রীলোককে বাতায়ত

করিতে হয়। লজ্জাবতী লতা হইয়া থাকিলে এইরূপ বাতায়িতে অনেক সময় বিপদ ঘটিলে থাকে। তখনও কখনও প্রকৃত লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই বাহ

রাগা-বাট

লজ্জাকে কতক পরিমাণে বিদায় করিতে হয়। আমি আমার একটি আত্মীয় রমণীকে জানি, তিনি পরমা-সুন্দরী ও “ঘরে কুঁড়িফুল,”—কেহ তাঁহার উচ্চ কথাটি শুনিতে পান না। একদা তাঁহাকে লইয়া আমরা কোন দেবালয়ে গিয়াছিলাম,—আমাদের সঙ্গে দুইপোয়া এবং দুই তিন বর্ষ-বয়স্ক কয়েকটি শিশু ছিল। কোন আকস্মিক ঘটনার পড়িয়া মন্দির বাইতে আমাদের বিলম্ব হয় ও সমস্ত বন্দোবস্ত মাটি হইয়া যায়। সেই মন্দিরে অতিথি-অভ্যাগতদের খাওয়ার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু মন্দিরের ভার বাহার উপর, সে লোকটা ধরাপ ছিল। মন্দির-স্বামিনী তীর্থবাজীদের পাছে কোনরূপ অসুবিধা হয়, তজ্জন্য মাতার মত সকল দিক্ ভাবিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু অধ্যক্ষটির ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলাম। বেলা তখন তিনটা; তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর নিদ্রা বাইতেছিলেন। আমাদের ছেলেরা বলিতে গেলে একরূপ অনাহারেই ছিল,—তাঁহাদের চীৎকারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাঁহাকে আমরা আমাদের অবস্থা জানাইলাম, তিনি “এ সময়ে কি হইতে পারে?” অতি সংক্ষেপে এক কথায় আমাদের নিবেদন অগ্রাহ করিয়া লুইয়া পড়িলেন। আমরা ভয়ানক বিপদে পড়িলাম। কি করি? সেখান হইতে বাজার তিন মাইল দূরে। আমরা এরূপ পরিশ্রান্ত যে, আমাদের হাঁটুরা ততটা বাওয়া সুকঠিন, এবং স্ত্রীলোকদিগকে একা কেলিয়া কিরূপেই বা খাওয়া বাইতে পারে! কিন্তু আমার সেই আত্মীয় রমণী অল্পবয়স্কা হইলেও, মন্দিরের দাসদাসীরা বেখানে ছিল, সেখানে নিজে গেলেন, এবং এমনই করুণভাবে নিজেদের অবস্থা জানাইলেন যে—দুই তিন জন চাকর অরনি আসিয়া হাজির হইল, এবং হাত জোড় করিয়া বলিল, “মা, আপনার কোন চিন্তা নাই, আমরা সকলই আনিয়া দিতেছি।” আমরা দুধ, চাল, ডাল, সন্দেশ, ঘি, তরকারী সকলই পাইলাম।

এই জীলোকটি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রেলের টিকিট পর্যন্ত করিয়া যাতায়াত করিয়াছেন। হিন্দু-বরের অন্ন-বরদ্ব মেয়ের পক্ষে ইহা অসীম সাহায্য-কতা বলিতে হইবে। অনেক ছুটি লোক রাস্তার ছোটে। স্থানীয় মহিলা দেখিলে তাহারা অশিষ্টতার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে কোন দুর্নীত ব্যক্তিকে তিনি সংবত কথার এমনই চাবুক দিয়াছিলেন যে, সে ব্যক্তি লজ্জায় কোন্ দিকে পলাইবে, তাহার পথ পার নাই। এই রমণীর ব্যবহারে প্রকৃত লজ্জাশীলতার কখনও বিন্দুমাত্র ছুটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ অবস্থানসারে তিনি অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছেন। রাস্তা-ঘাটে বড় ঘোমটা অতিশয় বিসদৃশ। ঐ ঘোমটার ফলে কোন জীলোক সজ্জিত হইয়া ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যান, পথ না দেখিয়া থানা কিংবা ড্রেইনে পড়েন, যাত্রীদের গায়ের উপর পড়িয়া লজ্জা পান। রাস্তার ছুটি চক্ষু খুলিয়া চলিতে হইবে,—সেখানে চক্ষুর আবরণ বড় বিপজ্জনক। রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের সেমিজ পরিয়া যাওয়া উচিত। অনেক হিন্দু-রমণী প্রাচীন সংস্কারের ফলে সেমিজ পরিতে লজ্জা বোধ করেন; এক্ষণে ক্রমাতে তাঁহাদের যে প্রকৃত লজ্জাশীলতার অভাব হয়, তাহাতে আত্মীয়গণ লজ্জা পান।

রাস্তার একটি জিনিস বখাসাধা ভাগ করা উচিত, তাহা নিম্ন। রাত্রি আগিয়া রেল-ষ্টামারে বাইতে হয় ও ছোট ছোট শিশুরা গাড়ীর জানেলার দিকে

রাস্তার সতর্কতা।
বেশী না কোঁকে, তাহা সর্বদা দেখা দরকার। অনেক রেল-ষ্টামারে কিছুই খান না। ধর্ম-রক্ষার জন্য

একবারে কাঠ হইয়া বাড়ীতে ফেরেন। এইরূপ উপবাসের ফলে হঠাৎ রাস্তাতেই কোন অসুখ হইতে পারে—তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকে না। রেল-ষ্টামারে আমাদের যাতায়াতের খুব সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন ভাবগুলি সম্পূর্ণ বজার রাখিয়া উহাতে যাতায়াত করা যৌর বিপদ ও অসুবিধা-জনক। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়।

বোড়ার গাড়ীতে গহনা গার পরিয়া জীলোকেয়া সজ্জা কি রাজে চলাফেরা

করিতে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই ভাবে মাঝে মাঝে কেহ কেহ খুব বিপদে পড়েন। গাড়ী ও গাড়োরানের নম্বর টুকিয়া রাখিবেন। অনেক সময় গাড়ীর ছাদের উপর তোরঙ্গ বা বাক্স চাপাইয়া বাজী নিশ্চিন্ত-মনে চলিয়াছেন। গন্তব্য-স্থানে পৌছিয়া হঠাৎ দেখা গেল, তোরঙ্গ ও বাক্সটি নাই। গাড়োরান এই অবস্থার প্রায়ই বলিয়া থাকে, সে জিনিস আদবেই আনা হয় নাই, কিংবা কি ভাবে কে নিয়াছে, সে জানিতে পারে নাই। কারণ, সে ত ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়াছে, পাছের দিক্ করিয়া দেখিবার তাহার সুবিধা হয় নাই। সহিস হয় ত বলিবে, সে এক পরসার বিড়ি কিনিতে খানিকটা নামিয়াছিল, কে নিয়াছে ; দেখিতে পার নাই। মোট কথা, গাড়োরানদের সময় সময় নিজেদের দল থাকে, তাহাদের সঙ্গে জোট করিয়া এইভাবে চুরি করে। সুতরাং দামী জিনিস যে তোরঙ্গে বা বাক্সে বাইবে, তাহা গাড়ীর ছাদের উপর রাখিতে হইলে তৎক্ষণাৎ একটু ব্যবস্থার দরকার। অনেক সময় আবার বাড়ীতে পৌছিলে ভ্রমণকারী ব্যক্তির তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি গুছাইয়া তুলিবার সময় কোন কোন জিনিস গাড়ীতে কেলিয়া যান। গাড়োরান তাড়া চুকাইয়া লইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যায় এবং বাড়ীতে বাইরা সেই জিনিস আপনার করিয়া লয়।

রাস্তার বিপদ অনেক সময় ইহা হইতেও ঢের বেশী হয়। কলিকাতার একুশ শোনা গিয়াছে যে, ছষ্ট গাড়োরানদের মাঝে মাঝে এমন আড্ডা আছে, যেখানে বাজীর প্রাণ নিরা টানটানি ; হয় ত একটু বেশী রাড্ডে গাড়ী চলিয়াছে, গাড়োরান অলি-গলি দিয়া বাজীর অত্যন্ত ভাবে সেই আড্ডায় নিরা পৌছাইয়া দিল ; তখন শুভা আসিয়া প্রকৃতভাবে আক্রমণ করিল, গাড়োরান সাফাৎসবন্ধে তাহাদের সঙ্গে যোগ না দিয়া ঘোড়ার বলগা ধরিয়া নিশ্চেষ্টে বুদ্ধদেবের মূর্তির মত বলিয়া রহিল। তখন বাজীর অদৃষ্টের লিখনালুসারে ঘটনা ঘটতে লাগিল। মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে বাইবার সময় একটু শক্ত হইবেন,—তাহারা একেবারে ফুলের কুড়ির মত হইয়া থাকিলে চলিবে না।

আজকাল পুত্র-কন্ডার বিবাহের সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনেক সময় মাথা

খুঁটিয়া যায়। একে ত বরের পণ এক বিষম সমস্তা! স্বর্গান্তের মধ্যে দেব রাজ্যে
লইয়া জমিদার বৈরাগ্য বিব্রত হইয়া পড়েন, বরের পণের বিপদের সঙ্গে তাহার

তুলনাই হয় না; পাশকরা ছেলের পিতামাতার এক
পুত্র-কস্তার বিবাহে দিনের অল্প দোহিও প্রতাপ অনেকই দেখিয়াছেন।

অনেক সময় তাঁহাদের চক্ষুলাজা থাকে না,—যাঁহাদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা-স্থলে
আবদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের চোখের জল ও বিপদ তাঁহারা অতি অকিঞ্চিৎকর মনে
করেন। গৃহস্থের উদ্বাসন বিক্রয় করা বা দেনাদারের নিকট নিঃসহায় ভাবে
তাঁহার চুলগুলির প্রত্যেকটি বন্ধক দেওয়া,—প্রভৃতি ব্যাপারেও তাঁহারা বিচলিত
হন না। পুত্রের পিতামাতার প্রাণ যখন অর্থলোভে একরূপ কঠোরতা ধারণ করে,
তথ্য তাহাতে অপত্য-স্নেহের খেলা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেক সময় বাড়ীর কর্তাই একরূপ নির্মমতার পরিচয় দেন, গিন্নী কেবল
যৌতুকের জিনিসপত্রের খুঁৎ বাহির করিতে বাস্ত থাকেন, নগদের প্রতি তাঁহার
লক্ষ্য কম। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে গৃহিণীর যৌতুকের লেপ, বালিস, তোষক,
খাট এবং কাঁসার বাটি, ঘটি লইয়াই অনেক সময়ে কোত প্রকাশ করেন, এবং
ঋণবদ্ধ বৈবাহিকের টিকি ধরিয়া যথাসাধ্য নাড়া দেন। যাঁহারা পুঙ্খলাভ করিয়া-
ছেন, তাঁহাদিগকে বিধাতা অনেক সময় কস্তা-রত্নেও বঞ্চিত করেন না,—কস্তা-
বিবাহকালে মাঝে মাঝে তাঁহাদের পূর্ব-ব্যবহারের সুদ শুদ্ধ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়।
রমণী-হৃদয়ের দয়ার কথা আমরা কখনও ভুলিতে পারি না, তাঁহাদের দয়ার এই
পৃথিবী টিকিয়া আছে। আমরা জন্মিয়া যে এত বড় হইতে পারিয়াছি, তাহা
সকলই তাঁহাদের দয়ার ফলে। দয়াময়ীদের নির্দয়তা দেখিলে বড় হৃৎথ হয়,
তাঁহারা বিবাহকালে কস্তার পিতামাতাকে বর ও অভয় দিন, অসি ও নরকপাল
দেখাইবেন না। যদি তাঁহারা ভায়সম্মত ভাবে পারিবারিক শাসন-দণ্ড পরিচালনা
করেন, তবে হুবুঁজ গৃহস্থের মস্তক আপনা হইতেই হেঁট হইবে, বাড়ীর সকলের
অমতে। তিন কখনই একটা নিদারুণ ও নির্মম কর্তব্য করিতে পারিবেন না।

বর-পণ সম্বন্ধে অনেক স্থলেই গৃহিণীর ঘোষ নাই, কিন্তু বিবাহে অতিরিক্ত

ব্যয়-বিধান করার তাঁহার বেশ হাত আছে। অনেক সময় গিন্নীর প্রয়োচনার দরিত্র গৃহস্থ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। হিন্দুর ঘরে বিবাহ নানা কারণে মঙ্গলের ব্যাপার না হইয়া মহা অন্ততের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিবাহ উপলক্ষে ঘরে যেন ডাকাত পড়িল, সর্বস্ব হরণ না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। পূর্বকালে বণিকেরা বিবাহকালে খুব ঘটী করিতেন; তাঁহাদের আরও যথেষ্ট ছিল, এবং বাছ আড়ম্বর করিয়া, বাজী পোড়াইয়া, মিশিল বাহির করিয়া, চৌবুড়ি চালাইয়া, সোনা-রূপার খাট বাহির করিয়া, রাস্তার লোকদিগকে তাক লাগাইতে পারিলেই তাঁহারা সোভাগোর চূড়ান্ত সীমার উঠিয়াছেন, একরূপ মনে করিতেন। বাড়ীর পার্শ্বে অনুক বণিক তাঁহার পুত্র-কন্তার বিবাহে এত খরচ করিয়াছেন, আর আমি তদপেক্ষা বেশী করিতে পারিব না? এইরূপ প্রতিবোধিতা করিয়া এক রাজের ভিতর তাঁহারা টাকা, মোহর কি ভাবে কত উড়াইয়া দিতে পারেন,—খোসামুদের সঙ্গে একত্র পরামর্শ করিয়া তাহারই তালিকা প্রস্তুত করিতেন। প্রাচীন বাদশা অনেক পুস্তকে—বণিকগণের বিবাহের কথা আছে—তাহা সমারোহ-জনক ব্যাপার ছিল। ইহার মধ্যে ভাল কথা এইটুকু যে, বণিকগণ কিছুতেই হিসাবটি একেবারে ভুলিতে পারিতেন না, এবং ব্যয়কে কখনই আরের মাথা ডিঙাইয়া বাইতে দিতেন না।

ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃলোকের ঘরে বিবাহে নির্মল আনন্দ ও আত্মীয়তার অভাব ছিল না; কিন্তু তাহাতে কখনই বেশী খরচ হইত না। আজকাল মেয়েরা, বিবাহ উপলক্ষে, “এটা করিতে হইবে,—ওটা চাই—খোকার বিয়ে, যদি ইংরেজী বাজনা না আসে, যদি মিশিলটা ভাল না হয়, তবে আর কি হইল?” এই সকল বলিয়া পুরুষদিগের কাছে ব্যয়না ধরেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া অনেক সময় দরিত্র গৃহস্থের অন্তরাঝা শুকাইয়া যায়। কিন্তু বাড়ীর প্রভাব বড় শক্ত। বিশেষ বখন মেহময়ী মা চক্ষের জল ফেলিয়া খোকার প্রতি মেহজনিত কর্তব্যের উল্লেখ করেন, তখন পিতা আর কি করিবেন? অনেক সময় তাঁহার ভাষী বৈবাহিক, নিজ ভিটা বন্ধ দিয়া এত কষ্টে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন,

তাহার বাকীর ধূমে উড়িয়া যায় ; ইংরেজী বাজনার উচ্চারণেও বিশিলের চিহ্ন-
 বিচিত্র চাপার মধ্যে মহাসমারোহে সেই দিন দুঃখীর ধনের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন
 হয় । এই সকল ঘটায় দরিদ্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক একবারে উৎসব বাইতে চলিয়া-
 ছেন । গৃহিণীকে আমরা অমরোখ করি, যখন বাড়ীর কর্ত্তাও এই ভাবে খরচ
 করিতে বসিবেন, তখন তিনি যেন হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারণ করেন । শিশুরা
 এই দৃষ্টান্তে বিলাসের পথ চিনিয়া লয় ; সে পথ একরায় চিনিলে—তাহার আর
 রক্ষা নাই । এই মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কত নিকট-আত্মীয় নিজেরা
 না খাইয়া । গুরু-সংগ্রহের অল্প প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছেন । কত অনাথা
 বিধবার একমুখের এক মুষ্টিও জুটিতেছে না । হরত নিজের মামাত বা পিসতুত
 বোন শতছিন্ন সাড়ীখানার তালির উপর তালি দিয়া কোনক্রমে লজ্জা সংবরণ
 করিতেছেন, যিৎবা প্রীহা-বকুৎ লইয়া তাঁহার একমাত্র ছেলেটি ঔষধ ও পথ্যের
 অভাবে মৃত্যুর সম্মুখিত হইতেছে । একবার চক্ষু মিলিয়া বাঙ্গালার মাতাঙ্গণ—
 বাঙ্গালার সম্মানদিকে দেখুন,—অন্ন-কষ্টে কত গৃহস্থ চাকুরীর বৃথা আশার সান্ত্বনা
 সান্ত্বনা গ্রহিয়া বেড়িতেছে, তাহাদের বাড়ীর মেয়েরা কত কষ্ট, কত দুর্ভাবনা
 সহ করিয়া, নিজের উপবাসী থাকিয়া, বালক-বালিকাদের পাতে কিছু দিতে
 পারিতেছেন না ।—এক ভদ্রলোক তিন দিন তাঁহার স্ত্রীর সহিত উপবাসী থাকিয়া
 চতুর্থ দিন শিশুর মধ্যে “বাবা, আজ কি খাইব ?” . শুনিয়া কাহাকেও কিছু
 বলিয়া একখানি চিহ্ন কাহিয়া জলেধরীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া শান্তি পাইতে
 গিয়াছিলেন । আর দের এক আত্মীয় তাঁহাকে কিরাইরা আনিয়াছিলেন । এই
 দৈন্ত-দুঃখ,—দয়ার বশত ক্ষেত্র । আপনারা বত বৃথা উৎসব করিতেছেন,—
 বত বাজে যায় কহিতেছেন,—তাহা দয়ার বশে আঘাত করিতেছে । বদের দয়া-
 স্রী অন্নলক্ষীর অল্প অবিরত বাততেছে । স্ততরাং গৃহিণীর বিবাহের উপলক্ষে
 যদি উন্মত্ত টাকা ব্যয় করিতে পারেন, তবে তাহা দরিদ্র ও নিরন্ন আত্মীয়দের
 অল্প করুন,—বৃথা খরচ লইয়া অসম্মত খরচ করিবেন না । বাঁহারা আপনাদের
 প্রত্যাশী, তাঁহাদিগকে আশা পূরণ করুন । দেখিবেন, যদিও বাহু উৎসবের

শিখা তারার মত আকাশ-পথে উঠিল না,—তথাপি বহু জনের কৃতজ্ঞতা
উৎসব আপনাদের মন্দিরে নীরবে আত্ম-তৃপ্তির অমৃত বর্ষণ করিয়া গেল।

আমি ধনী ব্যক্তিদের কথা বলিতেছি না; ভগবান্ তাঁহাদের অনেকটা
আবদার সহ্য করেন। কিন্তু বতটা বুধা খরচ তাঁহারা করিবেন, সেই
পূর্ব-অজ্ঞিত পুণ্য তাঁহাদের ফুরাইয়া যাইবে। যখন বলিয়া ভা
তাহা হয় ত অনেক বোঝেন না,—কিন্তু কর্ম দ্বারা যাহা
দ্বারাই তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহ-সংক্রান্ত বাজে খরচগুলি যত কমান
যায়,—যথাবিস্ত গৃহস্থের পক্ষে ততই মঙ্গল।

শ্রীলোকদের গহনা পরার ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছাকে রাগে পরিণত
হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। কোন কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রতি-

বৎসরই গহনা গড়া হইতেছে ও বৎসরান্তে তাহা
শ্রীলোকদের গহনা পরা

ভাঙ্গা হইতেছে। বাহা আর খুব কুন্দর বলিয়া গিন্নী
গলার বা হাতে পরিলেন, দুদিন না যেতে যেতে তাহা অক্ষত হইয়া উঠিল,
তখন সে জিনিষটা ছাড়িতে পারিলে বাচেন। এতদ্বারা হু হু বেরূপ বিব্রত
হইয়া পড়েন, তাহা আর কি বলিব! সোনা ভাঙিল সেই সোনার অর্ধেক
পাওয়া যায় না, পা'ন তো আছেই, মজুরীতেও অনেক লোকমান হইয়া থাকে।

অনেক দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েদের এই ক্রমাগত কুচিবিকারে হিত হইয়া পড়েন।

সেকরার পরিবার মত টেক্সসই কয়েকখানি গহনা গায়ে ধরিয়াই দ্রুত। সেকরার

কেটালগু দেখিয়া বা নিমন্ত্রণ খাইতে বাইরা উচ্চদরের দাঁড় পঞ্জিকা বা নির্বাচন

করিবার প্রয়োজন নাই। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, নিজেদের কি অবস্থা;

এবং নিজের গহনা ধারণ হইবে, দেবরপত্নী কিংবা নন্দিত্রী হইয়া ত সেইরূপ

দ্বিতে হইবে, তাহা হইলেই গহনাতে সমস্ত ধর শাশী করিবে,—নতুবা গহনার

ধরের এক কোণ আলো হইবে, আর এক কোণের আঁধার বাড়িবে,—তাহা

তাহা নহে। কুচি-পরিবর্তনের পথে গৃহিনী চলা ভাঙ্গি নহে। তদুপ গৃহস্থ-ঘরে

এই কুচি-বিকার প্রবেশ করিলে যে দুর্গতি পশ্চিত হইবে তাহা সকলেই জানেন

ভরতমিলন ব্যতীত অনিচ্ছা, চিত্রকূট পর্বত হইতে রামকে কিরাইরা আনিবার জন্য ভরত সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “আমার হাতের কেবুল, কঙ্কণ লইয়া যাও,—শ্রীরামের পদসেবাই আমার হাতের আভরণ হইবে।”—মেরেদের এই সেবা-ধর্মই প্রকৃত অলঙ্কার। সেই সেবার তাঁহারা বেক্ষণ হৃদয়ী হন, কোন গহনা তাঁহাদিগকে সেই সৌন্দর্য্য দিতে পারে না।

পুরাতন গহনা ভাদিতে আমার সর্বদাই আপত্তি। আমার মায়ের হাতের কঙ্কণ-জোড়া মৃত্যুর সময় আমাকে দিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন, “তুমি এই কঙ্কণ দিয়া ঘড়ীর চেইন করিয়া লইও।” আমি কখনই তাহা করিতে পারি নাই। সেই কঙ্কণ দেখা মাত্র মায়ের কোমল হৃদয় হস্ত মনে পড়িয়াছে। সেই গহনা-খানি আমার নিকটে পূজার সামগ্রীর মত হইয়া আছে, আমি কোন্ প্রাণে তাহা ভাবিব? দীর্ঘকাল যে গহনা মেরেদের গারে থাকে, তাহা শুধু সোনার মূল্যে বিক্রয় না, তাঁহার সম্মান ও স্বর্ণদিগের কর্তব্য তাহা হীরা হইয়া যায়; পুত্রকন্তারা তাহা পাইয়া খস্ত হয়। ইহা তাহাদের বহুমূল্য উত্তরাধিকার, ইহার মূল্য সোনার ব্যতীত-দর নহে। এখনও বৈকবগণ চৈতন্তের ছেঁড়া কাঁথাখানি দেখিবার জন্য পুরীতে যান,—সেইরূপ একটা ভাব লইয়া আমি মাঝে মাঝে আমার মায়ের কঙ্কণজোড়া বাক্স হইতে খুলিয়া দেখি। উহাতে বারংবারের সঙ্গে কত উগাদেয় খাণ্ড ও প্রসাদের কথা মনে পড়ে। এক পাগল আমাদের বাড়ীর কাছে থাকিত। শান্তিরাম ঘোষের দ্বীটে শশী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতেই অনেক সময় তাহার আড্ডা ছিল। তাহার মাথা অনেক সময় বেশ ঠিক থাকিত। একদিন সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

‘আপনি কেন পাগল হইলেন?’ সে বলিল, ‘সে বড়
এক পাগলের কথা

হুংখের কথা, মহাশয়, আমার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী, কেহ ছিল না, আমি খণ্ডর-বাড়ী থাকিতাম,—৪০ মাহিনার পোষ্ট আফিসে চাকরী করিতাম। বহুকষ্টে ১৫০ টাকা সংগ্রহ করিয়া আমার জীকে একজোড়া পোনার বালা পড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি সারাদিন আফিসে থাকিতাম, কি

আমার মন পড়িয়া থাকিত আমার জীব সোনার বালা-পরা ছুখানি হাতের উপর; কতকণে বাইরা তাহা দেখিব। আমি রোজ রোজই সেই আনন্দে বিতোর থাকিতাম। একদিন বাইরা দেখিলাম, আমার স্বপ্নের সেই বালা-জোড়া বন্ধক দিয়াছেন;—তখন বুদ্ধি-লোপ হইল, স্বপ্নকে কাটিতে গেলাম, তাঁহাকে বাচাইতে বাহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও কাটিতে গেলাম, তারপরে কি হইয়াছিল মনে নাই—তদবধি এই ভাবে আছি।’ প্রিয়জনের ব্যবহৃত অলঙ্কার এতই আদরের। সে গুলি ক্রমাগত ভাগিয়া নূতন করিয়া গড়িলে—প্রীতি-চিহ্নগুলি সত্য সত্যই দুর্দশা প্রাপ্ত হয়।

অনেক গৃহস্থের অবস্থা ভাল, কিন্তু বাড়ীর মেরেদের কোন গহনা দেন না। অর্থ-সঞ্চয় যেখানে রোগ হইয়া দাঁড়ায়, আমরা সেখানে উঁহার পক্ষপাতী নহি। বাহারা ঘরে সেবাস্বত ধারণ করিয়া সকলের জন্ত দিনরাত খাটিতেছেন, স্ত্রাসঙ্গত ভাবে তাঁহাদের বতটা মনোরঞ্জন করিতে পারা যায়, তাহা করা উচিত,—তাহা হইলেই গৃহ-দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন। বড় মানুষের বাড়ীতে যদি কোন জ্বীলোক

সোনার গহনাকে খালাসটি বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া
গহনা না দেওয়া কেবল হীরা-জহরতের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া

থাকেন, সাধারণ গৃহস্থের ঘরে সেরূপ নজির কখনই উপস্থিত করা উচিত নহে। তাই বলিয়া স্নান পদ্মকলির মত হাত ছুইখানি খালি ও সুন্দর গলার একটি ছোট
দেখান নাই, এ দৃষ্ট দেখিলে সকলেরই কষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন গৃহিণী শোকভঃখ পাইয়া অবশিষ্ট ছএকটি পুত্রকল্পার প্রতি এত অধিক স্নেহাতুরা হন যে, পরিণামে সেই স্নেহই তাঁহাদের সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। একজনের কথা জানি, তিনি এই ভাবে ছোট ছেলেটির প্রতি এত অধিক মমতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সে আদরে একবারে মাটি হইয়া

গেল। সে শুক্রতর অপরাধ করিলেও কখনও তিনি
শোকভঃখ মাতার তাহাকে ভৎসনা করিতেন না,—যখন সে টাকা
দেহের বাড়াবাড়ি চাহিত, নিজের গহনা বন্ধক দিয়া তাহাকে তাহা

দিতেন ;—সে টাকা বে, সে নরককুণ্ডে ছুঁড়িয়া কেলিতেছে, তাহা জানিয়াও তিনি টাকা দিতে বিরত হইতেন না। একদিন আমার সম্মুখে সেই যুবক মাতার নিকট ২৬টি টাকা চাহিল—শার্ট কিনিতে। তাহার মাতা বলিলেন, ‘বাপু, এত টাকার শার্ট কিনিবার দরকার কি, এই পাঁচটা টাকা নে।’ যুবক তখন নিজের চাদর জড়াইয়া নিজের গলায় বাঁধিল এবং তাহা পাকাইতে পাকাইতে বলিল, ‘এই দেখ, আশ্রয়হত্যা করিতেছি।’ মাতা তখনও বলিলেন, ‘১০ টাকা দিতেছি।’ যুবক গলে চাদর আরও পাকাইয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিল, ‘২৬ টাকার এক পরমা কম নহে।’ বলা বাহুল্য ২৬ টাকা তখনই হাজির হইল,—পুত্র চাদরের মোড়া খসাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

এইরূপ স্নেহ-শুণে যখন পুত্রের লিভার পাকিয়া সে মরণাপন্ন হয়, তখন স্নেহাতুরা কি করিয়া থাকেন? এই স্নেহের ফলে যখন পুত্র চুরি করিয়া জেল খাটে, তখন মাতা কি করেন? এই স্নেহের শুণে যখন পড়াশুনা ছাড়িয়া পুত্র বোম্বেষ্টে হইয়া অলিগলির নর্দমায় পড়িয়া ছুঁচোর পদাঘাত খান, তখন জননী কি করেন? ছেলেকে অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে এই স্নেহ উপায় নহে, ইহাই তাহার অকাল-মৃত্যুর পথ।

মূল কথা, ভগবান্কে যখন মানুষ একেবারে ভুলিয়া যায়—তখনই বিপদ সামলাইতে বাইরা বিপদকে স্বয়ং মাথায় করিয়া আনে; তখন চিত্ত এরূপ দুর্বল হইয়া পড়ে যে, সে তৃণ ধরিয়া সমুদ্র পার হইতে চাহে এবং একটা স্তু করিয়া মনে ভাবে, এইবার হাতীটা বাঁধিয়া ফেলিব। যে থাকে যে বা’ক—তাঁহার বাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমার বতটা সাধা, আমার বতটা উচিত, তাহাই করিব। মাথা খুঁড়িয়া সংসারটা নিজের ঠিক ইচ্ছার মত ত্যাগাভ্যাগি যিনি গড়িতে চাহিবেন, সংসার তাঁহার নিকট ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে।

দরকার হইলে যেকোন নিজের অঙ্গ কাটিয়া কেলিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়, সেই-রূপ প্রয়োজন হইলে ভাই, এমন কি, নিজের ছেলেকেও বাহ দিয়া সংসার চালাই-

বার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। এমন দুই এক হতভাগ্য সংসারে দেখা যায়, যেখানে মস্তপান ও চরিত্রহীনতার দরুণ সংসারটি প্লেগাক্রান্ত ঘরের মত চইয়া আছে। ভ্রাতাদের অধিকাংশ যদি মস্তপায়ী হন, এবং প্রকান্তভাবে দুর্নীতি বা

চরিত্র-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহা-
হুসংসর্গ ত্যাগ

দের সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, তবে সেইরূপ সংসর্গে আপনার অন্ন-বয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা ভ্রাতাদের প্রতি একটা কর্তব্য আছে, নিজের ছোট ছেলেদের প্রতিও কর্তব্য আছে। প্রাপ্তবয়স্ক অসচ্চরিত্র স্বর্ণের কুদৃষ্টান্তে ও কুব্যবহারের কলে ছেলেদিগকে অশস্ত্র ভাষা ও অশস্ত্র ব্যবহার শিখিবার সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। আশুপ লাগিলে বেক্রপ মানুষ বাস-গৃহখানি ছাড়িয়াও নিজের প্রশ্ন বিচাঠিয়া থাকে, সেইরূপ নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত হইলে, একান্ত স্বপ্ন ব্যক্তি হইতেও দূরে থাকা উচিত। তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা ও তাহাতে সাহায্য, এই সকলই একটু দূর হইতে করিতে হইবে। টাকা হয় নাই, এমন ব্যক্তিকে বেক্রপ বসন্তের রোগীর সেবা হইতে দূরে রাখিতে হয়—অন্নবয়স্ক বালক-বালিকা-দিগকেও তরুণ বাড়ীতে সেইরূপ কুদৃষ্টান্ত হইতে দূরে রাখা সঙ্গত।

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহ জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। কারণ, বিবাহে শুধু স্বামী ও স্ত্রী স্থায়ী বা অস্থায়ী হন, এমনত নহে,—তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহার সেই সুখ-দুঃখের ভাগ পাইয়া থাকেন। বিবাহের পর কোন গৃহ আন-

বিবাহের ব্যাপক বল

ন্দের ছবির মত হইয়া দাঁড়ায়, কোথাও বা সমস্ত মেহ-বার্হান্ চিতানল জ্বলিয়া গৃহখানি স্বার্থের একটা নরক হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহের পর ছেলে ও মেয়ে হয়, তাহাদের চরিত্র, ভাবী জীবন ও ব্যবহার অনেক পরি-

মাণে পিতা মাতার উপর নির্ভর করে। সাত পুরুষ পূর্বে, বংশের কোন ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যে শুভাশুভের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, এ পর্যন্তও সেই বংশ সেই কলভোগের হাত এড়ায় নাই। আজ বিবাহের সময় আঙ্গিনার বে শাঁক বাজিয়া উঠিল, তাহার স্বনি-প্রতিধ্বনি কত যুগ চলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ঘটনার স্রোত যে কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিল, সেই ব্যাপারকে শুধু কোড়ক ও রত্নরসের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে; ইহা অতি গুরুতর ঘটনা। স্বামী জ্বর রূপ ধ্যান করিতেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর মুখখানি কেমন তাহাই ভাবিতেছেন, এই রূপ-লালসা অনেক আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম মনে করেন। কিন্তু যিনি জীবনের সঙ্গিনী, তাহার বাহিরের রূপের কথা ২৪ বৎসরের মধ্যে স্বামীর মন হইতে চলিয়া বাইবে, তাহার চরিত্রের যে রূপ, তাহাই তখন ভাবনার বিষয় হইবে। চাঁদ যে এত সুললিত, আমরা কি নিতাই মাথা উচু করিয়া চাঁদের শোভা দর্শন করিয়া থাকি? প্রতিনিয়ত বাচা দেখি, তাহার বাহিরের রূপের কথা আর মনে থাকে না, তাহা একান্ত সহজ হইয়া যায়। কত রূপের ভিতর কুরূপের কথা আমরা জানি। কিন্তু আমরা বলিতে চাই না যে, রূপের কোন আদর নাই।

রূপ ও গুণ

জগৎ বাহার আদর করিতেছে, আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিব কিরূপে? কিন্তু সংসারের গুণেরই আদর বেশী হওয়া উচিত। গুণবান্ ও গুণবতীর মিলন গুণহীন রূপবান্ ও রূপবতীর মিলন হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জী সঘন্থে স্বামীর অনেক আশা-ভরসা থাকে এবং স্বামী সঘন্থে জীর আদর্শও খুব বড় রকমের থাকা আশ্চর্য্য নহে। যেখানে দুই পক্ষেরই এইরূপ বাড়াকাড়ি রকমের ধারণা থাকে, সেখানে উত্তরের মন ভাঙ্গিয়া বাইতে পারে। দাম্পত্য-প্রেম কন্মার ভিত্তির উপর দাঁড়-করাইতেই হইবে; কেবল তাজমহলের স্বপ্ন দেখিলে

বংশের দেশ ও বাসব-

রাজ্য

নিজের কুঁড়ে-ঘরের উপর অপ্রকার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা জানা উচিত যে, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়া সংসার করা মোটেই চলে না।

আমাদের কুঁড়ে-ঘর যদি সামান্য হয়, তবুও সেইখানেই আমাদের বাস করিতে হইবে; বাশ ও বেতের বেড়া না ভাঙ্গে, তাহাই দেখিতে হইবে, ততক্ষণ বাহারা সোনার খামের কল্পনা করিয়া দীর্ঘ নিখাস ভাগ করেন—তাহারা মোটেই সুখী হইতে পারিবেন না।

ভাগ্যদেবী বাহাকে ঘরে আনিয়াছেন, তিনি আমার সুখের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ঘরে আসিলেন—ইহা মনে যেন না হয়। জী পুরুষ যদি উত্তরে সংযত হন,

এবং পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করিতে
সংস্বয়ের পথ পাবেন, তবে তাঁহাদের প্রেম বেরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর

দাঁড়াইবে, বাহারা শুধু আকাশ-কুম্বের শোভা দেখিতে চাহিবেন, তাঁহাদের প্রেম সেখানে দাঁড়াইবে না। স্বামীর ব্যবহারের অসংস্বয়ের পথে জীকে পদে পদে বাধা দিতে হইবে। বাহারা তাহা না করিয়া স্বামীকে নিজেরাই সর্ববিষয়ে অন্ত্র পথের দিকে লইয়া যাইয়া তাঁহার প্রেরণী হইতে চেষ্টা করিবেন, শেষকালে তাঁহাদের উপর স্বামীর কোন শ্রদ্ধাই থাকিবে না, এবং যে সকল বিষয়ে জীর স্বামীকে বাধা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই, অনেক সময় দেখিবেন, সেই সকল বিষয়েই গার্হস্থ্য-সুখের পরম বিষয় দাঁড়াইয়াছে। স্বামী যদি ছোট ভাই-টিতে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন ও দুর্জীবহার দ্বারা সর্বদা পিতামাতারই মনে বাধা দেন, তবে জী স্বামীর সাময়িক ক্রোধ সহ্য করিয়াও বাধা দিবেন, তাহার ফলে স্বামী জীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবেন। জী স্বীর প্রেম দ্বারা স্বামীর বাক্য ও ব্যবহারের অসংস্বয়ে বাধা দিবেন, তবেই সংসারে তাঁহার সম্মান অটুট থাকিবে।

স্বামীই জীর সর্বপ্রধান অবলম্বন। স্বামীর কথা, জী বেদ-কোরাণের মত মানিয়া চলিবেন, এইরূপ কতকগুলি চাপকা-নীতি আমি প্রচার করিতেছি না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে যখন স্বামীর উপরই জীর সুখ-দুঃখ সর্ববিষয়েই নির্ভর করে, তখন জিনি ঠাকুর দেবতার স্থানীয় হইয়া আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন্ত ঠাকুরের ব্যবহার ধারাপ হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই জীর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে পারে।

প্রকৃত ভালবাসা কোন একটা বড় পদে বসিলেই দৌরাণ্য করিয়া আদর করা যায় না। রাজতন্ত্রে যিনি বসিয়াছেন, তিনি জোর করিয়া প্রজার সর্ব্ব্ব লইতে পারেন, কিন্তু একটা জারগার উপর তাঁহার কোনই অধিকার থাকে না, তাহা প্রজার হৃদয়; সে জিনিষটা সকল সময়ে সমস্ত ক্ষতি ও ফলাফল অগ্রাহ্য করিয়াও আত্মদান করিতে অস্বীকার করে।

সুতরাং যে স্থানটি লাভ করিলেন, তাহা খুব উঁচু, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি উঁচু স্থানে বসিয়া যেন নীচ কাজ না করেন, ইহা দেখিতে হইবে; নতুবা পদোচ্চি মর্য্যাদা তিনি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না। জী তাঁহাকে অবশ্য সংসারের সকলের অপেক্ষা বড় মনে করিবেন। বড় বই কি? যিনি বিরূপ হইলে লোক-চক্ষে সত্য-সত্যই তিনি হতভাগিনী হন,—যাঁহার অভাব হইলে, সংসারে তাঁহার থাকা না থাকা সমান, তাঁহার চাইতে বড় আবার কে? বিবাহের কলে তাঁহাকে পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সমগ্রভাবে কিরূপে পাইবেন, ইহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত!

বিবাহের প্রথম করেক বৎসর এক ভাবে কাটিয়া যায়, কিন্তু মধুমাसे বড় শান্তির মলয় বহিতেছে দেখিয়া নাবিকের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। হঠাৎ ঝাপটা বাতাস আসিয়া তরী ডুবাইয়া দিতে পারে। প্রথম হইতে সর্ব্ববিধের সংযত থাকিলে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।

পুরুষ প্রবল, সুতরাং অনেক সময়ে স্বামী অত্যাচার করিতে পারেন; জী স্বাধীন নহেন,—সেই অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য তিনি মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতে পারেন; এই দুই-ই স্বাভাবিক। স্বামীর অত্যাচার ভাল নহে, জীর মিথ্যাচরণও তদ্রূপ। স্বামীর মন বুঝিয়া তাহার অমূল্য পথে জী চলিতে চেষ্টা করিবেন; যদি কখনও ভুল হয়, তবে স্বামীর নিকটে তাহা গোপন করিবেন না;—সত্যবাদিনী জীর উপর স্বামীর শ্রদ্ধা হইবে। একবার যদি স্বামী বুঝিতে

অত্যাচার ও
মিথ্যাচার

পারেন, তাঁহার জী সত্য কথা বলেন না, তবে সংসারে যে আশ্রয়-তরু বিশ্বাস, তাহার সূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। উত্তেজনার সময় স্বামী যদি জিজ্ঞাসা না করেন, তবে কোন অপ্রিয় সত্য তাঁহার নিকট কণকালের জন্য গোপন রাখা যন্দ নহে, কিন্তু সেই কথা দীর্ঘকাল তাঁহার নিকট গোপন রাখিবেন না। স্বামী যদি একবার বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন এবং বুঝিতে পারেন যে, জীবী কথার আস্থা দেওয়া যায় না, তবে স্বাভাবিক প্রেমে ব্যাঘাত পড়িবে। যিনি ক্ষমাশীল, তিনি জীবী প্রতি কুব্যবহার করিবেন না; কিন্তু মনে মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইবেন, এবং বাহিরের সৌজন্য দেখাইয়াও তাঁহার প্রতি প্রাণের অনুরাগ রক্ষা করিতে পারিবেন না। আর যদি স্বামী উগ্র হন, তবে এইরূপ মিথ্যাচরণের ফলে জীবী প্রতি ভৌতিক অত্যাচারের আশঙ্ক হইবে, কিংবা এইরূপ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ ও বীতরাগ হইয়া স্বামী নৈতিক অধোগতির পথে ধাবিত হইবেন। রমণীর প্রেমরূপ পবিত্রতার মিথ্যাচরণের কলুষ মিশ্রিত করিলে, এই সকল কুফল জন্মে।

জীলোকের একটা প্রধান কর্তব্য বাক্য-সংবৎ। স্বামী যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কথা বলেন, তবে স্বামীর উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া জীবী নিরন্ত হওয়া উচিত। কেহ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহাকে বুঝা-
বাক্য-সংবৎ
ইতে যাওয়া নিফল। যখন ঝড় বহিতে থাকে, তখন

বাধা দিলে উহা আরও ভয়ানক হয়। স্তবরাং শুধু স্বামি-জী বলিয়া নহে,—কেহ কাহারও প্রতি যখন ক্রুদ্ধ হন—সেই সময় অপর পক্ষের বৈধী অবলম্বন প্রের্য:। কথার উত্তরে কথা বলিলে তাহা অনেক সময় বড় ভীষণ ভাব ধারণ করে; এই ভাবে কোন কোন পরিবারে ণুনোপুনি মারামারির সৃষ্টি হইয়া থাকে। কোনও জায়গায় দেখিয়াছি যে, যখন স্নবুদ্ধি স্বামী বুঝিলেন, কোনও সময় রাগ করিয়া একটা কথা বলিলেও জী সহিবেন না—তখন তিনি একেবারে নীরব হইয়া পড়েন—এই ব্যাপারে যে অনুরাগের সূত্র ছিঁড়িয়া যায়, তাহা অনেক স্থলে আর জোড়া লাগে না। কবি লিখিয়াছেন, “ইকুর ফল হইলে তাহা কা জানি কত যথুর হইত।” জীলোকের যদি বাক্য-সংবৎ থাকিত, তবে অনেক

সংসারের পক্ষে তাহা হইতে শতগুণ মিষ্ট হইত, সন্দেহ নাই। অনেক জানহীনা যুধরা রমণীর হাতে শেখ-বরসে স্বামীরা জব্ব হন; কারণ, ত্রীলোক শীলতা ত্যাগ করিয়া স্মর উঁচুতে উঠাইলে তাহা যতদূর উঠে, পুরুষ ততটা উঠাইতে সাহসী হন না, কারণ, তাহা হইলে প্যাড়ায় একটা দম্ভরমত হট্টগোল উপস্থিত হয়; ভয়ে পুরুষবর নিরস্ত হইয়া পড়েন।

বাঁকা-সংঘের ফলে অনেক ত্রীলোক প্রতিকূল অবস্থায়ও গৃহস্থালীটি বেশ চালাইয়া বাইতে পারেন, অন্তথা তাহা অচল হইত। স্বামী যদি সহসা উত্তেজিত হইয়া ক্রুদ্ধমূর্তি ধারণ করেন, তখন স্ত্রী তাঁহার ভিষ্মার বলগাকে খুব টানিয়া না ধরিলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। আমার এক বন্ধু অতিশয় সংযতাব, দমার্জ-ক্ৰম চরিত্রবান্ এবং পুয়ের হুঃখ দেখিলে তাহা আপনার হুঃখ বলিয়া মনে করেন। তিনি জৈশ্বরভক্ত এবং সর্ক-বিষয়ে অনেকটা সাধুর স্তায়; কিন্তু নিজ-বাড়ীতে তাঁহার মেজাজ মাঝে মাঝে হঠাৎ চটয়া যায়, তখন সেই সহজ লোকটি যেন ভূত হইয়া যয়ে চোকেন। স্নান করিবার ঠিক পরেই যদি তিনি ভাত না পান, তবে রক্ষা নাই; একটা লোহার গরাদ লইয়া খান্ খান্ করিয়া ভাতের হাঁড়িগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। প্রায়ই এরূপ হয় দেখিয়া গৃহিণী শিতলের ডেগ ও হাঁড়ীর ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সেগুলির কতক কতক এখনও টিকিয়া আছে সত্য, কিন্তু একেবারে ভুড়-ভুড় বেহাল হইয়া আছে। কয়েক দিন এই ভক্ত-লোকটি দেখিলেন যে, বাড়ীতে ভাত ব্যঞ্জন কিছু কিছু নষ্ট হইতেছে; সেগুলি পাতে বেশী পড়াতে কি খাঁট দিয়া, বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিতেছে; কতক পরিমাণ রুখ বাটিতে পচিয়া আছে, গৃহিণী তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ছ একদিন সতর্ক করিয়া দেওয়াতে, যখন তাঁহার কথার কেহ কর্ণপাত করিলেন না, তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধদেব তাঁহার স্বল্পে চাপিয়া সংহারমূর্তি ধরিলেন। তিনি বাড়ীর মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, “এস তামাসগির সব, ভাল ভাল তামাসা দেখাইব।” তখন কম্বিন্টমের বাড়ীর ভাল সোনার বড়িটি পাথরের উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিলেন, তামা মোহিন-ক্ৰ-টটি দোতলা হইতে টান মারিয়া নীচে রকের উপর এমন কোরে

কেলিয়া দিলেন, সে বেচারী একটা বেসুরে তান ধরিত। তাহার শেষ বাজনা বাজাইয়া লীলা সাক্ষ করিল। বজ্রবর হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “আমি কি আর জিনিষ নষ্ট করিতে জানি না ? কেবল কি তোমরাই জান ? আমি এক ষষ্ঠীর বাহা নষ্ট করিব, তোমরা এক বৎসরে তাহা কর দেখি ?”

এমন সকল ভৌতিক কাণ্ড সম্বন্ধ করিয়াও মাঝে মাঝে গৃহীকে জিজ্ঞাসা সংবত করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা এক পক্ষের কছুরত দেখিয়া যদি অপর পক্ষ তাহা হই-
তেও বড় খেলোয়াড় হইতে চাহেন, তবে সংসারটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে ?

মোটামুটি ক্ষমাগুণের উপরই সংসারের প্রীতি ও সদ্ভাব স্থায়ী হইয়া থাকে।
ত্রীলোক স্বামীর ব্যবহার লইয়া দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইবেন না। বাহা দোষ
বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা যুদ্ধ-দৃষ্টিতে কেবলই খুঁজি-
বেন না, কারণ যত দোষ খুঁজিবেন, ততই পাইবেন।

দোষ-সন্ধান

বেদেরা যেখান সেখান হইতে সাপ বাহির করিতে পারে। সেই দোষগুলি বাহির
করিয়াও তাহা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া কি লাভ ? তাহার দংশনজালায় নিজে-
রাই পুড়িয়া মরিবেন। যে সকল দোষ—বধা স্বামীর উপেক্ষা বা ভালবাসার
ক্রটি—তুখু ত্রীরই কষ্টের কারণ ; সে সকল দোষ তিনি উপেক্ষা করিবেন,
তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না। তাহা লইয়া কলহের সৃষ্টি করিলে সে দোষগুলি
বাড়িয়া চলিবে। বাহা উপেক্ষা ছিল, তাহা স্তূপার পরিণত হইবে। ভালবাসার
অধিষ্ঠাত্রী দেবী একেবারেই বহুত। ভালবাসেন না, কেহ কহিয়া বলিয়া
কাহাকেও প্রেম শিখাইতে পারেন নাই। স্বামীর প্রতি কর্তব্য তিনি নীরবে
করিয়া যাইবেন ; কেহ ইচ্ছা করিলে হাতে স্বর্ণ পাইতে পারেন না। স্বামী যদি
সে রূপ আদর না করেন, তবে ভগবানের আদরের জন্ত লালারিত হইবেন। তিনি
প্রসন্ন হইলে হয় ত স্বামী স্বীয় দোষ নিজেই বুঝিবেন।

অনেক জী সন্ধিৎসু-চিত্ত। স্বামীর ভালবাসা যদি মনের মত না পান, তবেই
সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্দেহ ভাল নহে ; কারণ, বাহাকে সন্দেহ
করিবেন, তাহাকে কিছুতেই শোধরাইতে পারিবেন না। সন্দেহ অন্ধ ; তাহার

চক্ষু নাই, স্তন্যরাশি আঁধারে রক্তকে সর্পভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে অনেক সময় বাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে; সেই সকল অভিযোগ

উপস্থিত করিলে স্বামী নিতান্তই ক্রুদ্ধ হইয়া বাই-
সন্দিগ্ধা ব্রী

হইলে তাঁহার অমৃতপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সন্দেহের বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে সে সম্ভাবনা থাকিবে না। স্বামী কোন্ সময়ে কি করেন, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ লইয়া কল্পনার অব্যবহাৰ বলগা ছাড়িয়া দিলে শেষে বাস্তবরাজ্যের প্রেত-পুরীতে উপস্থিত হইবে। কুলের শস্যার শুইয়া মনে হইবে, যেন কাঁটা পাতা আছে। নিজের সুখ অতিরিক্ত পরিমাণে খুঁজিতে গেলেই সন্দেহের উদ্ভেক হয়। মনে হয়, হয়, বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে পাইলাম না। তাহা না করিয়া যদি এটা মনে করা যায়, আমি সংসারে দিতে আসিয়াছি—কিছু নিতে আসি নাই; আমি ভোগ করিব না, ত্যাগ করিব; আমি ভালবাসা চাহিব না, দিব; তখন বুদ্ধিবেশে যে, সন্দেহের নরদমার জল হইতে উঠিয়া গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছেন কি না। সংসারে বাস্তব চতুর্থের অভাব নাই, শত শত বুদ্ধিক পথের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহারা দংশন করিতেও ছাড়ে না;—এই অবস্থায় কল্পনার সর্প প্রস্তুত করিয়া তাহার দংশনে অর্জয়িত হওয়া কি ভাল? সন্দেহের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ কল্পনা করিয়া লোকে তাহা হইতে এমন একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে দাঁড় করায় যে, কিছুতেই মনে হয় না যে, সন্দেহ ভুল। এইরূপ ধারণার ফলে লোককে কঁাসি-কাঠে ঝুলাইয়া দিয়া বিচারক শেষে দেখিয়াছেন যে, তাঁহার ধারণাগুলি ভুল ছিল, তখন অমৃতপ্ত চক্ষের অশ্রু মুছিয়াছেন। এমন অসার ভিত্তির উপর অশান্তির মঠ স্থাপন করিবেন না।

যদি সত্যই সন্দেহের কারণ থাকে, তবে তাহা দাম্পত্য-জীবনে উপেক্ষা করিয়া যাওয়াই উচিত; কারণ, সন্দেহতরু হইতে কখনও প্রেম উৎপন্ন হয় নাই, কদা কল্পতরু হইতে তাহা পাওয়া বাইতে পারে! কিন্তু সন্দেহের দ্বারা যে অপরাধ প্রকৃতপক্ষে ছিল না, তাহারও সময়ে সময়ে উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে।

স্বামী যেরূপ ভালবাসেন, স্ত্রীকে বধাসক্তব সেইরূপ চলিতে হইবে ; তাহা যদি ঠিক সম্ভব না হয়, তথাপি স্ত্রী যদি তাহাতে বিরক্তির সহিত বাধা দেন, তবে

অনেক সময় তাহা হইতে আশ্রয় জালিয়া সংসারটি
রূপণ বানী

পুড়িয়া ছারখার করিবে। কোন কোন স্বামী অত্যন্ত রূপণ, তিনি সকল সহ করিতে পারেন, কেবল ব্যয়বিক্রমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন। যাহা নিতান্ত দরকারী, তাহা হইতে তিনি সংসারকে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। অবস্থা খারাপ হইলে অবশ্য বাধা হইয়া লোককে নানা কষ্ট ও অসুবিধা সহিয়া থাকিতে হয় ; কিন্তু যদি অবস্থা স্বচ্ছল হয়, তবে কার্পণ্যহেতু বাড়ীর সকলেই মিথ্যামিথ্যা কষ্ট পাইয়া থাকেন। আমি একজনকে জানি, তিনি খরচের টাকা চাহিলে অতি হুম্ব হিসাব করিতে বসিতেন। বাড়ীর ভিত্তর হইতে দরকারী জিনিষের যে ফর্দ আসিল, তাহাতে একদিন এক পরসার হলুদের উল্লেখ ছিল। গৃহস্থটির হিসাব সম্বন্ধে অসাধারণ মেধা ছিল। তিনি বলিলেন, “র’স—বুধবার দিন এক পরসার হলুদ আনা গিয়াছে ; বৃহস্পতি, শুক্র, আজ শনিবার। আরও একদিন সেই হলুদে যাওয়া উচিত ছিল।” এইভাবে প্রত্যেকটা বিষয় লইয়া খেচাখেচি এরূপ হইত যে, শেষে বাঁহারা যুদ্ধস্বরে কথা কহিতে অভ্যস্ত, তাঁহাদের স্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিত ও সে দিন রাগরাগির ফলে রান্নাবান্না বন্ধ থাকিত এবং ছেলেরা না খাইয়া পুলে বাইত। হিসাবের দিকে একটা চোখ রাখা উচিত, কিন্তু দিনরাত্রি যিনি হিসাব লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন, তিনি বক্ষ্য প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার রাত্রে ঘুম হইবে না ও অগ্নিমান্ব্যের সৃষ্টি হইবে।

কোন কোন রূপণ গৃহস্থ বলেন—“বাহা উচিত, তাহাই ব্যয় করিব, তদন্ত-বিক্রম এক কপর্দকও নহে !” পূজার সময় ছেলেদের কাপড় দিবেন না, তাহাদের যে কাপড় আছে, তাহার সমস্তগুলি ছিঁড়িয়া ব্যয় নাই। দীপাবিতার দিন সকলে ছাতে আলো দেয়, তাঁহার বাড়ীটি দারুণানে একেবারে আঁধার থাকিয়া ‘হংস মধ্যে বক’ হইয়া থাকে। বাড়ীতে কোনও রূপ উৎসব হইবার উপায় নাই। ছোট ছোট মেয়েদের হাতে কোন গহনা নাই, মিলের সাদী জাফা

তাহারা কিছু পরিতে পার না ; এ সম্বন্ধে গৃহস্থ বলেন, “বিয়ের সময়ই ত কাপড়-চোপড় গহনা পাইবে, এখন আবার কি ?” হয় ত অন্ন-বরগে মেয়েটি যারা গেল, তখন অপর বাড়ীর ছোট মেয়েরা গহনা ও ভাল সাড়ী পরিয়া আসিলে, সেই মেয়েটি যে মুখ ছোট করিয়া থাকিত, তাহা মনে পড়িয়া মাতার চক্ষের জল দিনরাত পড়িতে লাগিল। বাহা কিছু লোকে সধু করিয়া পরে বা খায়, গৃহস্থ তাহার সকলগুলি হইতে বাড়ীটা রক্ষা করিয়া উহাকে সর্বভ্যাগী বোণীর মত দাঁড়-করাইয়া রাখেন। কিন্তু প্রকৃতি শুধু ক্ষেত্রের শস্য দিয়া পালন করেন না, —তিনি চক্ষুর আনন্দের জন্য শত শত ফুল ও তৃণপল্লব সাজাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীর প্রতি কোণে-বাহুল্য আছে ; এই বাহুল্যের আনন্দ মানুষের মন সরল করিয়া রাখে। শুধু বাহা চাই, তাহা পাইয়া কুখার সময় অন্ন-জল ও শুইবার সময় বিছানা পাইয়া জীবনটি খাড়া থাকে মাত্র,—কিন্তু মানুষ আনন্দ চায়, নূতন কিছু চায়, এই অতিরিক্ত জিনিষগুলি পাইবার চেষ্টারই সে শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করে না। সমস্ত অতিরিক্ত জিনিষ ঠেকাইয়া রাখিলে সে গৃহের উত্তানে ফুলও ফুটিবে না, তাহার কুঞ্জে কোকিলও ডাকিবে না ! বাগকের হাতে খেলানো না দিলে, গিল্লীর হাতে মাঝে মাঝে ভাল খাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ না দিলে, ফুলের লাইব্রেরীতে ছেলেকে বাজে বই পড়িবার টাধা না দিলে, বাড়ীতে দু একটা সুগন্ধি তৈলের শিশি ও সাবানের বাক্স না থাকিলে,—সে গৃহ কখনই পূর্ণতা পাইতে পারে না। এখন কথা এই যে, স্বামী যদি কুপণ হন, তবে জীব কি করা কর্তব্য ? পূর্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী বিরক্ত বা ফুঁদ হইয়া স্বামীকে বাধা দিলে সংসারে নিত্য নিত্যই কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। চণ্ডীর নিকট ভক্তের প্রার্থনা এই—“ভাৰ্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্তাহ্বসারিণীম্”—এখানে স্বামীর জীব জন্ত কামনা নাই—তিনি যেন আমার মনে শ্রীতি জাগাইতে পারেন, আমার মনের ভাব বেক্রপ, তাহার প্রবৃত্তি যেন তমসুকুল হয়, এই প্রার্থনা। সুতরাং কুপণ স্বামীর জীকে কার্পণ্যে দীক্ষিত হইতে হইবে—সংসারের সুখ ও শান্তি বাহাতে থাকে,—ভজ্ঞতা তাহাকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে,

স্বামীর প্রতিকূল আচরণ করিয়া তিনি তাহা কখনও করিতে পারিবেন না। স্বামী যদি বোঝেন, স্ত্রী তাঁহার অধুকূল, তখন প্রীতি জন্মিবে। এই প্রীতির বলে ধীরে ধীরে স্ত্রী স্বামীর কার্পণ্য সংশোধন করিতে পারিবেন। যে পর্য্যন্ত স্বামীর স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা না জন্মিয়াছে, সে পর্য্যন্ত উপদেশ বা বাধার ফলোদয় হইবে না। স্বামীর হৃদয়ে ঢুকিয়া তাঁহাকে ভাল করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার হৃদয়ের বাহিরে থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার শত শত ক্লারসঙ্গত কথাতেও তিনি কর্ণপাত করিবেন না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর অধুকূল হইলে—তিনি সর্ব্বস্বল্পপিণী হইবেন অসাধ্যসাধন হইবে, ক্রপণ দাতা হইয়া বসিবে, তাহার বলিয়ার হুতা অনারাসে খুলিয়া পড়িবে।

স্বামী যদি চরিত্রবিহীন হন, ইহা স্ত্রীর পক্ষে সাংঘাতিক, সেই পরিবারের পক্ষে সাংঘাতিক; কিন্তু বিপদ পড়িলে অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইতে হইবে। যাহারা দিবারাজি এজন্ত বিরক্ত বা ক্রোধ প্রকাশ করিবেন

—তাহার ফলে স্বামী কখনই শোধরাইবেন না।

চরিত্রহীন স্বামী

কেহ বা স্বামীকে জঙ্ক করিবার জন্ত পরের নিকট

নিষ্পা প্রচার করেন। স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে বাহিরের লোক তামাসগির ভিন্ন কিছু নহেন। স্ত্রী স্বামীর নিষ্পা গাইরা এবং পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া স্বামীর প্রেমলাভ করিতে পারিবেন না, বরং তিনি তাঁহার মন হইতে ক্রমেই দূরে বাইরা পড়িবেন। কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রীত করিবার জন্ত অতিরিক্ত চেষ্টার নিম্নে অসংবত হইয়া পড়েন। অসংবতের নিকট অসংবদ—উহা আগুনে দ্বুতাহতি মাত্র; উহাতে স্বামীর চরিত্রের দোষগুলি আরও বাড়াইয়া তুলিবে। স্ত্রীর এ অবস্থায় তপস্বিনীর মত হইরা থাকা উচিত। আহায়ে ব্যবহারে সংবত হইরা স্বামীকে মেহের সহিত উপদেশ দেওয়া এবং অন্ত ব্যক্তি তাঁহার নিষ্পা করিলে বখালাধা তাঁহার দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করা—এই রাজ উপায় আমি জানি। যখন হিন্দু স্ত্রী কিছুতেই স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তখন প্রেমের দ্বারা তপস্তার দ্বারা তাঁহাকে ভাল করিতে চেষ্টা

করিবেন। নিজে অসংযত ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়া অথবা নিন্দা প্রচার করিয়া বা নিন্দার প্রস্তর দিয়া নিজের ভাবা সংসারটি আরও ভাঙ্গিবেন মাত্র। স্বামীর বাহাতে স্বীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, এইরূপ আচরণ করা উচিত। যে নিজে দোষী, সে নিজেকে সর্বদাই হীন মনে করে। যখন সংসারে কোন বাধা না পায়, তখন বিবেকবাণী তাহাকে বাধা দিয়া থাকে; সে নিজে লজ্জিত থাকে, কিন্তু স্বী যদি তখন উগ্র-মুর্তিতে গুরুমহাশয় সান্নিধ্য উপস্থিত হন, তখন স্বামীর মন হইতে ধীরে ধীরে সেই অহুতাপ ও লজ্জার ভাব দূর হইয়া যায়। প্রতিহিংসাবৃত্তি আগিয়া উঠে, এবং সে কুকর্মে আরও দৃঢ়রূপে রত হয়। কিন্তু সে যদি জানে, বাহার প্রাণে তাহার সেই ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী লাগিয়াছে, সেই স্বী হৃদয়ের দুঃখ গোপন করিয়া হাসি-মুখে তাহার সেবা করিতেছে, তাহার নিন্দা না হয়—একজ্ঞ প্রাণপণে দোষগুলি ঢাকিয়া রাখিতেছে,—সে তাহার সেবার ও নিজের ভিতরকার কষ্টে ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ও মধ্যে মধ্যে ইজিতে যে উপদেশ দিতেছে, তাহাতে তাহার প্রাণ থাক্ হইয়া যাইতেছে—তাহা হইলে স্বামীর ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। যে দ্বার দিয়া বিবেকবাণী তাহার কণ্ঠে পৌছায়, বাহা দিয়া সর্ব্বার্থের অন্ত অহুতাপ-শিখা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করে, স্বীর প্রতি দয়া ও প্রেম সেই পথ দিয়াই নীরবে প্রবেশ কারবে। আমি বলিতে চাই না যে, বিনি এইরূপ করিবেন, তিনিই স্বামীকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। চৈতন্যদেবের মত লোকও উদ্ভিষ্ট্যায় কেশব সামন্তকে উপদেশ ও ভক্তির জীবন্ত রসধারা দিয়া উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সুতরাং স্বী সর্বদাই যে স্বামীকে এই উপায়ে পাইবেন, তাহা বলিতে পারি না—তবে যদি পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে—তবে এই উপায়ে। যে পর্যন্ত আত্মকর্মের ফল প্রকৃতির নিরমে পার্কিয়া না উঠে, সে পর্যন্ত বৃথা টানাটানি করিয়া উহা পাকান যায় না। একদিনে আম, জান, কাঁটাল কোন ফলই পাকে না, সেইরূপ যে পর্যন্ত স্বাভাবিক বিধানে একটা নির্দিষ্ট সময় না আসে, সে পর্যন্ত অনেক সময় পয়ের চরিত্র শোধরাইবার চেষ্টার ফলোদয় হয় না।

যদি পূৰ্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও কোন স্ত্রী স্বামীকে সংশোধন করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহার মনে আত্মতৃপ্তির নিৰ্ম্মল সুখ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। তিনি নিজ ব্যবহারে কোন অজ্ঞার করেন নাই, বাহার সহিত ভগবান্ তাঁহার ভাগ্য একত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন,—তাঁহার ভালবাসার জন্য তিনি যথাসাধ্য করিয়াছেন, সেই চেষ্টায় তিনি দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই, অপ্ৰিয়বাদিনী হন নাই—ঔদাসীন্ত দেখান নাই এবং তপস্তার ক্রটি করেন নাই। “যতন করিতে তারে বাকী কি রেখেছি আমি”—এ কথা তিনি বলিতে পারেন। আমরা বাহা পারিব, আমাদের বাহা কর্তব্য—তাহাই ত করা উচিত, তদতিরিক্ত আমরা কি করিতে পারি? এবং বাহা আমাদের সাধ্যাতীত, তাহা না করার জন্য ভগবান্ কোন কালেই আমাদের দায়ী করিবেন না।

কোন কোন স্বামী অনেক সময় স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করেন—বাহার চিন্তাবেগ প্রবল ও চরিত্র অতিরিক্ত পরিমাণে আগ্রহ-শীল তাঁহার স্ত্রী যদি কতকটা উপেক্ষার ভাব দেখান,—তবে তিনি বাহা দিয়াছেন, সেই পরিমাণে মেহ পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ থাকেন।

সন্দেহ স্বামী

অনেক সময় একরূপ দেখা যায় যে, স্ত্রী সংসারের সকল লোকের সেবার প্রাণপণে খাটিতেছেন, তিনি লজ্জার জন্য হউক কিংবা অন্ত কোন কারণে হউক, স্বামীর প্রতি বাহিরে কতকটা তাকিয়া দেখাইতেছেন। বাড়ীর অপর লোকেরা বাহা করিতে বলিতেছেন, তাহা করিতেছেন, অথচ স্বামীর কথার ততটা মনোযোগ দিতেছেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বাহাতে স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যের উপর দাবী রাখেন, যথা—তাঁহার কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখা, কি বাহা বথন দরকার, ঠিক করিয়া রাখা—ইত্যাদি বিষয়ে স্ত্রী অমনোযোগী, অথচ অন্তান্ত ব্যাপার লইয়া তাঁহার মনোযোগের অভাব নাই। স্বামী বথন এইভাবে পদে পদে স্ত্রীর তাকিয়া দেখেন, তখন তিনি মেহের প্রতিদান পান নাই;—এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। এইরূপ ভিত্তির উপর পরিশেষে সন্দেহ-তরুর উদ্ভব হইতে পারে। স্বামীর সন্দেহ-নিবারণের একমাত্র উপায়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগ ও

স্নেহ দেখাইবেন। সন্নিধ-চিত্ত পেচকের মত বসিয়া বসিয়া কেবল কুখ্যান করে,—কারণ, পেচক যোগী নহে যে, ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে,—সে তথাপি ধ্যান করে, তাহা কু বৈ কি? সন্নিধ-চিত্তের এই ধ্যানের ফলে কত অসম্ভব কথা সম্ভবের মত হইয়া প্রতীয়মান হয়, অনেক সময় জী যতই সাবধান হইবেন, ততই স্নেহ বাড়িয়া চলিবে। জীর ঘোমটা বেশী হইলে সে মনে করিবে, ইহা লজ্জার অভিনয় মাত্র, লোক দেখাইবার জ্ঞান। যদি ঘোমটা কম থাকে, তবে তাহা প্রকাশ্য লজ্জাহীনতা, তাহারও কত অর্থ হইবে। জী যদি ঘরে বসিয়া থাকেন,—তবে সে মনে করিবে, একাকী অপর হইতে দূরে থাকিয়া সে কি গুপ্ত-অভিসন্ধি করিতেছে; যদি সকলের মধ্যে চলাফেরা করেন, তবে স্বামীর চক্ষু ডিটেক্টিভের জায় জীর ছায়ার পাছে পাছে ফিরিবে। জী সাবধান হইয়া কি করিবেন? রোগ বধন স্বামীর মনে, তখন তিনি বাহিরে চিকিৎসা করিয়া কি লাভ পাইবেন? বাহ্যিক রোগ, তাহারই চিকিৎসার দরকার। এই স্নেহের ফলে কত স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের একটি উকাল একদিন জীকে প্রহার করিয়া আঘাতা করিয়া কেলিয়াছিলেন, সকলে বাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, “আমি দেখিলাম, ঐ বাড়ীর জানেলা হঠাৎ একটা লোক পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার জীর ঘরে প্রবেশ করিল।” বলা বাহুল্য, তখন তিনি দস্তুর মত পাগল হইয়া গিয়াছেন,—কিন্তু এই পক্ষিরূপ কর্তার কিছু নীচের শ্রেণীতে যে সকল স্বামী আছেন, তাঁহারা ঠিক পাগল হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অত্যাচার পাগলের অত্যাচার হইতে বেশী, কারণ, তাঁহাদিগের পায়ে বেড়ী দেওয়া যায় না।

জীর একেবার সাবধানতার প্রয়োজন নাই, বোধ হয়, এ কথা বলা ঠিক নহে, কিছু সাবধান তিনি অবশ্যই হইবেন। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্র সাবধান হইলে স্বামীর রোগ বাড়িয়া বাইবে। মশজনে বাহা করে, তিনি যদি তাহা করিতে ভয় পান, তবে স্বামী সেগুলি পানের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু স্বামী যদি প্রকাশ্যভাবে কিছু মানা করেন, জীর তাহা না করাই ভাল;

সন্দেহ-রোগের এক ঔষধ আমি জানি, তাহা অনেক সময় অব্যর্থ। স্বামীকে স্নেহ দেখান;—মিথ্যাচরণে সন্দেহ বাড়িয়া যাইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। মিথ্যাচরণ না করিয়া যদি সৰ্ব্ব-বিষয়ে স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া যায়, তবে স্বামী প্রীত হইবেন। অনেক সময়ে অপরের সেবার এবং স্বীয় উদাসীনতার সময় বার না করিয়া, যদি স্বামীর প্রতি যত্ন ও আদরে জী আন্তরিক আগ্রহ দেখান, তবে স্বামী বেশী দিন সন্নিধ থাকিতে পারেন না। সন্দেহ কোন মুখের প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায় না; যাহাকে সন্দেহ করা হয়, তিনিও বেক্রপ ক্রেশ পান,—যিনি সন্দেহ করেন—তিনিও সেইরূপ। উভয়েই মনে মনে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। সন্দেহ স্নেহ বা অমুরাগের অভাবে হয় না, তাহার আত্মশয্যে হইয়া থাকে। স্বামীর মনে যদি এই কথাটা লওয়াইতে পারা যায় যে, জী সত্য সত্যই তাঁহার অমুরাগিনী, তবে সন্দেহ বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না। তাহা না করিয়া জী যদি অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লোককে দেখাইতে থাকেন যে, তিনি কত সাবধানে চলাফেরা করেন, অথচ স্বামীর সন্দেহ কিছুতেই যায় না,—তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে না। তাঁহার হৃদয় হইতে উপেক্ষার ভাব দূর করিয়া স্বামীর প্রতি তিনি বেশী মনোযোগ দিন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহার স্নেহামৃত-বর্ষণে সন্দেহের বিষ খুইয়া গিয়াছে।

শেষের কথা

কিন্তু যখন গৃহিণী দেখিলেন, অনেক করিয়াও স্বামীর চরিত্র শোধরাইতে পারিলেন না,—তিনি মন্তপারী, কুচরিত্র বা অত্যাচারী ও সন্নিধ রহিয়াই গেলেন; যখন বুঝিলেন, তাঁহার তপস্তা ব্যর্থ হইল, প্রাণ দিয়া যে সংসারের অস্ত তিনি খাটিলেন, সে সংসারে তাঁহার আদর নাই,—সে সংসারে তাঁহার মুখের

দিকে চাহিবার লোক নাই, ডানহাতে কাজ করেন, বামহাতে চকের জল
মোছেন,—সকলের খাওয়ার জন্ত প্রাপণপণে পরিচর্যা করেন, নিজে যে খান নাই,

নিরাশ্রয়ের
সাহস কি ?

তাঁহা কেহ বলে না। তিনি একবার ডাকিয়া যদি বলেন,

“তুমি কি আজ খাও নাই ?”—এই প্রশ্নটি মাত্র শুনিলে

তাঁহার কণ্ঠ জুড়ায়,—এই খোজটি লইলেই তাঁহার স্বাধা-

পানের ফল হয়, তিনি একটিবারও শুধু মুখের কথায়ও তাঁহা বলেন না। একা
কাঁদিয়া বিছানার লুটপটি হইয়া পড়িয়া থাকেন, বাহা পাওয়া এত সহজ, তাঁহা
যেন কঠিন হইতে কঠিন, অসম্ভব হইতেও অসম্ভব হইয়া পড়ে ; বখন দেখিবেন,
যে ছেলে তাঁহার কোল ছাড়া ঘুমাইত না,—যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিত,
সন্ধ্যা হইলে “মা” “মা” বলিয়া তাঁহার আঁচলের নিকট আসিত, সে ছেলে
তাঁহাকে কেলিয়া চলিয়া গেল ; অপর ছেলে বাহার উপর তরলা রাখিয়াছিলেন,
সে ছেলে জীর কথা মানিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইল এবং বাড়ীতে আসিল
না ;—বখন দেখিলেন, হুঃখের পর কেবলই হুঃখ, উজ্জল কৃষ্ণ চুলগুলি শীঘ্র শীঘ্র
উঠিয়া বাইতেছে বা পাকিয়া পড়িতেছে ; তাঁহার দেহের প্রশংসিত রূপ চলিয়া
গিয়াছে, উপেক্ষার দেহ কতকাল টিকে ? এমন কি, বাহার শত অত্যাচার
যিনি কুলরাশি মনে করিয়া বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন, বাহার স্নেহ হারের মত
জ্বরে গাঁথিয়া পরিয়া মনে মনে গোরবাধিতা ছিলেন, যদি এমনও ছদ্ম আসে
যে, তিনিও চলিয়া যান, তবে রমণী কি করিবেন ?—বখন দেখিবেন, আত্মজ্ঞা
আসিয়া সংসার বিদ্রিগাছে, নিজে না খাইয়াও স্বামী এবং শিশুগণকে খাওয়াইতে
পারিতেছেন না, তখন তিনি কি করিবেন ? বখন দেখিবেন, হুঃখের পার নাই,
হুঃখিতার শেষ নাই,—তখন কে আশ্রয় দিবে, কাহার সাহায্যে বিপদ হইতে
উদ্ধার পাইবেন, খুঁজিয়া সন্ধান পান না,—তখন সেই ছদ্মই তিনি কি করিবেন ?
আজন্ম সাধনা ব্যর্থ হইলে, জীবনে দিকার জন্মিল, এই হুঃখ-সমুদ্রে ডুবিয়া তিনি
তখন কেমন করিয়া উদ্ধার পাইবেন।

আমাদের একটা সঙ্কিত মূলধন থাকা উচিত। বাহারা বুঝে যায়, তাঁহাদের

পশ্চাতে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়া একদল সৈন্য হুর্গে বসিয়া প্রতীক্ষা করে। যে টাকা দৈনন্দিন খরচে লাগে, তাহা ছাড়াও আপনাদের অল্প কতকটা টাকা তুলিয়া রাখা দরকার। সংসারে আমাদিগের সর্বস্ব নীলাম

সংকল্প ও প্রেম

করিয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের পতির উপরও পতি আছেন, ছেলে হইতেও প্রিয় সামগ্রী আমাদের আছে—তাঁহাকে স্মরণ রাখিয়া, তাঁহারই জন্য এই সংসারে আমাদের খাটিতে হইবে, না হইলে ইহা শুধুই বেগার খাটা।

আমরা মুখে বলি, তিনি সর্বত্র আছেন, কিন্তু তাহা কি আমরা একবার ভাবি? যদি রাজার সম্মুখে আমরা যাই, তবে কতদূর সংযত হইয়া চলি, কথা বলিতে কত সাবধান হই, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে কত চেষ্টা করি। আর যিনি রাজার রাজা, তিনি এই মুহূর্ত্তে এইখানে আছেন, এই কথা যদি সত্যই মনে ভাবি, তবে কি করিয়া আমরা কথায় ও ব্যবহারে এরূপ অসংযত হইতে পারি? তিনি আমার কাছে আছেন ইহা ভাবিলে আমার হৃৎকোথায়? সংসার-সমুদ্রে যদি একবার ডুবি, তবে তাঁহার তরীর পাড় ধরিয়া আবার তাহারই পানপত্র ছুঁইব, এই ভরসা রাখিয়া চলিবে। হৃৎকোথায় ও শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় সংকল্প। যাহার ছেলে চলিয়া গিয়াছে, তিনি নিজের অশ্রু মুছিয়া অপরের ছেলের সেবা করুন,—যখন হাসিতে হাসিতে অপরের ছেলে বিদেশ-হইতে বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাকে ধানদুর্কা দিয়া বরণ করিয়া লউন। হয় ত তাহার মাতা পীড়িতা, তিনি উঠিতে পারেন না; শোকসন্তপ্তা আজ বাইয়া সেই ছেলের মাথার চলন লেপিয়া দিন; যে ছেলে না খাইয়া আছে, তাহার ক্ষুধা দূর করুন, তখন দেখিবেন, বালগোপালের পূজা হইল। চূর্ণগোবর্ধনের সন্মুখ সকল ছেলে নুতন কাপড় পাইয়াছে, ঐ ভিখারিণীর ছেলে পার নাই। সে বড়ই “নুতন কাপড় নেবো” বলিয়া কাঁদিয়াছে, তাহার মাতা তাহাকে ততই চড় মারিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শিশু বুমাইয়া পড়িল, তাহার কান্না থামিল, সেই নিম্নিত শিশুকে শোওয়াইয়া মাতা কাঁদিতে বসিলেন। হে শোকসন্তপ্তা,

আপনি বাইরা সেই তিথারিণীর ছেলেকে একখানি নূতন কাপড় আনিয়া দিন, তারপরে পুজার ঘরে বাইরা দেখিবেন, ভগবানের পীতবসন সে দিন উজ্জল হইয়াছে, তাঁহার মুখের প্রীতির হাসি দেখিয়া সে দিন আপনার চক্ষু জুড়াইবে। বিদেশাগত পরের ছেলের তত্ত্ব আপনি যে ধানদুর্কা জুড়াইয়াছিলেন, দেখিতে পাইবেন, তাহা ভগবানের পাদপদ্মের প্রভা বাড়াইয়াছে,—যে চন্দন ঘষিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং চন্দনচর্চিত হইয়া আপনাকে দেখা দিতেছেন। অরূপের রূপের আভাস যে দিন পাইবেন, চক্ষুর ভরা সেই দিন মিটিবে। সংকল্পের দ্বারা অবিরত সেবা করিলে, তিনি আপনার কাছে আসিবেন। তখন আবার চুঃখ কিসের? যিনি প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে পাইলে আবার চুঃখ কিসের? বাঁহাকে মরিবার সময় খুঁজিব, বিপদের দিন খুঁজিব, শ্মশান পার হইয়া বাঁহার নিকট বাইতে চাইবে, তাঁহাকে পাইলে আবার চুঃখ কিসের? তাঁহার সম্মানের অঙ্গ মোড়াইবার তত্ত্ব তাঁহার হস্ত চিরদিন উজ্জত চইয়া আছে, আমরা নিজেরা আত্মাভিমানে তাহা ঠেকাইয়া রাখিয়াছি।

অনেক প্রবীণা স্ত্রীলোককে সর্বদা ভ্রপতপে নিযুক্ত দেখা যায়। ভ্রপের মাল্য ক্রমাগত আঙ্গুলে ঘুরিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাংসারিক ভাবনা-চিন্তা ও

মৌখিক ভ্রপ বৃণ।

খোঁজ লওয়ার অবধি নাই। কাক উড়িয়া ধানের উপর পড়িল, তিনি ‘হুস্’ বলিয়া তাড়াইতেছেন, আগন্তুক আত্মীয়কে দেখিয়া বলিলেন,—“বো’স বো’স, ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিনি না, আজও জ্বর চইয়াছে।” সেই সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র আসিল, তাহার দিকে স্নেহাঙ্গী-চক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—“আজ বৃষ্টি এখনও কিছু ষাও নাই?” কিছু পরে বলিলেন,—“চক্ষে ঝাপসা দেখিতেছি, চিকিৎসা না চাইলে চক্ষু ছটি যোয়াইব।” এইরূপ শত শত কথার মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির বিরাম নাই, শব্দ-বিহিত-পথে অষ্টোত্তর একশতবার ভ্রপ চলিতেছে।

মনের মলা দূর না করিলে ভক্তি ও ধর্ম-বিশ্বাসের শান্তি পাওয়া বাইবে না। তিনি হৃদয়ের ধন, অনেক কষ্ট সহিয়া একাগ্র হইয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, নিজের

ভোগস্বখের পথে সংঘের কাঁটার বেড়া দিয়া তাঁহাকে পাইতে হয়, একান্ত না হইলে তাঁহার পায়ের নুপুরের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু তিনি রোজই আসেন,

তিনি নিতাই আসেন
মুহুর্তে মুহুর্তে আসেন, তাঁহার স্নেহের শিশুরা কি
করিতেছে তাহা দেখিতে আসেন। তাহার। যদি

নিজ স্নেহের ও স্বার্থের ঠুলি পরিয়া চক্ষু আঁধার করিয়া রাখে, তবে তাঁহার পাদপদ্ম দেখিবে কিরূপে ? তাহার। যদি একমনে বলিয়া, তাঁহার নিদিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা না করে, তবে তিনি কাহার নিকট আসিবেন ? আমার সমস্ত মন ও কৰ্ম্মের উপর যখন সংসার চাপিয়া আছে, তখন জপের মালা তাঁহাকে কাছে আনিয়া দিতে পারিবে না। যে দিন কণ তাঁহার মিতে স্বর চিনিবে এবং মন তাঁহার প্রেমে মজিবে, সে দিন জপের মালা গজার জলে ভাসাইয়া তাঁহার নাম শুনিয়া ভক্ত কাঁদিবেন আর গাহিবেন :—

“আমার মন যদি রে ভোলে—

তবে বালির শয্যার মাঝের নাম দিও কর্ণমূলে।

দেহ আপন বশ নহে—সে রিপুর সঙ্গে চলে।

আমায় এনে দে, ভোলা, জপের মালা

ভাসাই গজাজলে।” (১)

হৃদ্যন্ত দম্ভ্য চাঁদরারের ভয়ে গোড়ের সম্রাট ভীত হইয়াছিলেন। গোড়দ্বারে এই ব্যক্তি যে দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং অসাধারণ বলসম্পন্ন সৈন্তের সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—তাঁহার ভয়ে নবাব-সৈন্ত সেদিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই দম্ভ্য ব্রাহ্মণবংশে

চাঁদরার

জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বিখ্যাত কৃপার নরোত্তমের ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি যত্ন-মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ শোধরাইয়া গেল, তিনি বৈষ্ণব সাক্ষিরা

(১) এই গানটি নাটোরের রাজা রাণী ভবানীর পুত্র বিখ্যাত রামকৃষ্ণের। যখন তিনি জপ তপে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন অসুচর ভোলা তাঁহার কাছে উত্তরসাধকরূপে থাকিত। গানে তিনি এই ভোলার প্রতি সর্বোদন করিয়া বলিতেছেন।

দীনাভিনীনের ভ্রাতৃ তিলক কাটিয়া ভখন তুলসী-মালা গলায় পরিয়া তাহাই তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি অপেক্ষা প্রিয় মনে করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি জাবিলেন, সেই তুলসী-মালা তিলকই ভগবানের স্মৃতি-চিহ্ন।

এই অবস্থায় মাত্র একশত অখারোহী সৈন্ত ও চারিশত পদাতিক লইয়া তিনি একদা গঙ্গান্নানে বাত্মা করিলেন। নবাবের চর তাঁহাকে খাইয়া বলিল,—“অতি অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়া চাঁদরায় গঙ্গান্নানে-গিয়াছেন।” নবাব কালবিলম্ব না করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্তের সাহায্যে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তুনিয়ে এক ভীষণ কারাগারে লৌহশৃংগে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কয়েকদিন পরে চাঁদরায়কে নবাবের আদেশে দরবারে উপস্থিত করা হইল, নবাব তাঁহাকে অনেক জৎসনা করিলেন। চাঁদরায় কেবল এইমাত্র বলিলেন,—“আমি প্রকৃতই অপরাধী, আমাকে দণ্ড দিন।” তাঁহার এই বিনয় দেখিয়া নবাব বিস্মিত হইলেন, এবং কঠোর স্বর কিঞ্চিৎ কোমল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কারাগারে তুমি কেমন ছিলে?” চাঁদরায় বলিলেন,—“আমি এত স্থখে আর জীবনে কোথাও থাকি নাই।” বিস্ময়ের সহিত সম্রাট তাঁহার কি স্থখ, তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে, চাঁদরায় গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—“আমার কখনও মনে হইয়াছে, তাঁহার পাদপদ্মে অলঙ্কৃত পরাইতেছি, কখনও মনে হইয়াছে, তাঁহাকে বাজন করিতেছি, কখনও বিভোর হইয়া মনে মনে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা তাঁহার আরতি করিয়াছি,—কখনও ধূপ-ধূনা দিয়া মনে মনে তাঁহার মন্দির স্নগন্ধ করিয়াছি, কখনও বা যুধি, স্নাতী প্রভৃতি কুসুমদামে অপূর্ণ মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া ধন্ত হইয়াছি, আমার প্রাণের প্রাণকে সেই কারাগারের মধ্যে নির্জনে বেক্রপ পাইয়াছিলাম, এক্রপ কোথাও পাই নাই। আমি আনন্দে বিভোর ছিলাম, আমার কুলা তৃষ্ণা ছিল না,—কি ভাবে দিনরাত্র কাটাইয়াছি, তাহা আমার মনে নাই।”

দান, সেবা ও প্রেম,—এই সংসারে সেই দেবমন্দিরের পথে যাত্রাবকে লইয়া যায়। নারিকেল-বৃক্ষকে সাধারণতঃ হিন্দুগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন ;

উহা অতি উচ্চ হইয়া আমাদের মাথা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য নহে। নিজের মূল তো মানুষের হাতের কাছে পড়িয়াছে, একটা কুড়ালি দিয়া আঘাত করিলেই তরুটি এখনই পড়িয়া
বৃক্ষের অমৃত পান

যাইবে। কিন্তু লোক-দৃষ্টি হইতে দূরে থাকিয়া সাধনা করিবার জন্য সে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সাধনার ফল মানুষকে দিবে বলিয়াই সে তাহা রক্ষা করিতে এত যত্নপর, পাছে ফল পুঁনা হইতে হইতেই লোক তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে; এই জন্য দূরে বাসিয়া সে সাধনা করিতেছে, সেই ফলে লোকের ক্ষুধা ও পিপাসা একেবারে নিবারণ করিবে, এই সাধনা। সাধুরা মানব-সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া এই ভাবে সেই সমাজের শুভ-সাধনা করিয়া থাকেন। বৃক্ষ নিজে বৃষ্টি ও রোদ ভোগ করিয়া শুকাইয়া মরিলেও কাহারও নিকট কিছু চাহে না। যে ব্যক্তি কুড়ালি দিয়া তাহার শাখা কাটিতেছে, তাহাকে নিজের ছায়া হইতে বঞ্চিত করে নাই, যে চাহিতেছে, তাহাকেই অকাতরে ফুল-ফল বিতরণ করিতেছে। এই ভাগের কারণ কি? কি সুখে এত কষ্ট সহিয়া সে জীবের উপকার করিতেছে? সে নিভৃতে অন্তের অগোচর তাহার কোমল শিকড়রূপ হস্তে দৃঢ়রূপে ধরিয়া জননীর স্তন্যপানে বিভোর রহিয়াছে, অমৃত পান করাতে তাহার স্বভাব অমৃতময় হইয়া গিয়াছে।

গোপনে আনন্দময়ের প্রেমরস দ্বারা হৃদয় পুষ্ট রাখিলে, সংসারের দুর্গতি কি করিতে পারে? বিপদ ব্যাঘ্রের মত আসিয়া মেঘের আশ্রয় হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের

আশ্বাসন

গানে আছে,—“আমি শ্রাম-অনুরাগে এ দেহ সঁপিছু, তিল-তুলসী দিয়া।” তিল-তুলসী দিয়া, যে দান করা যায়, তাহার উপর কোনই স্বত্ব থাকে না। ভগবানকে যদি এ দেহ দান করিয়া বলা যায়, “আমার চক্ষু-কর্ণ তোমারই আদেশে চলিবে, এ দেহ, হে কর্ণধার, তুমি যে ভাবে চালাইবে, সেই ভাবেই চলিবে—আমি ইহার মালিক নই, আজ হইতে স্বত্বত্যাগ করিয়া এ দেহ তোমাকে দিলাম,” তখন আর এই দৈহিক স্মৃতির জন্য মাথা কুটিতে হইবে না,—কোন ভয় বা সঙ্কাপ ইহাকে ছুঁইতে পারিবে না।

“আমি তাঁহাকে ইহা দিয়া কেলিয়াছি,” এই চিন্তা করিয়া প্রতি কার্যে তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ রাখিয়া চলিলে বিপদ কোথায়? তিনি অল্প দিতে আসিয়া তোমার স্বেচ্ছাচার দেখিয়া কিরিয়া যান,—বে পাদপদ্মের প্রভায় তোমার জীবন উজ্জ্বল হইবে, তাহা তোমার মাথার কাছেই আছে। দেহকে পবিত্র কর, সেই দেহেই তাঁহার বেদী হইবে। তখন বিজ্ঞাপতির কথাই বলিতে পারিবে,—“বেদী কর্ব হাম আপন অঙ্গনে, ঝাক কর্ব তাহে চিকুর বিছানে।” এই দেহ বেদী হইবে এবং মাথার চুল, বাহা এত গৌরবের জিনিষ, তার দ্বারা খাঁটা বানাইয়া সেই বেদী পরিষ্কার করিব, অর্থাৎ আমার যত পাখিব-গৌরব, তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া তাহারই পদধুলির জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিব। তাহারই জন্ত পথের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইতে কোন শ্রাম সন্ধ্যার, বা নিশ্চক্ক রজনীতে, বা প্রাতেও শুভ্র সেফালিকার পতন-শব্দে—হয় ত সত্য সত্যই এই হৃদয়কুঞ্জে তাঁহার পাদক্ষেপ শোনা যাইতে পারিবে; তখন দশ ইন্দ্রিয় ধন্য হইয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিতে দাঁড়াইবে,—তখন জীবনে যাহা কিছু বিফল হইয়াছে, তাহা সকল হইবে, এবং যত কিছু দুঃখ, তাহা সৌভাগ্যের শুভ-চিহ্ন হইয়া কপালে ভক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া দিবে।

পরিশিষ্ট

গৃহ-চিকিৎসা (১)

(এলোপ্যাথিক মতে)

কলিকাতা ভবানীপুরের হুগ্ৰসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি,
এ, এম, ডি, মহাশয় কর্তৃক এই পুস্তকের জন্য লিখিত ।*

প্রথম অধ্যায়

নবজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য ।

স্থতিকা বা আঁতুড়-ঘরে :—শিশু জন্মিষ্ট হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে কান্দাইবার
চেষ্টা করিবে । দুইটি গামলার ঠাণ্ডা ও গরম জল রাখিয়া শিশুকে একবার
গরম জলে, একবার শীতল জলে হাতে ধরিয়া
আঁতুড়-ঘরে
ভাসাইবে । যেন শিশুর মুখে জল না লাগে ।

এইরূপ করিলে শিশু কান্দিতে থাকিবে । যত কান্দিবে, ততই ভাল ।

চক্ষু :—বোরিকঅলে ডুলা ভিজাইয়া, চক্ষু দুইটি ভাল করিয়া মুছাইয়া দিবে ।

* ম্যাকলিরোড বর্ষপদকপ্রাপ্ত হুগ্ৰসিদ্ধ ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, এম, ডি
মহাশয় কলিকাতা ইউনিভার্সিটির কেলো, কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল এবং কলেজ অব্ ফিজি-
সিয়ালজের অধ্যাপিকার ভূতপূর্ব চিকিৎসক, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক এবং অধ্যাপিকার-
সম্বন্ধে বড় করেকথানি ইংরেজী গ্রন্থের প্রণেতা, ইনি ভবানীপুরের মাননীয় বিচারপতি ভায়ার
আণ্ডতোব মুখোপাধ্যায় এবং অপরাপর বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহ-চিকিৎসক ।

প্রসব-সময়ে শিশুর চক্ষে ময়লা লাগিয়া যায়। পরিষ্কার করিয়া না দিলে পরে চক্ষের অস্থি হয় ও চক্ষু নষ্ট হইয়া বাইতে পারে। এইরূপে স্নতিকাগৃহেই অনেক শিশু অন্ধ হইয়া যায়।

মুখ :—আঙ্গুলে তুলা জড়াইয়া মুখের ভিতর বেশ করিয়া মুছাইয়া দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, মুখ মুছাইয়া না দিলে শিশু কাঁদিতে পারে না।

নাভি :—নাভি কাটিবার জন্ত বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। জন্ম-মাত্র নাড়ীটিতে হাত দিলে, নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্ত চলাচল করিতেছে বুঝিতে পারা যায়। ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া আইসে। সেই সময়ে স্নতা দ্বারা নাড়ীটি দুই স্থানে বাধিয়া, মধ্যস্থল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিবে। স্নতাটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবে। তৎপরে লিণ্ট পেটের উপর রাখিয়া নাড়ীটি বসাইবে এবং তুলা দিয়া ঢাকিয়া একটি পটী বাধিয়া দিবে। নাভিটি খুলিয়া প্রত্যহ তাহার অবস্থা দেখিবে। একটু বোরিক এসিড দিবে। প্রদীপের শীষে হাত গরম করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ‘হরিলুটের খোকা’ হইলেও হরির-তলার মাটি কখনও নাভির দ্বারের উপর দিবে না। নাভির দ্বারে কোনরূপ ময়লা-মাটি লাগিলে খোকাটির ধনুইকার রোগ হইতে পারে। সাধারণে ইহাকে ‘পেচো পাওয়া’ বলে। ইহাতে ছেলের চোয়াল ধরিয়া যায়, মাই টানিতে পারে না। এই রোগ হইলে আর নিস্তার নাই। নাভিতে মাটিলাগার দ্রবণ আমি ২৩টি ছেলের মৃত্যু হইতে দেখিয়াছি। স্নতিকাগৃহে ব্যবহার জন্ত “নার্সারি পাউডার” ব্যবহার করিবে।

খাঙ্গ :—শিশুকে প্রথমতঃ মধু খাইতে দিবে; পরে মাই খাওয়াইবার জন্ত চেষ্টা করিবে। কেহ কেহ বলেন, ২৩ দিন মাই দিতে নাই; কিন্তু ইহা বিশেষ ভুল। মাতৃস্তন্থে শিশুর উপযোগী খাঙ্গ সদাই বর্তমান জানিবে; কিন্তু কি পরিমাণ খাঙ্গ শিশুকে খাইতে দিতে হইবে, অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন না। বস্তুতঃ ইহা ঠিক করা একটু কঠিন। খাঁটা ও জল দেওয়া দুই প্রকারের দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। এক পোয়া খাঁটা দুগ্ধ ও তিন পোয়া জল দেওয়া দুগ্ধ শিশুর পক্ষে

সমান। সপ্তাহে সপ্তাহে শিশুকে ওজন করিলে শিশু বাড়িতেছে কি না, জানা যায়। শিশুর ওজন হিসাবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে হয়। সুস্থ শিশুকে কোন্ কোন্ সময়ে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

সুস্থ শিশুকে কোন্ কোন্ সময়ে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে

তাহার তালিকা।

১ সপ্তাহ	১ মাস	২ মাস	৫ মাস	৭ মাস	৯ মাস	১০ মাস
দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—	দিবা—
৬টা	৬টা	৬-৩০	৭টা	৬-৩০	৭টা	৭টা
৮টা	৮-৩০	৯টা	১০টা	৯টা	১০টা	১০টা
১০টা	১১টা	১১-৩০	১টা	১০-৩০	১টা	১টা
১২টা	১-৩০	২টা	৪টা	২টা	৪টা	৪টা
২টা	৩টা	৪-৩০	রাত্রি—	৪-৩০	রাত্রি—	রাত্রি—
৪টা	৫-৩০	রাত্রি—	৭টা	রাত্রি—	৭টা	৭টা
সন্ধ্যা—	রাত্রি—	৭টা	১০টা	৭টা	১০টা	
৬টা	৮টা	১০টা	৩টা	১০টা		
রাত্রি—	১০-৩০	৩টা				
৮টা	২-৩০					
১০টা						
২টা						

শিশুকে কি পরিমাণ খাদ্য খাওয়াইতে হইবে, তাহার তালিকা

বয়স	কতবার খাওয়াইতে হইবে	গরুর দুধ	জল	প্রতি বারে কত	সমস্ত দিনে কত
		আঃ	আঃ	আঃ	আঃ
১ সপ্তাহ	১০	১	১	২	২০
১ মাস	৯	১২	২২	৪	৩৬
২ মাস	৮	৩	৩	৬	৪৮
৩	৮	৩২	২২	৬	৪৮
৪	৮	৪	৩	৭	৫৬
৫	৭	৫	৩	৮	৫৬
৬	৬	৬	২	৮	৫৬
৭	৭	৭	২	৯	৬৩
৮	৭	৮	১	৯	৬৩
৯	৬	৯ বা ১০	—	৯ বা ১০	৫৪-৬০
১০	৬	ঐ	—	ঐ	ঐ

কোনও শিশুর মাতৃ-স্তনে দুধ না থাকিলে বা মা মরিয়া গেলে,

নিম্নের তালিকা মত শিশুকে খাওয়াইতে হইবে।

বয়স	কত বার	গাভী-দুধ	ক্রিম বা সর	জল বালি	প্রতি বারে কত	সমস্ত দিনে
		ড্রাম	ড্রাম	ড্রাম	আঃ	আঃ
৩ দিন	১০	১২	১	৬২	১	১০
৭ "	১০	৩	১	৮	১২	১৫
১৪ "	১০	৪	১	১১	২	২০
২১ "	১০	৬	২	১২	২২	২৫
২৮ "	১০	৮	২	১৪	৩	৩০
৫ সপ্তাহ	৯	১০	৩	১৬	৩৫	৩২-৫০
৬ "	৯	১৩	৩	১৮	৪-২	৩৮
৭ "	৯	১৬	৩	২১	৫	৪৪
৮ "	৮	২০	৪	২৪	৬	৪৮

টীকা :—শিশু তিন মাসের হইলে এবং বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলে টীকা দিবে। বাহ্যতে তিনটি টীকা দিলেই যথেষ্ট হইবে। টীকা দিলে বসন্ত রোগ হইবার তত ভয় থাকে না। টীকা দিবার টীকা পর যদিও বসন্ত হয়, সাধারণতঃ তাহা মারাত্মক হয় না। টীকা দিলে শিশুর বিশেষ কষ্ট হয় না। টীকা দিবার ৭৮ দিন পর, ৩৪ দিন একটু একটু জ্বর হয়। টীকা বেশী উঠিলে বোরিক কম্প্রেস দিবে। টীকার ক্ষত চুলকার, সেইজন্ত তাগাতে হাত দিতে না পারে, এরূপ ভাবে, “টীকা-রক্ষক” (vaccination shield) ব্যবহার করিবে। বোরিক তুলা চাপা দিয়া বাধিয়া রাখিলেও হয়। বেশী শ্রাব হইলে, একটু বোরিক মলম লাগাইয়া বাধিবে।

দাঁত-উঠা :—৭ মাস বয়স হইতেই শিশুদের দাঁত উঠিতে থাকে। কাহারও আগে, কাহারও বা পরে উঠিতে থাকে। সুস্থ শিশুর দাঁত উঠিবার সময় বিশেষ কোন অসুখ হয় না। কোনও কোনও শিশুর সেই সময় পাঁচড়া, কাসি ও পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়। দাঁত দেখা দিলে, মাড়ী একটু শক্ত জিনিষ দ্বারা ঘসিয়া দিলে ভাল হয়। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশের ছেলেদের চুবিকাটি ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। দাঁত উঠিবার সময় শিশু যদি বেশী কাঁদে, ভাল না ঘুমান, ছট্‌ফট্‌ করে, তাহা হইলে দুই গ্রেণ ব্রোমাইড জলে গুলিয়া সিরাপের সহিত খাইতে দিবে। দাঁত উঠিবার সময় জরে শিশুদের তড়কা হয়, দাঁত উঠিতে দেয়ী হইলে ডাক্তার দিয়া মাড়ী একটু কাটিয়া দিবে। সাধারণতঃ দাঁতের মাড়ী কাটিয়া দিবার দরকার হয় না। রেড়ীর তৈলের জোলাপ দিবে। শিশুর দাঁত উঠিলে, সাদা নেকড়া জলে ভিজাইয়া দুই বেলা পরিষ্কার করিয়া দিবে। মাহুষের দুইবার দাঁত উঠে। হুধের দাঁত উঠিবার সময়—৫.৭ মাস হইতে ২ বৎসর। প্রতি পাটাতে ১০টা করিয়া ২০টা উঠে। পাকা দাঁত উঠিবার সময়—৭ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর। প্রতি পাটাতে ১৬টি করিয়া ৩২টা দাঁত উঠে।

সাধারণতঃ শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় কোন অসুখ হইলেই দাঁত উঠাই কারণ বলিয়া অনেক ঠিক করেন। কিন্তু বস্তুতঃ দাঁতের মাড়ী যদি ফুলা, গরম বা বেদনায়ুক্ত না হয়, তবে দাঁত উঠার দরুণ শিশুর অসুখ নহে বুঝিতে হইবে। দাঁতের অনেক অসুখ আছে। সেইজন্য দাঁতের চিকিৎসক ডাকিবে। দাঁত ভাল না উঠিলে মুখত্ৰী ধারাপ দেখায়। চিরণ-দাঁত, গজদন্ত, ইঁদুর-দাঁত হইলে ডাক্তার দেখাইবে। পোকায় খাইলে দাঁতে কন্টনানি হয়। বস্তুতঃ কোন পোকা দাঁত খায় না, ইহা একটি দাঁতের অসুখ। বেদিনীরা যে দাঁতের পোকা বাহির করে, তাহা তাহাদের জুয়াচুরী জানিবে। দাঁত কন্টনানি হইলে ক্লোরাল হাইড্রাস ও কর্পূর সমভাগে খলে মাড়িয়া জলবৎ হইলে তুল্য করিয়া দাঁতে লাগাইবে। দাঁতে যদি গর্ত দেখা যায়, চিকিৎসক দ্বারা তাহা পূরণ (stop) করাইয়া লইবে। দাঁতের মাড়ী ফুলিলে লেবুর রস আঙ্গুলে করিয়া মাড়ীতে ঘষিবে। বেশী ফুলিলে একটু কাটিয়া রক্ত বাহির করাইয়া দিবে। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শিশু অনেক সময় হাসে, ইহাকে এ দেশের লোকে বলে, খোকা দেয়ালী করিতেছে। খোকায় পেটের অসুখ হইলে এইরূপ করে। সুতরাং “দেয়ালী” দেখিলে সাবধান হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের দাঁত

শিশুর অসুখ হইয়াছে জানিলেই অনেক সময় তাহার খাওয়ার বিষয় ভাবিবে। অনিয়মিত ভোজন করাইলে, বেশী বা কম খাইলে, ভাল দুধ না পাইলে, এইরূপ নানা কারণে অসুখ হয়। ‘কন্ডেলড্ মিল্ক’ বা
শিশুর খাদ্য
কোনরূপ পেটেন্ট বিলাতি দুধ ছেলেদিগকে নিয়মিত-
রূপে কখনই খাইতে দিবে না। বিশেষ আবশ্যক হইলে, চিকিৎসকের
পরামর্শানুসারে খাইতে দিবে। এই সকল দুধ খাইয়া শিশু কখনই সুস্থ থাকিতে

পারে না। ফিডিং বোতলে রাখিয়া দুধ খাওয়ান একেবারেই নিষিদ্ধ জানিবে। বোতলে দুধের কণা থাকিয়া যায়, তাহা পচে এবং তাহাই উদরস্থ হইলে শিশুর সাংঘাতিক উদরাময় রোগ দেখা দেয়। দান্ত জলের পেটের অস্থখ মত হড়হড়ে, সবুজ ও ৩৪ বারের বেশী হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। একরূপ হইলে দুধ কম খাইতে দিবে। চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইবে। চুখে ঘে জল মিশান হয়, তাহা গরম করিয়া দিবে। বেশী দান্ত হইলে একেবারে দুধ বন্ধ করিয়া বালি খাওয়াইবে।

যদি শিশুর মলে দুধের ছানা দেখিতে পাও, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু হজম করিতে পারিতেছে না। এইরূপ যদি ক্রমাগত হইতে থাকে, তবে রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে। বাটীতে সহজে এই ঔষধ তৈয়ারী করিয়া লওয়া যায়।

রেড়ীর তৈল	১ আঃ
গঁদ	৩ ড্রাম
চিনি	৩ ড্রাম
পিপারমেন্ট তৈল	২ কোঁটা

এই সকলের সঙ্গে জল ৬ ড্রাম দিয়া বেশ করিয়া খলে ঘুঁটিতে থাক ; তার পর আরও জল ঢালিয়া, চার আঃ শিশিতে ঢালিয়া রাখ ; চার ঘণ্টা অন্তর এক ছোট চামচ (Tea-spoonful) করিয়া শিশুকে খাইতে দাও।

এই ঔষধ রক্ত আমাশয়েই প্রথম অবস্থায় বেশ দেওয়া চলে। পেটের অনুখে আদার রস বড় উপকারী।

জ্বর :—শিশুদের জ্বর নানা কারণে হয়। দাঁত উঠা, ঠাণ্ডা লাগা, পেটের অস্থখ প্রভৃতি সামান্ত কারণেই জ্বর হয়। শিশুদের জ্বরের মাত্রা প্রায়ই হঠাৎ বেশী হয়। একজন সুবকের ১০৪° কি ১০৫° জ্বর হইলে অনেক সময় ভাবনার কথা। কিন্তু শিশুদের জ্বর সহজেই ১০৪°, ১০৫° পর্যন্ত উঠে, তাহাতে সেরূপ ভাবনা নাই। একরূপ জ্বর হইলে, প্রথমেই এক চামচ (Tea spoonful) রেড়ীর তৈল খাইতে দিবে।

তাহাতে দান্ত পরিষ্কার হইবে। পরে টিং একোনাইট ৩ কোটা, প্রতি ঘণ্টায় দিয়া, ৫ বার পর্য্যন্ত দিবে। যদি জ্বর না কমে, তাহা হইলে চিকিৎসককে সংবাদ দিবে। জ্বরের সময় শিশুকে কম পরিমাণে খাইতে দিবে। দুধে, জল বা বালি মিশাইয়া খাইতে দিবে। একটি থার্মমিটার বাড়ীতে রাখিবে। দিনে তিনবার জ্বর দেখিবে। শিশুর সহজ শরীরে উত্তাপ ৯৮½ ডিগ্রী। জ্বর বেশী হইলে বরফ, বরফ-খলিতে (Ice-bag) পুরিয়া রাখায় দিবে। ১০৩° জ্বর নামিলে বরফ বন্ধ করিবে। একটি ষড়ি ধরিয়। শিশুর নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণিবে।

জন্মবার পর শিশুর নাড়ী এক মিনিটে ১৪০
নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস
বার নড়ে।

১ বৎসরে	১১০
২-৩ বৎসরে	১০০
৪র্থ বৎসরে	৯০
৫ম "	৮০
১৪-২০ কিশোর বয়সে	৭৫
২০-৬০ যুবকের ও প্রৌঢ়ের	৭৫-৬৫
বৃদ্ধের	৮৫-৭০

ডান হাতের কব্জীতে নাড়ী গুণা সহজ হয়। এক বৎসরের শিশুর নাড়ী মাথার স্রদ্ধতলিতে গুণা যায়।

শিশুর শ্বাস :—

১ মাসে	১ মিনিটে	৪০ বার হয়
২ বৎসরে	.	৩০
৮ বৎসরে		২০

সামান্য কারণেই নাড়ী ও শ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু উত্তাপ বেশী হইলেই জ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে।

ঠাণ্ডা, সর্দি, ইন্ফ্লুয়েন্স :—শিশুর গায়ের চামড়া বড় পাতলা। সেই জন্য সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। শিশু অল্পই থাকিলে, খাদ্য কম বা পোষাক গরম না

হইলে অনেক সময় সর্দি হইয়া পড়ে। দূষিত
ঠাণ্ডা বায়ু গৃহের মধ্যে বাইলে শিশুর অস্থির করে। ঘরের

সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখে আলো জালিয়া ৫৬ জন একঘরে শুইলে বায়ু দূষিত হইয়া উঠে। প্রতিরাসে এই দূষিত বায়ু শিশু গ্রহণ করে। রাতে শিশুর গায়ে হাওয়া না লাগে, এরূপ ভাবে একটি জানালা খুলিয়া রাখিবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুরা প্রাতঃকালে খোলা-গায়ে ঘরের বাহিরে খেলা করে। ইহা অসুচিত। শিশুর মাথার টুপী দেওয়া উচিত। ভালরূপে চুল উঠিলে আর টুপী না দিলেও চলে। ভালরূপে কাপড়ে ঢাকিয়া শিশুকে বাহিরে লইয়া গেলে কোনরূপ বিপদের ভয় নাই। গৃহমধ্যে শিশুর গায়ে বেশী পোষাক দেওয়া উচিত নয়। শিশুর পোষাক গরম, বেশ আলগা ও হাল্কা হওয়া উচিত। শিশুর নাক সর্দিতে বন্ধ হইয়া গেলে, শিশুর নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। ভেসিলিনে একটু ইউক্যালিপ্টাস তৈল মিশাইয়া নাকের মধ্যে দিলে বা সরিষার তৈল নাকের মধ্যে দিলে উপকার হইবে। গরম জলে শিশুর গা সুছাইয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। জ্বর হইলে, একোনাইট টিং ২ কোঁটা হিসাবে ২ ঘন্টা বাদ ৫ বার দিবে। পরে ডাক্তার ডাকিবে।

‘হুখতোলা :—ছুখের মাত্রা একটু বেশী হইলে শিশুরা হুখ তুলিয়া কেলে। হুখ খাওয়ারিয়া শিশুকে চিং করিয়া শোওয়ারিয়া রাখা উচিত। উপড় হইলেই পেটে চাপ পড়ে এবং হুখ তুলিয়া কেলে। জননী মনে করেন যে, হুখ বেশী খাইলেই খোকাটি মোটা হইবে, কিন্তু, বস্ততঃ তাহা নহে। বতটুকু শরীরের পক্ষে দরকার, ততটুকু হুখই খাওয়ান উচিত। বেশী হুখে শিশুর উপকার দূরে থাকুক, বিশেষ অপকার হয়।

বয়স :—খোকা বয়ন করিলে তাহার খাওয়ার দোষ বুঝিতে হইবে। মায়ের শরীর অল্পই হইলে, বেশী হুখ খাইলে শিশু বয়ি করিতে পারে। গরু বা মহিষের

দুধ বহি শিশু পান করে, তবে শিশুকে দুধ অল্প পরিমাণে ও অনেককণ বাবে সাগু বালি মিশাইয়া দিবে। বেশী বমন করিলে দুধ বন্ধ করিয়া দিবে।

কোষ্ঠবদ্ধ :—দান্ত তালরূপ না হইলে বা মল কঠিন হইলে শিশুর খাত্তের অনুসন্ধান করিবে। দান্ততন্ত্রে চর্কির ভাগ কম হইলে শিশুর দান্ত হয় না।

কোষ্ঠ

এই অস্ত্র মাতাকে ভাল দুধ, মাখন ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। দান্ত হইবার অস্ত্র ম্যানা, অলিত অয়েল বা কড়লিতার তৈল, মেলিস ফুড শিশুকে খাইতে দেওয়া বাইতে পারে।

আমাদের দেশে ৩/৭ মাসের শিশুকে ভাত দেওয়া হয়। ইহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুকে দুধ ব্যতীত আর কিছু খাইতে দিতে নাই। ৮ মাসের ছোট শিশুকে এরাফট বা বার্ণি খাইতে দিবে না। দান্ত না হইলে ঔষধ দেওয়া ভাল নয়। এক চামচ গ্লিসেরিন একটু গরম জলে মিশাইয়া শিশুর মলদ্বারে পিচকারী করিবে। এক টুকরা সাবান মলপথে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে দান্ত হয়। ২ আঃ সাবানের জলে ১/২ আউন্স অলিভ তৈল মিশাইয়া ঐরূপে ব্যবহার করিলেও দান্ত হয়। শিশুকে নিরমিত সময়ে দান্ত করাইবার অস্ত্র পায়ের উপর বসান ভাল। ক্রমে অভ্যাস হইলে ঠিক সময়ে বাহ্যে করে। ৫ হইতে ১০ মিনিটের বেশী পারে বসাইয়া রাখা উচিত নয়, বেশী কৌৎ দিলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

শিশুদের পেটে কড়লিতার তৈল মালিশ করিলে সুফল লাভ হয়। একখানি কুমাল গরম-জলে ভিজাইবে, তাহা নিংড়াইয়া, বেশ পাট করিয়া শিশুর পেটের উপর রাখিবে। এক টুকরা অয়েল সিদ্ধ ঢাকিয়া পটা বাধিয়া দিবে। ইহাতেই অনেক সময় দান্ত হয়।

কুমি :—শিশুদের উদরে সাধারণতঃ দুই প্রকার কুমি দেখা যায়। গোল বড় কুমি হইলে ৫ বৎসরের শিশুকে রাডে ক্যালোমেই ল দুই গ্রেন ও সাল্টোনি ১/২

শিশুর অস্ত্রান্ত রোগ
গ্রেন মিশাইয়া খাইতে দিবে। পরদিন প্রাতে দান্ত সহ কুমি বাহির হইয়া বাইবে। সূতার মত কুমি

হইলে ৫ বৎসরের শিশুকে ক্যালোমেই ল দুই গ্রেন সহ জালাপিন এক গ্রেন খাইতে

দিবে। পরদিন দাঁড়ের পর লঘু পথ্য দিবে। ক্যালোমেল্ একটি বিবাক্ত ঔষধ, একেবারে দুই গ্রেণ না দিবা ২ গ্রেণ করিয়া ২ ঘণ্টা বাহ ৪ বার দেওয়া ভাল।

কান কট্‌কট্‌ করিলে :—শিশু কাদিতে থাকে ও হাত কানের নিকট লইয়া ধার। রাজে এই অন্ত্রুখে অনেক শিশু ঘুমাইতে পারে না। পান গরম করিয়া তাহার রস কানে দিলে উপকার হয়। অনেকে তৈল গরম করিয়া কানে ঢালিয়া দেন, কিন্তু বেশী গরম হইলে শিশুর বিষম বিপদ। ‘হাত সওয়া’ গরম হইলেই হইবে। ডাক্তারখানা হইতে কান কট্‌কটানির একটি ঔষধ ক্রয় করিয়া রাখা ভাল। কানে খইল হইলে, শিশুর কানে যেন কান-খুন্নি দেওয়া না হয়। খইল জমিলে শিশুর কোন বিপদ নাই জানিবে। কড়ে আঙ্গুলের দ্বারা কান বতদূর সাক্‌ হয় করিবে।

কানে পুঁথ হইলে :—বোরিক জলে তুলা ভিজাইয়া ধারাগি করিয়া ভালরূপে ধোয়াইয়া দিবে। পরে বোরিক গুঁড়া কানের মধ্যে দিয়া তুলা ঢাকিয়া রাখিবে। সাবধান না হইলে শিশু কালা হইতে পারে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিলে কানের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার হয়। এই ঔষধ জল মিশাইয়া দিবে।

ছেলের মুখে বা হইলে :—অপরিষ্কার থাকিবার জন্ত হইরাছে বুঝিতে হইবে। শিশুকে বোতলের ছখ খাওয়াইয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। বোতল ভাঙ্গ করিয়া ধুইবে। চারি মাসের শিশুর জন্ত সোডা বাইকার্‌ক তিন গ্রেণ—মিনে ছইবার খাইতে দিবে। একবার রেড্‌র তৈল খাইতে দিবে; দান্ত পরিষ্কার হইবে। বোরিক জলে লিণ্ট ভিজাইয়া মুখের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া দিবে। সোহাগার খই ও মধুতে মাড়িয়া, বা মিসিরিন ও সোহাগার মাড়িয়া কতস্থানে লাগাইয়া দিবে।

- ডিপ্‌থিরিয়া :—শিশুদের এই সংক্রামক রোগ হইতে দেখা যায়। অন্ন জর, লালাত্ব, খাইতে কষ্ট ও গলায় বা দেখিলেই ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। অল্প শিশুদের নিকট হইতে পৃথক্‌ ঘরে রাখিবে। সেই শিশুর কিছুক, চামচে,

পেরালা ইত্যাদি অল্প কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবে না। এই রোগে ডিপথিরিয়া প্রতিষেধক ইলেক্সন একমাত্র ঔষধ জানিবে।

হাম :—শিশুদের হাম হইলে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। হাম হইলেই ঔষধ খাওয়াইতে নাই, ইহা একটি ভুল ধারণা। বেশী সর্দিকাশি বা দান্ত হইলে ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে। কাসি হইলে ভাইনাম্ ইপিকাক্ দুই ফোঁটা ও সিরাপ টলু ত্রিশ ফোঁটা অল্প জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা বাদ শিশুকে খাইতে দিবে। আমাদের দেশে যে নিয়ম আছে, তাহা পালন করিবে। এটি ছোঁরাচে রোগ। এক ঘরে পৃথকভাবে শিশুকে রাখিবে। হাম হইলে, বিশেষ প্রয়োজন হইলেও অল্প বাড়ী শিশুকে পাঠাইবে না।

বসন্ত :—বসন্ত রোগ হইলে শিশুকে পৃথক রাখিবে। বালকদিগকে তাহার সহিত খেলিতে দিবে না। বসন্ত রোগে বিশেষ কোন ঔষধ দরকার হয় না। তবে যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে, বা কোনরূপ উপসর্গ দেখা যায়, তবে ডাক্তার ডাকিবে। বসন্ত রোগ দেখা দিলেই সকলে টকা দিবে।

হপিংকফ :—শিশুদের বড়ই কষ্টদায়ক। কাসিতে কাসিতে দমন আটকাইয়া যায়, পরে জোরে নিখাস টানিবার জন্য ছপ করিয়া একটি দীর্ঘ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শিশুকে গরম জলে স্নান করাইবে। গৃহ মধ্যে বাহাতে ভাল হাওয়া খেলে, এরূপ করিবে। গায়ে জামা দিবে কিন্তু যেন বেশী আঁট না হয়। ব্রোমাইড্ দুই গ্রেণ, ইপিকাক্ দুই ফোঁটা ও সিরাপ টলু ৩ ড্রাম মিশাইয়া তিন ঘণ্টা বাদ খাইতে দিবে। ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে। এই রোগে শিশু তিন মাস পর্যন্ত ভুগিতে পারে। ইহাও একটি ছোঁরাচে রোগ। অল্প ছেলের সহিত মিশিতে দিবে না।

কলেরা :—শিশু খুব পাতলা দান্ত করিলে সাবধান হইবে। যদি দান্ত “চাল-ধোওয়া” জলের মত হয়, তবে কলেরা সন্দেহ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বমি হইতে থাকে ও শিশু ছট্‌ফট্ করে। সালফিউরিক স্যাসিড ডাইলিউট পাচ ফোঁটা জলে মিশাইয়া দুই এক ঘণ্টা বাদে খাইতে দিবে। ডাক্তার মহাশয়কে

সংবাদ দিবে, ইহা বড়ই সাংবাদিক রোগ। চিকিৎসা করিতে বিলম্ব করিবে না। জল খাইতে দিবে। ডাবের জল, মোরোর জল তৃষ্ণা পাইলেই দিবে।

ছোঁয়াচে রোগ—এক জনের কোন রোগ হইলে যদি স্পর্শ করিলে অপরের সেই রোগ হয়, তাহাকে ছোঁয়াচে রোগ বলে; আমাদের দেশে ছোঁয়াচে রোগের মধ্যে হাম, বসন্ত, হুপিংকাসি, ডিপ্‌থিরিয়া প্রধান। হাম বা বসন্ত হইলে যে মা শীতলার অমুগ্রহ হইয়াছে বলিয়া একটি পৃথক ঘরে রোগীকে রাখা হয়, তাহা বড়ই ভাল প্রথা জানিবে। সেই ঘরে শিশুর মাতা বাতীত আর কাহারও যাওয়া উচিত নয়। যিনি রোগীর সেবা করিবেন, তিনিই কেবল সেই ঘরে যাইবেন। তিনি সংসারের আর কোন কাজ করিবেন না ও কিছু ছুঁইবেন না। অল্প বালক-বালিকাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিবেন। বাতীতে বা পাড়াতে বসন্ত হইলে সকলকে ঢাকা দিবে। ছোঁয়াচে রোগ সারিয়া গেলেও ১৫ দিন রোগীকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হাম বা বসন্তের ষত দিন সমস্ত মামড়ী উঠিয়া না যায় এবং শরীর সুস্থ না হয়, তত দিন সেই রোগীকে কাহারও সচিৎ মিশিতে দিবে না। “হুপিং কাসি” হইলে কমিয়া যাওয়ার পর দুই মাস সাবধানে রাখিবে। ডিপ্‌থিরিয়া সারিয়া গেলেও দুই সপ্তাহ শিশুকে সাবধানে রাখিবে। তাহার মাতা যদি তাহাকে মাই দেন, সেই মাই অল্প কোন ছেলেকে চুষিতে দিবেন না। বালক-বালিকাদিগকে শিখাইবেন, যেন, কেহ কাহারও পেল্লিল লইয়া মুখে না দেয়। টাইফইড্‌জর সারিয়া বাইবার এক মাস পর পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর ঔষধ

ধোকার একটু অম্ল হইলেই তাহার মা মনে করেন, ঔষধ দেওয়া উচিত। এটি ভুল ধারণা। অনেক সময়ে দেখা যায়, বিনা ঔষধেও শিশু আরাম হয়।

যদিই ঔষধ দিতে হয়, ঔষধ বাহাতে খাইতে ভাল লাগে, এইরূপ ভাবে দেওয়া উচিত। মধু বা চিনির রসে (সিরাপ) ঔষধ দিলে শিশু বেশ খায়। অমুকের
 ঔষধ ছেলের এই অসুখ হইয়াছিল, অমুক ঔষধ খাইয়া আরাম
 হইয়াছিল, এইরূপ কোন প্রতিবাসীর নিকট শুনিয়া
 ছেলেকে ঔষধ খাওয়ান ঠিক নহে, ইহাতে অনেক বিপদ হইতে পারে। ঔষধের
 মাত্রা ঠিক করিয়া খাওয়ান বিশেষ প্রয়োজন এবং সেই কারণে চিকিৎসকের
 উপদেশমত চলাই উচিত। যদি নিকটে কোন চিকিৎসক না পাওয়া যায়,
 তাহা হইলে গুটিকয়েক ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, নিম্নে লিখিতেছি।

ঔষধ তৈয়ারি করার জন্য ২টা কাঁচের মাপের মাস চাই। একটি ছোট ফোঁটা বা মিনিম
 মাস, আর একটি বড় আউল মাস। ৬০ মিঃ ফোঁটায় ১ ড্রাম, ৮ ড্রামে ১ আঃ।

চা পাইবার ছোট চামচে (Tea-spoon) এক ড্রাম ধরে। মাঝারি চামচে (Table spoon)
 দুই ড্রাম ধরে। বড় চামচে (Dessert-spoon) চার ড্রাম বা আধ আউল ধরে। এক
 আউল অর্ধ ছটাকের সমান। এক পাইটে দেড় পোরা হয়। এক পাইট আর আধসের
 ভানিবে। গুঁড়া ঔষধ খাওয়াইতে হইলে, আঙ্গুলের ডগা জিআইয়া গুঁড়া ঔষধ তুলিবে, এবং
 শিশুর জিহ্বাতে বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে।

জননী মপের সুবিধার জন্য গুটিকতক ঔষধের বিবরণ লিখিলাম।

একোনাইট টিং :—মাঝা অর্ধ হইতে এক ফোঁটা। শিশুর অর হইলে, পা গরম, বসন্তে ও
 নাড়ী চকল হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে। কিন্তু ইহা একটি বিষাক্ত ঔষধ। ছেলের বরস
 এক বৎসর না হইলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কখনই ব্যবহার করিবে না। এই ঔষধ
 ৫৬ বার খাওয়াইবার পর বন্ধ করিয়া দিবে।

ত্রাণ্ডি :—শিশু হঠাৎ বমি বা পেটের অংশে নিশ্বেজ হইয়া পড়িলে দশ ফোঁটা ৫ জন জলের
 সহিত মিশাইয়া দুই ঘণ্টা বাদ তিনবার খাইতে দিবে। দীর্ঘ উট্টবার সময় ইহা শিশুকে খাওয়ার
 বাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না।

সোডা-বাইকার্ব :—অর হইলে শিশুদ্বিগুণে ইহা খাইতে দিবে। চর মাসের শিশুকে
 একটা আনির উপর বসটা সোডা ধরে, খাইতে দিবে। প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় যদি শিশু
 কাঁদে বা বেখানে প্রস্রাব ত্যাগ করে, সেইখানে সাবা ধাপ ধরে, তাহা হইলে এই ঔষধ দিলে
 তিনবার দিবে।

সোহাগার খই মধুরসহিত মাড়িয়া জিহ্বা বা মুখে যা হইলে লাগাইবে। এক আঃ সোহাগার চার আঃ গ্লিসিরিন মিশাইবে, এবং শিশুর পেটের অহুত হইলে ইহা দশ বা বিশ ফোঁটা জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

পটাণ ব্রোমাইড্ :—দুই গ্রেণ মাত্রার শিশুর দাঁত উঠিবার সময় দেওয়া যায়। সিরাপে মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। তিন মাসের শিশুর এই মাত্রা জানিবে। দুই বৎসরের বালককে যুম পাড়াইবার দরকার হইলে, বা যাহারা যুমাইয়া কঁদে বা বকে, তাহাদের অল্প পাঁচ গ্রেণ শুইবার সময় খাওয়াইয়া দিলে বেশ হুনিয়া হয়।

রেড্ডির তৈল :—তিন মাসের ছেলের অল্প অর্ধ চামচ (Table-spoon) তৈল খাওয়াইবে। অল্পিত অয়েল কিংবা গ্লিসিরিন শিশুকে এক ছোট চামচ (Tea-spoon) খাওয়াইলে বেশ বাড়ে হয়।

গড়ির ভুঁড়া :—এ্যারোমেটিক্ চক্ পাউডার নামে এই ঔষধ, টকগন্ধযুক্ত দান্ত হইলে ছয় মাসের শিশুকে পাঁচ গ্রেণ মাত্রার চার ঘণ্টা বাদ খাইতে দিবে।

কডলিভার অয়েল :—ইহা শিশুদিগের পক্ষে একটি পান্যবিশেষ। শিশু রোগা ও দুর্বল হইতে থাকিলে ইহা খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। তিন মাসের শিশুকে আঙ্গুলে করিয়া এই ঔষধ চুষিতে দিবে। এক বৎসরের শিশুকে ছোট চামচের (Tea-spoon) এক চামচ তৈল মিশে দুইবার খাইতে দিবে; কিছু খাইবার পর ইহা দেওয়া উচিত। ক্রমে যত বয়স বাড়িবে, মাত্রাও তত বাড়াইতে হইবে। কেপলার মল্ট এক্সট্রাক্ট শিশুদিগের পক্ষে ব্যবহার করা হুবিধানক।

ভিল গুয়াটার বা মৌরীর অল ও পিপারমেন্ট্ ওল :—শিশুর পেট কামড়াইলে বা কঁপিয়া উঠিলে এক চামচ এই সব জলে গরম জল মিশাইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

গ্লিসিরিন্ :—শুইবার সময় এক চামচ খাওয়াইয়া দিলে শিশুর দাঁত খোলসা হয়। দান্ত না হইলে পিচকারী করিয়া চার ড্রাম গ্লিসিরিন্ অল্প গরম জলে মিশাইয়া মলছারে পিচকারী দিবে। পাঁচ মিনিট মধ্যে দাঁত হইবে। সাবানের কাটি করিয়া বা পুরাতন তেঁতুল মলছারে দিলেও দাঁত হয়।

ইপিকাক্ ওয়াইন্ :—কাসি হইলে ইহা বিশেষ উপকার কবে। ২১০ ফোঁটা দুই ঘণ্টা অন্তর দিলে কাসি বেশ সরল হয় ও উঠিয়া যায়। বেশী মাত্রার দিলে বমি হয়। সেজন্য হঠাৎ বমি করাইতে হইলে (যেমন হপিং ককে বৃকে বেশী সর্দি বসিলে বা অধিক আহার করিলে) ইহা বিশেষ উপকারী।

কালমেঘ :—ছেলেদের পেটে লিভার বড় হইলে কালমেঘ পাতার রস খাইতে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে শিশুদের লিভার বড় হইলে মেয়েরা “আলুই” • করিয়া খাইতে দেন। ইহা বিশেষ উপকারী।

ম্যানা :—শিশুদের দাঁত কঠিন হইলে ইহা ব্যবহার করিবে। বড় চামচের এক চামচ হিসাবে দুধের সহিত খাওয়ান খাইতে পারে।

এই সকল ঔষধ ছাড়া অস্ত্র ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ব্যাধ-প্রয়োগের জন্ত নিম্নের কথাগুলি মনে রাখা কর্তব্য। ছেলেদের রিষ্টার দিবে না। লিনিমেন্ট আইডিনও ডাক্তারের পরামর্শমত ব্যবহার করিবে।

কম্প্রেস :—লিট বা করসা নরম নেকড়া জলে বা কোনও ঔষধস্রব্যে ভিজাইয়া নিংড়াইবে। পরে তাহা যেখানে দিতে হইবে, তাহার লাগাইবে। তাহার উপর এক পণ্ড অয়েল সিক দ্বারা ঢাকিয়া পটি বাঁধিয়া দিবে। অবস্থাবিশেষে শীতল ও গরম জল ব্যবহার করিবে।

বোরিক কম্প্রেস :—ছেলেদের কোঁড়া বা ক্ষতে বোরিক কম্প্রেস বিশেষ উপকারী। বোরিক এসিড গরম জলে গুলিয়া লিট দ্বারা সেক দিবে, পরে লিটখানি চাপিয়া তাহার উপর অয়েল সিক দিয়া বাঁধিয়া দিবে, ইহা বিশেষ উপকারী। পেটের উপর গরম জলে এইরূপ কম্প্রেস দিলে দাঁত পরিষ্কার হয়।

মালিস :—ছেলেদের চামড়া বড়ই নরম। সেই জন্ত তেজাল মালিস ভাল নয়, কোঁড়া হইতে পারে। সরিষার তৈলে কপূর দিয়া অথবা তৈল বা সাবানের মালিস ভাল। আন্তে আন্তে ছেলেদের গায়ে মালিস করিতে হয়।

মলম :—টোট বা গা কাটিয়া গেলে হেজলিন্ ক্রিম বা ভিনোলিয়া শিশুদের গায়ে ব্যবহার করা ভাল। তেসলিন্ সন্ডা ও উপকারী। কোনরূপ ক্ষত বা ঘাের জন্ত “ভক্সনোপূর টার মেডিকেল হল” এল্ডত “হিলিং অয়েন্টমেন্ট” বিশেষ উপকারী।

পুলটিস :—তিসি বা পাঁউরটির পুলটিস ভাল। একেবারে গরম গরম দিবে না। সাবধান, যেন গা পুড়িয়া না যায়। পুলটিস ঠাণ্ডা হইয়া গেলে আর রাখা উচিত নয়, উহা তুলিয়া ভাল

কালমেঘের পাতা দুই তোলা, ঘোয়ান, রাধুনী, বড় এলাইচ, লবঙ্গ এইগুলি একত্রে কট দুই আনা পরিমাণে একত্রে বাটিয়া বড়ী করিবে, সেই বড়ী পাথর-বাটিতে জল দিয়া ঘসিয়া এক রতি পরিমাণে একটু মধুসহ এক বৎসর বয়স পর্যন্ত বালককে দিনে দুইবার খাইতে দিবে, ইহাতে জ্বর লিভারের দোষ নষ্ট করে। ইহাই আলুই।

কবিরাজ শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত কাব্যবিনোদ।

করিয়া দুটাইয়া তুলা দিয়া বাধিয়া দিবে। কেহ কেহ পল্টিসের সহিত সরিষার গুঁড়া মিশাইয়া দেয়। এইরূপ পল্টিস শীতাই উঠাইয়া লওয়া উচিত। নতুবা দেয়া হইলে কোথা হইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

আকস্মিক বিপদ

বালক বালিকায়া প্রায়ই ছুরি ও কাঁচি লইয়া খেলা করে ও নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলে। চঠাৎ কোন আয়গা কাটিয়া গেলে তখনই পরিষ্কার জলে ধুইয়া

ফেলিবে। একটু ট্যানিক্ এসিডিড লাগাইয়া দিবে ও
কাটিয়া গেলে

ফরসা ভাকড়া দ্বারা বাধিয়া দিবে। বেশী রক্ত বাতির হইলে, ক্ষতস্থানে তুলা, কুমাল বা স্ত্রাকড়া বা অজুলির চাপ দিবে। তাহাতেও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে ক্ষতের উপরদিকে দড়ি বা কুমাল দ্বারা সজোরে বাধিয়া দিবে, এবং ডাক্তার মহাশয়কে সংবাদ দিবে।

দগ্ধ হইলে :—গরম দুধ, জল বা প্রদীপের শিখা দ্বারা দগ্ধ হওয়া সম্ভব। ছেলেরা দিরাশালাই লইয়া খেলা করে। তাহাতেও অনেক সময় বিপদ হয়। ছেলেদের জামা বা কাপড়ে আগুন লাগিলে তখনই তাহাকে শোরাইয়া ফেলিবে, এবং তোষক, কঞ্চল প্রভৃতি দ্বারা চাপ দিলে আগুন নিবিয়া বাইবে। কিছু না পাইলে নিজেই তাহাকে চাপা দিবে বা মেজের উপরে গড়াগড়ি দেওয়াইবে। দগ্ধস্থানে মসিনার তৈল, নারিকেল তৈল বা অলিভ তৈল দিবে। চূণের তল ও মসিনার তৈল সমানভাবে মিশাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। তৎপরে তুলা দিয়া বাধিয়া দিবে। বেশী বাতনা হইলে সোডা জলে শুলিয়া লাগাইবে। অথবা বোরিক্ অক্সেটমেন্ট ও ইউক্যালিপ্টস্ তৈল দিয়া বাধিয়া দিবে। শাইবার অস্ত্র গরম দুধ ও একটু ত্র্যাণ্ডি দিবে।

শিরাল, কুকুর বা সাপে কামড়াইলে :—ক্ষতস্থান চুবিয়া লইতে পারিলে

ভাল হয়। বাহার দাঁত পান্ধে নয় বা মুখে কোন বা নাই, এইরূপ কেহ চুবিলে কোন বিপদ হওয়ার ভয় নাই। কতস্থানের উপরে একটি নৃত্য বা দড়ির তাগা বাঁধবে। কতস্থান ছুরী দ্বারা একটু চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবে, তাহার পর একটু পটাস্ পারমাংগানেটু লাগাইয়া দিবে।

বিষাক্ত দংশন

বোলতা, মোমাছি ছল ফুটাইলে :—বাতনা বিষম হয়। হলটি উঠাইয়া কোলেবে, এমোনিয়া বা সোডাসল্‌ভা, স্লিয়ারিন্ বা সাবান লাগাইবে। কঠিন পদার্থ দ্বারা ব্যথার চারিধারে চাপ দিবে।

বিছা কামড়াইলে বড় বাতনা হয়। এমোনিয়া লাগাইলে ব্যথা কমিয়া যায়। খেঁত হইলে, কামড়া ছিঁড়িয়া বাইতে পারে বা নাও পারে। অনেক সময়ে কালশিরা পড়িয়া যায়, ফুলিয়া উঠে ও ব্যথা হয়। খেঁত হইলে শীতল জলের পটি বা বরফ লাগাইবে। অডিকলন লাগাইয়া বাঁধিয়া দিবে।

মচ্কাইলে :—বেশী নাড়াচাড়া করা অসুচিত। গরমজলে লবণ দিয়া জল সেক দিবে। ব্যথা কমিলে কোনওরূপ মালিস দিবে। “পেন কিলার” ব্যবহার করা উচিত। ছেলেদের হাত ধরিয়া বা মাথা ধরিয়া উচু করিবে না, কেন না, তাহাতে হাড়ের জোড়গুলি মচ্কাইয়া বাইতে পারে।

মচ্কাইলে

হাড় মচ্কাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে :—শিশু বাতনার কাদিতে থাকে—সেই হাড় নাড়িলে বাতনা বাড়িয়া উঠে। এইরূপ হইলে বাহাতে শিশুর বাতনা যায়, এরূপ ভাবে হাত বা পা অল্প হাত বা পায়ের সহিত বাঁধিয়া চিকিৎসককে খবর দিবে বা হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবে। টেগাঙ্কি বা মোটা কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে।

কানে পুঁতি, কলাই বা পোকা ইত্যাদি বাইলে :—একেবারে ডাক্তারকে সংবাদ দিবে। সোদা দ্বারা বাহির করিবার চেষ্টা করিবে না; তাহাতে কানে

বানাকে যা হয় ও শেষে বিশেষ বিশদ হইতে পারে। কানে পুঁতি বাইলে, পিচকারী করিয়া আন্তে আন্তে গরম জল দিলে পুঁতি বাহির হইয়া আসে। এই নাকে বা কাণে কিছু ঢুকিলে রূপে আটটি পুঁতি আমি একজন শিশুর কান হইতে বাহির করিয়াছিলাম। জল লাগিলে কলাই ফুলিয়া উঠে; সুতরাং বেক্রমে সম্ভব, তখনই বাহির করিবে।

নাকের মধ্যে কোনও জিনিষ বাইলে :—ভাল নাকে একরূপভাবে পিচকারী করিয়া জল প্রবেশ করাইয়া দিবে যে, যেন অপর নাকের মধ্যে যে জিনিষ আছে, জলের সহিত তাহা বাহির হইয়া আসে। খুব ছোট জিনিষ হইলে নাকের পশ্চাত্তাগ দিয়া গলার মধ্যে পড়িতে পারে। মটর হইলে পিচকারী দিলে ফুলিয়া উঠে। সুতরাং পরে বাহির করা বাইবে বলিয়া রাখিয়া দিবে না।

চক্ষু কিছু পড়িলে :—ধূলি বা পোকা পড়িলে কাগজের বা কুমালের কোণ পাকাইয়া বাহির করিবে। উকজলের ধারা দিবে। যদি বাধা বলে, এক চক্ষে পড়িলে কোঁটা রেড়ীর তৈল দিবে ও শীতল জলের পটি বাধিবে।

কোন জিনিষ গলায় আটকাইলে :—ছেলেরা অনেক সময় পরসী, বোতাম, খেলনা খাইয়া ফেলে। বড় কুটির টুকরা গলায় আটকাইলে, আঙ্গুল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। যদি না পার, গলায় আটকাইলে হাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, পা ধরিয়া ছেলের মাথা নীচের দিকে করিয়া ধরিবে, পিঠে চড় দিবে। পেটের মধ্যে গেলে বিশেষ কিছু করিবে না। বাহ্যের অস্ত্র রেড়ীর তৈল দিবে না। দুধ ও পাউরুটি খাইতে দিবে। গলায় মাছের কাঁটা ফুটিলে আঙ্গুল দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। ভাতের ডেলা করিয়া খাইতে দিবে।

বিষাক্ত হইলে :—অনেক খেলনার লাল বা লাল রং মাখান থাকে ; বেশালাই-কাটিতে বিষ মাখান থাকে। রং-করা বিষাক্ত কিছু খাইলে কাগজ খাইলেও বিষ-ক্রিয়া দেখা যায়। লবণ-জল

খাইতে দিবে। কিংবা সরিষার গুঁড়া গরম জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। ছেলে বাহাতে বমি করে এরূপ করিবে এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিবে।

জলে ডুবিলে :—জলমগ্ন হইলে ছেলেরা অন্ন সময়ের মধ্যে মারা যায়। সুতরাং তখনই জল হইতে উঠাইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। পাঁচ মিনিটের বেশী জলে ডুবিয়া থাকিলে বাঁচা সুকঠিন; কিন্তু বিশেষ যত্ন করিতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। প্রথমতঃ মুখের মধ্যে হইতে জল বাহির করিতে হইবে। অন্ন সময়ের অন্ত পা উঁচু ও মাথা নীচু করিয়া, ছেলেটিকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে।

মুখ যেন হাঁ করা থাকে এবং জিব একটু টানিয়া বাহির করিবে। তৎপরে চিৎ করিয়া রাখিবে। ছেলেটির হৃৎপিণ্ড বাহু ধরিয়া একবার মাথার পাশে রাখ, আবার নামাইয়া বুক ও পেটের পাশে অন্ন চাপিয়া ধর। এইরূপ এক ঘণ্টা চেষ্টা করিবে। গরম জল বোতলে পুরিয়া গা ঘষিয়া দেহ গরম করিবে। এ্যামোনিয়া শুঁকাইবে, ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিবে।

ঔষধের তালিকা :—চিকিৎসার অন্ত যে সুন্দর ঔষধ প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

নাম	মাত্রা
টিং একোনাইট্ (Tincture Aconite)	২ হইতে ১ ফোঁটা
ব্রান্ডি (Brandy)	১০ ফোঁটা
সোডা-বাইকার্ব্ (Soda Bicarb)	৫—১০ গ্রেণ
পটাস্ ব্রোমাইড্ (Potash Bromide)	২—৫ গ্রেণ
রেড্ডীর তৈল (Castor oil)	১—৫ ড্রাম
কড্‌লিভার অয়েল (Cod-liver oil)	২—১ ড্রাম
বোঁরীর জল (Aqua anethi or Dill water)	১—২ ড্রাম
গ্লিসারিন্ (Glycerine)	১—২ ড্রাম
ইপিকাক্-ওয়ারিন্ (Vinum Ipecac)	২—৫ ফোঁটা
কালমেগ (Ext. Kalmeghe Liq)	৫—১০ ফোঁটা

নাম	মাত্রা	নাম	মাত্রা
ম্যানা (Manna)	১—২ ড্রাম	ক্যালোমেল (Calomel)	½—২ ড্রাম
স্যান্টোনিম (Santonine)	½—১ গ্রেণ	অলিভ অয়েল (Olive oil)	১—২ ড্রাম

বাহিরের প্রয়োগের মন্ত্র :—

বোরিক এসিড (শুঁড়)—Boric Acid.	বোরিক মলম—Boric Ointment.
পেন কিলার—Pain Killer.	হিলিং ওয়েন্টেমেন্ট—Healing Ointment.
নারিকেল-তৈল—Cocoanut oil.	সরিষার তৈল—Mustured oil,

কত বাঁধবার মন্ত্র :—

গাশের চটা, ঘোটা কাগজ—Splints.	বোরিক লিট—Boric Lint.
বোরিক তুলা—Boric cotton.	বোরিক গজ—Boric Gauge.
অয়েল সিক—Oil Silk.	বান্ডেজ—Bandage.

এই সমস্ত ঔষধ ভবানীপুর ১৫০ নং হরিশ মুখার্জি রোড, টায় মেডিক্যাল হলে এবং অন্যান্য
তাল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

গৃহ-চিকিৎসা (২)

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

কলিকাতার উত্তর বিভাগের অন্যতম সর্বপ্রধান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট কর্তৃক এই পুস্তকের মন্ত্র লিখিত।

(যে যে লক্ষণ প্রকাশ হইলে যে যে ঔষধ উপযোগী,

তাহা নিয়ে স্মৃতিত হইল)

১। জ্বর

১। শুষ্ক ও শীতল বাতাস লাগা, গাত্র ভিঁজা ; ঠাণ্ডা লাগা ও ভয় পাওয়া
হেতু জ্বর। তরুণ জ্বর, অস্থিরতা, তৃষ্ণা, শুষ্ক ও তাপ, গাত্র জ্বালা, কাসি,

তরুণ জ্বর

মাথা বেদনা, তিক্ত বমন, কৌকান, খিটখিটে
স্বভাব। প্রস্রাব লাল ও অল্প অনিষ্ট। ঔষধ—
একোনাইট ৬শ।

২। মুখ চোখ রক্তবর্ণ, মুখ শুষ্ক, গিলিতে কষ্ট, অনিদ্রা, হঠাৎ চম্কে উঠা,

অজ্ঞানাবস্থা, বিড় বিড় ক'রে বকা, চোঁচান এবং কনতালসন, তুলবকা, আলোক
 অসহ, বিছানা হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা,
 তুল বকা
 অত্যন্ত মাথা বেদনা, গারে চিট্‌চিটে ঘাম, টুক বা তিক্ত
 বমন, পাতলা সবুজ মল, পেট ফাঁপা, প্রেশার অন্ন, অস্থিরতা, গা গরম, কিন্তু পা
 ঠাণ্ডা। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৩। বেলা বারটার পর কম্প দিয়া অন্ন, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু একটু অন্ন
 খাওয়া, গায়ের জ্বালায় শরীর জলিয়া যাওয়া; অত্যন্ত অস্থিরতা; পেট জ্বালা;
 টুক জ্বালা খাইতে ইচ্ছা; অত্যন্ত হর্ষলতা; পেটে
 কম্পজ্বর
 মীহা থাকা; দুর্গন্ধযুক্ত অলবৎ মল; মুখ ফুলো ও
 কাকাকশে বর্ণ, নাড়ী অত্যন্ত হর্ষল। ঔষধ—আর্সেনিক ৩০শ।

৪। ছাড়িয়া ছাড়িয়া অন্ন হওয়া; একদিন অন্তর একদিন জ্বরের বৃদ্ধি;
 দিবাভাগে অন্ন হওয়া; সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া শীত। অন্ন খাইলে শীত বৃদ্ধি;
 ছাড়িয়া ছাড়িয়া অন্ন
 হাত পা ঠাণ্ডা, তাপাবস্থার তৃষ্ণা না থাকা, পাত-
 জ্বালা, মুখ ঠোঁট শুষ্ক, অত্যন্ত দুখা, বর্ণাবস্থার তৃষ্ণা;
 ঘুম ঘুম ভাব; নড়াচড়াতে বর্ষ; বর্ষের পর হর্ষল বোধ, কান ভৌঁ ভৌঁ করা,
 তিক্ত বমন, অক্লি, মীহা বৃদ্ধি, প্রেশার বোলা, উদরায়ন, মলে আন্ত জিনিস
 থাকা। বুক ধড়্‌কড়ানি, ম্যালেরিয়ার অন্ন, রায়ে বর্ষ, মাথা বেদনা। ঔষধ—
 চায়না ৩০শ।

৫। রেমিটেন্ট অন্ন; ঐশ্যকালের পীড়া, পিত্তপ্রধান ঠাণ্ড, শিরঃপীড়া,
 শুষ্ক কাসি, কাসিতে বন্ধ বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কোষ্ঠ বন্ধ, গা বমি বমি,
 রেমিটেন্ট অন্ন
 চূপ করিয়া পড়িয়া থাকা, নড়া-চড়ায় রোগের বৃদ্ধি,
 মুখ তিক্ত, ডিলিরিয়ম, বিষয়-কর্মের কথা বলা, সমস্ত
 শরীরে বেদনা। ঔষধ—ব্রাইয়োনিয়া ৩০শ।

৬। বালকদিগের রেমিটেন্ট অন্ন। পাকস্থলীর গোলবোগ হেতু পীড়া।
 বমন, অক্লি, পেটে বেদনা, উদরায়ন, অথবা কোষ্ঠবন্ধ। জিহ্বা শুষ্ক হওয়ার

সাদা কোটিং যুক্ত ; খিটুখিটে স্বভাব। খাবার একটু গোলযোগ হেতু অর হওয়া।
অন্ন-বেগাপন্ন অর। শিশু এত খিটুখিটে যে, তাকাইলে চটিয়া যায়। বমনেচ্ছা।
ঔষধ—এন্টিমুক্ত ৬শ।

৭। জলে ভিজা হেতু পীড়া। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মুখ চোখ টস্ টস্ ভাব। শ্রেণর
অর। অস্থিরতা। সিক্ত স্থানে বাস হেতু পীড়া। উত্তাপ এত বেশী যে, মনে হয়,
কলে ভিজা প্রকৃতি কারণে শিরার ভিতর গরম জল চলিতেছে। গায়ে আম-বাত
বাহির হওয়া। অরুঁটো হওয়া। জিহবার অগ্রভাগ
লাল। নিদ্রাবস্থার অসাড়ে মলতাগ, অন্নবিরাম অর। পৃষ্ঠ, ষাড়, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা।
কঠিন স্থানে শয়ন করিলে উপশম। অজ্ঞানতা। ডিলিরিয়াম। শিরঃপীড়া।
ঔষধ—রসটক্স ৩০শ।

৮। দ্রুত ও তৈলাদিবৃক্ক আহার হেতু পীড়া। মংস্ত ও মাংস আহার জন্ত
পীড়া। পরিবর্তনশীল পীড়া। অত্যন্ত কুইনাইন্ বাবহার করার পর পীড়া। নম্র
স্বভাব, ভয় ও ক্রন্দন-শীলতা। বেলা দুই তিনটার
মুতাদি আহারের কলে সময় হাত ও পা ঠাণ্ডা হইয়া অর আসা। একটু
একটু শীত করিয়া অর আসা। তৃষ্ণাভাব। স্ত্রীলোকদিগের পীড়ার বিশেষ
উপকারী। মুখ তিক্ত। তিক্ত বমন। পিত্তবৃক্ক মল রাত্রে বৃদ্ধি। বেদনাবৃক্ক
শ্রীহা, রক্তবক্ক। মুখে চূর্ণক্ক। ঔষধ—পালসেটিলা ৩০শ।

৯। ম্যালেরিয়ার অর। অর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসা। বেলা আটটা
নয়টার মধ্যে অর আসা। হাড়-গোড়-ভাল কম্পঅর। কম্পের সময় তৃষ্ণা।
ম্যালেরিয়া তাপাবস্থার পিত্ত বমন। পিত্ত-জনিত অর। পিত্ত
ভেদ। একদিন প্রাতে ও অন্য দিন বারটার অর
আসা। ঔষধ—ইউপেটোরিয়াম ৩শ।

১০। খাত-খেতে শিশু কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চার। পেটের অস্থখ-
বৃক্ক অর। নিদ্রার চমকে উঠা। বিজর অবস্থা প্রার
অত্যন্ত উপসর্গবৃক্ক অর হয় না। পেট কঁপা। কৌতান। বমি করা।

দুখে হুগুঙ্ক। কাসি। শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময় বিশেষ উপকারী। ঔষধ—
ক্যামোমিলা ৩০শ।

১১। কুইনাইন্ আটকান অর। সর্বদা গা বমি বমি। কেনাযুক্ত শেঙলার
তায় উদরাময়। আহায়ে অনিচ্ছা। গলা বড় বড়ানিযুক্ত কাসি। লাল রক্তস্রাব।
ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

১২। কুইনাইন্ ব্যবহারের ফলে অল্প সময় কর না আসিয়া বেলা দশটা
এগারটার শীত করিয়া অর আসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অরুঠো থাকে, অরের সঙ্গে সঙ্গে
মাথার বম্মণার বৃদ্ধি। তৃষ্ণা। মূন্ খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা। শরীর শীর্ণ।
ঔষধ—ক্রাটাম-মিউ ৩০শ।

১৩। ককপ্রধান ষাতু। মাথা ও পেট বড় এমন শিশু। দীর্ঘ উঠিবার
সময় পীড়া। মাথার ঘর্ম। টক্গন্ধযুক্ত সাদা মল। কোষ্ঠবদ্ধ। দীর্ঘ উঠার
সময় শিশুদিগের বস্তুতের দোষ। মাথা গরম। হাত পা ঠাণ্ডা। ঔষধ—ক্যাল-
কেরিয়া কার্ক ৩০শ।

২। রক্তামাশা

পেটটি ক্রানেল দ্বারা বাধিয়া রাখা উচিত। দরকার হইলে পুলটাস দিতে
পারা যায়।

১। প্রথমাবস্থায় অরসহ আমাশা, পেটে বাধা, অত্যন্ত পিপাসা ও রক্ত
রোগের বিবিধ উপসর্গ বাহ্যে, নাড়ীর প্রবল বেগ। ঔষধ—একোনাইট ৩শ।

২। অর, বম্মণাদায়ক কৌথ, তাহার সহিত শরীর কাঁপিয়া উঠা, মূখ চোখ
লাল, মাথার বম্মণা, পেটে এত বেদনা যে, হাত দিতে দেয় না। অনিদ্রা, মূখের
ভিতর শুষ্ক। সবুজবর্ণ রক্তাক্ত আমযুক্ত মল। ঔষধ—বেলেডোনা ৬শ।

৩। অরস্তাব, সাদা বা রক্তাক্ত আম, নিয়ত বৃথা মলত্যাগের চেষ্টা, কৌথ
বা বমি, নাড়ীর স্থানে বাধা, বম্মণানের পর পীড়া। ঔষধ—নক্সটমিকা ৩০শ।

৪। রক্তমিশ্রিত মল, কৌথ নাড়ির স্থানে মোছড়ান বাধা; চাপিলে ও
সাবনে ঝিকিলে উপশম। ঔষধ—ক্যালোসিন্থ ৩০শ।

৫। শরৎকালের আমাশা, খাড়ের গন্ধে অসহিষ্ণুতা, বমনের উষেগ, বাহ্যের সহিত উকি বা বমন, কাঁচা ও অন্নকল খাইয়া আমাশা, রক্তাক্ত মল ও চক্চকে আম। ঔষধ—কলচিকম্ ৬শ।

৬। পেটে বেদনা, কুহন, ফেনাযুক্ত কালপানি সব্জবর্ণবিশিষ্ট রক্তাক্ত মল ও আম, সর্ষপা গা বমি বমি, বমন, তৃষ্ণা-শূন্যতা, মলত্যাগের পর পেট-বেদনা ও কুহন। ঔষধ—ইলিকাক ৬শ।

৭। মল রক্তময় সব্জপানি, মিউকাসযুক্ত, শ্লেষ্মাবৎ। অনেককণ পায়-
খানা বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা ও অত্যন্ত কৌণ দেওয়া। ঔষধ—মার্কসল ৩০শ।

৮। পুনঃ পুনঃ, অন্ন অন্ন, রক্তময় আম, পেট-বেদনা ও কুহন। নাভির চতুর্দিকে বেদনা। অন্ন অন্ন প্রস্রাব। জর। শুধু আম ও রক্ত বাহ্যে। ঔষধ—
মার্কসল ৩০শ।

৯। হলুদ, সাদা, লালপানি আম; তাহার মধ্যে রক্তের রেখা। সাদা-
পানি বা হলুদপানি কোটিং-যুক্ত জিহ্বা। মুখ তিক্ত, তৃষ্ণা না থাকা। রাত্রিতে
বৃদ্ধি। অত্যন্ত কুহন বেগ। ঔষধ—পালসেটিলা ৬শ।

১০। মলত্যাগের পূর্বে পেট বেদনা, পরে কুহন। সাদা আমের মধ্যে রক্তের
রেখা, সব্জপানি আম-যুক্ত মল। চর্মরোগ বসিয়া গিয়া পীড়া। প্রাতে ঘুম
ভাঙ্গিয়া উঠিবামাত্রই পাইখানায় দৌড়ান। রক্ত, আম, পুঁর্ব পড়া। পেটে
স্নেহ দিলে উপশম বোধ। রোগ সারিয়া একটু কোহর থাকা। ঔষধ—
সালকর ৩০শ।

পথ্য।—পীড়ার বাড়িবাড়ি অবস্থার বালী কিংবা এয়াকট ভাল জলে সিদ্ধ
করিয়া মিহরি বা লবণ সহ খাইতে দিবেন। (বালী অন্ততঃ এক ঘন্টা সিদ্ধ

হওয়া চাই)। বাহ্যে বাহ্যে কম, জর না থাকা

পথ্যাদি

অবস্থার ছাগ-হৃৎ, বালী কিংবা এয়াকটের সহিত
খাইতে দেওয়া যায়। বোল এ রোগের একটা হুপথ্য, কিন্তু জর বেশী থাকিলে
নিষিদ্ধ। পুরাতন রোগে, পোয়ের ভাত হুপথ্য। বেদনা কিংবা ডালিমের রস

দেওয়া যায়। কচি বেল পোড়াইয়া মিছরি কিংবা চিনি সহ খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

৩। উদরাময়

১। শিশুদের পিত্তভেদের সঙ্গে পেটবেদনা ও অস্থিরতা। জলবৎ কাল, সেওয়ার মত সবুজবর্ণ মল। মলত্যাগের পূর্বে পেটে কষ্টজনক বেদনা, মলত্যাগের সময় পেট বেদনা। ভয়, ক্রোধ ও ঘর্ম বন্ধ হেতু বিবিধ লক্ষণ পীড়া। পিপাসা। ঔষধ—একোনাইট ৩শ।

২। জলবৎ বহু পরিমাণ মল, জিহ্বায় সাদা কোটিং। তিক্ত পিত্তময় শ্লেষ্মা-বমন। আহার ও পানের পর বৃদ্ধি। ঔষধ—এটিমুজুড ৬শ।

৩। মল ঘন, সবুজবর্ণবিশিষ্ট গাঢ় মিউকাস, কটা কিংবা কালবর্ণের জলবৎ মল। অসাড়ে মলত্যাগ, দুর্বলতা, অস্থিরতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, একটু জল খাওয়া, জল খাইলে তৎক্ষণাৎ বমন, ম্যালেরিয়া, উদরাময়। বেলা একটা হইতে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি। ঔষধ—আর্সেনিক ৩০শ।

৪। সবুজপানা শ্লেষ্মাবৃত্ত পাতলা মল, বেদনা হঠাৎ আসা ও বাওয়া, চমকে উঠা, মুখ চোখ রক্তবর্ণ। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৫। ফ্রকিউলাধাতুগ্রস্তের পেটের অস্থখ—পেট বড়, হাত পা শুক। মল সাদা ও জলবৎ। পানাবহার মাধার ঘাম। পদব্বর ঠাণ্ডা। অজীর্ণ দুর্বল, পচা ডিমের মত মল। মেটে বর্ণের মল। টক্‌গন্ধবৃত্ত মল। ঔষধ—ক্যাথার-কেরিয়া-কার্ক ৩০শ।

৬। পচা গন্ধবৃত্ত পাতলা মল, অসাড়ে বাহে, দুর্বলবৃত্ত বায়ুনিঃসরণ। ঔষধ—কার্ক-ভেজ ৩০শ।

৭। বেদনাবৃত্ত সবুজপানা জলবৎ মল। বিটুখিতে স্বভাব, রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি। ঔষধ—ক্যামোমিলা ১২শ।

৮। বস্বেসে সাদা মল, নাক ঝোটা, ঘুমিরে দাঁত কিটু মিট করা, মলে ক্রিমি থাক। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

৯। বমির ইচ্ছা, সবুজ ও হলুদে রংএর স্লেয়াযুক্ত বমি, মল বাসের মত সবুজবর্ণ স্লেয়াযুক্ত ও কেনাযুক্ত। পেটফাঁপা ও বেদনা। ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

১০। কটা বর্ণের স্লেয়াযুক্ত জলবৎ মল। নানাবিধ মসলা, গরম ঔষধ ও মস্তপান ইত্যাদি হেতু পীড়া। ঔষধ—নক্সতমিকা ৩০শ।

১১। প্রাতে ভেদ, পূরণ উদরাময়। হলুদবর্ণের মল, মলত্যাগের সময় পট্ পট্ করিয়া আওয়াজ। মলত্যাগের পূর্বে পেট ডাকা। ঔষধ—পডোফাইলাম্ ৬শ।

১২। রকম রকম মল। সবুজবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত মল। তৈলামিশ্রিত আহার, মাংস আহার, হামের পর রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, তৃষ্ণাশূন্যতা, মুখে পচাশ্বাদ, আহারের পর মুখ তিক্ত, পেটফাঁপা ও বেদনা। স্তনের জিনিস খাইয়া পীড়া। ঔষধ—পালসেটিলা ৬শ।

১৩। হলুদ, কটা, সবুজ, অজীর্ণ, পাতলা ও সাদা মিউকাস, দুর্গন্ধযুক্ত পচা মল হঠাৎ বেগে অসাড়ে নির্গত হওয়া। বেদনামুক্ত, প্রাতে ভেদ। প্রাতে উঠিবারাই পারধানা বাওয়া, চর্মরোগ বসিয়া উদরাময়। ঔষধ—সাল্ফার ৩০শ।

পথা।—তরুণ উদরাময়ে এরাকট ও বালী খাইতে দেওয়া উচিত। (বালী অন্ততঃ এক বপ্তা সিদ্ধ হওয়া নরকার)। তরুণ উদরাময়ে দুধ দেওয়া ভাল নয়। বাছের অবস্থা ভাল হইয়া হজম-শক্তি বাড়িলে মাগুর মৎস্তের ঝোল ও অন্ন-পথা দেওয়া যায়। টাটকা ঝোল অনেক সময় দেওয়া খাইতে পারে। গাঁদালের ঝোলও একটি ভাল জিনিস। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া একটু একটু বেড়াইতে ও স্নান করিতে দেওয়া উচিত। ফুটন্ত দুগ্ধে লেবুর রস দিয়া ছানা কাটাওয়া, সেই ছানার জল, অর্থাৎ ছাঁকিয়া ছানা বাদ দিয়া যে জল বাহির হইবে, সেই জল লবণ কিংবা মিছরী সহ খাইতে দেওয়া যায়।

৪। অজীর্ণ-দোষ

১। টক বা তিক্ত পদার্থ উপহার বা বমন। কোষ্ঠবদ্ধ, মুখে জল বা স্লেয়া উঠা। আত্মদন তিক্ত। নিফল মলত্যাগের চেষ্টা। ঔষধ—নক্সতমিকা ৩০শ।

২। মাংসাদি ও অতিরিক্ত দ্রুত মসলাদিযুক্ত আহারের দ্রুত অজীর্ণ রোগ।
আম সহ অতিসার, বিশেষতঃ রাত্রে। টেকুর উঠা। ঔষধ—পালসেটিলা ৩০শ।

৩। অক্ষুধা, জিহ্বার সাদা-ছবের মত ময়লা, উদগারে খাত্তের আশ্বাদন,
বমন। ঔষধ—এটিমুকুড ৩০শ।

৪। জিহ্বার হলুদে ময়লা, পেটে শূল-বাথা, সবুজ অতিসার, ডিম্ বোলার
মত মল। ঔষধ—ক্যামোমিলা ১২শ।

৫। টক্ বা তিক্ত টেকুর, গা বমি বমি, বমন, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখে টক্ বা
আশ্বাদনশূন্য জল উঠা। ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৬। অতিরিক্ত বরফ-জল পান বা পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া অজীর্ণতা, অবসাদ,
পিপাসা, চঞ্চলতা, অস্থিরতা, মূত্ৰ-তর। ঔষধ—আর্সেনিক ৩০শ।

৭। পেট ফাঁপা, অনেকক্ষণ পরে উদগার, মলে ভুক্তজব্য থাকা। ম্যালেন-
রিয়ার রোগীর অজীর্ণতা। ঔষধ—চায়না ৩০শ।

৮। সুখ দিয়া জল উঠা, অথল-টেকুর, পেটের ডাক, পেটফাঁপা, দুর্গন্ধময়
বায়ু নিঃসরণ। ঔষধ—কার্ব-ভেজ ৩০শ।

৯। নাতির চতুর্দিক্ ব্যাথা, অসহ ক্ষুধা, পরিষ্কার জিহ্বা, গা বমি বমি করা।
মুখে জল উঠা, রাত্রে দাঁতে দাঁতে কিড় কিড় শব্দ। ক্রিমির দোষ। ঔষধ—
সিনা ৩০শ।

১০। অল্প আহার করিলেই পেট ফাঁপিয়া উঠা ও অধিক আহার বোধ, টক্
টেকুর উঠা, তলপেটে বায়ুসঞ্চার। ঔষধ—লাইকোপোডিয়াম্ ৩০শ।

১১। শেষরাত্রে অতিসার সহ অজীর্ণতা ও পেটফাঁপা। ঔষধ—সালফার
৩০শ।

পথ্য।—অজীর্ণ রোগের পথ্যাপথ্য বীধা-গত্রে চলে না। একের বাহা সহ,
অন্তের তাহা অসহ; এই অস্ত্র রোগীর অবস্থা বুঝিয়া কোন্ কোন্ জিনিস তাহার
সহ হয় না জানিয়া, পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সাধারণতঃ কাঠের জ্বলি
পুরাতন চালের ভাত, টাটকা মাগুর ও ছোট পোনার খোল, সন্ধ্যার বাহার

যে জিনিস সহ হয়, তাহা খাওয়া উচিত। টাটকা সুগন্ধ ফল অনেক সময় বিশেষ উপকারী। শ্রোতের জলে স্নান, স্নাত্তর খেলা, প্রহ্ন-মনে থাকা, গীতবাস্ত শুনা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সর্বদা থাকিবার চেষ্টা করার বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। চা, তামাক ও অন্ত্র কোন-মাদকীয় দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

৫। শিশুর দস্তোদার

১। অতি শীঘ্র বা দেরীতে দাঁত উঠা, মাথায় ঘাম, সাধা এবং অঙ্গগতবৃত্ত মল, কোষ্ঠবদ্ধ, কর্ণে পুঁথ। ঔষধ—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০শ।

২। দুগ্ধাইলে মাথা ঘামা, অমাবস্তা-পূর্ণিমায় রোগের বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ, ছাগল-লাঙ্গির মত মল। ঔষধ—সাইলিসিয়া ৩০শ।

৩। সবুজ বা রক্তাক্ত মল, অনেকক্ষণ খরিয়ান্না বাজে করা, কৌথপাড়া। ঔষধ—মার্কারি ৩০শ।

৪। পুতলাখা, চাপে উপশম। ঔষধ—কলোসিন্থ ৩০শ।

৫। বাজের সময় পট-পট করিয়া আওয়াজ, হলুদ রংএর পাতলা বাহু, মলদ্বার বাহির হওয়া। ঔষধ—পডোফাইলাম ৩০শ।

৬। সার্বিক উত্তেজনা, মুখ লাল, জ্বর, কন্ডালসন, গায়ে আটা আটা ঘাম; চন্কে উঠা। সবুজ রংয়ের পেটের পীড়া। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৭। ক্রিমিখাতুগ্রস্ত শিশু; খিটখিটে স্বভাব। মলে ক্রিমি থাকা। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

জ্বর—একোনাইট, ক্যামোমিলা, জেল্‌স, বেলেডোনা।

অতিসার—ক্যামো ১২শ, চন্কে উঠা, পেটে চিৎটি মারা ব্যথা, তরল আম, হল্‌বে বা সবুজ দুর্গন্ধযুক্ত মল। সর্বদা খাঁতবেঁচে ভাব, কোলে উঠিয়া বেড়াতে চাওয়া।

কোষ্ঠবদ্ধ—ব্রাইওনিয়া, নক্স, সল্‌কার।

৬। হাম

হামের চিকিৎসা।—রোগীকে পৃথক্ বিছানার রাখা কর্তব্য।

১। প্রথমাবস্থায় কাসি, সন্ধিসহ জ্বর, অস্থিরতা, তৃকা প্রকৃতি অবস্থার, ঔষধ—একোনাইট ৩শ।

২। দেরীতে ইরাপ্‌সন্ উঠা, জ্বরের সময় চূপ করিয়া পড়িয়া থাকা, কন্ডালসনের সম্ভাবনা থাকিলে, ঔষধ—জেল্‌সিনি ৩০শ।

৩। অর, মুখ চোখ রক্তবর্ণ, গলার মধ্যে বেদনা, শুক কাসি ও ডিসিরিয়া থাকিলে, ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৪। শুক ও বেদনাবৃত্ত কাসি, কাসিতে গেলে বক্ষঃস্থলে লাগা, হঠাৎ হাম মিশাইয়া বাওয়া দর, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি অবস্থার, ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৫। কপালে বেদনা, অত্যন্ত সন্ধি ও চক্ষু দিয়া জল পড়া, আলোক দেখিতে কষ্ট প্রভৃতি অবস্থার, ঔষধ—ইউফ্রেসিয়া ৩০শ।

পথ্য। হামের সময় প্রায়ই পেটের অস্থির হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্ত লঘু পথ্য দেওয়া উচিত। যাত্রা এরাকট কিংবা বালির সহিত অন্নমাত্রার ছুফ মিশাইয়া পাইতে দেওয়া উচিত। অত্যন্ত পাতলা বায়ে হইতে থাকিলে ছুফ বন্ধ করিয়া দিবে।

রোগীর বাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

৭। বিছানায় প্রস্রাব

এ সমস্ত শিশুকে মারধর করা উচিত নয়। রাত্রিতে দুই তিনবার উঠাইয়া প্রস্রাব করান ভাল।

১। নিত্রাবস্থায় টেঁচিয়া উঠা। মধ্যরাত্রি ও তোরের বেলায় সুত্রত্যাগ। ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

২। রাত্রিতে নিত্রার প্রথম ভাগে। শীতকালে বিনে ও রাতে। টনসিলের পুরাতন বৃদ্ধি অবস্থার, ঔষধ—কলিকন্ ৩০শ।

৩। ক্রিমির লক্ষণ, দাঁত কিট্ কিট্ করা বা রাখুসে কুখা। দিনে অনেকবার প্রস্রাব প্রস্রাবে কড়া গন্ধ। ঔষধ—সিনা ৩০শ।

৮। কাসি

১। বড়ঘড়ে কাসি, বম্বের ঔষেগ, দম্ববদ্ধতাব। বমন। ঔষধ—ইপিকাক্ ৩০শ।

২। শুক কাসি, অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ ইত্যাদি। ঔষধ—নয়নভম্বিকা ৩০শ।

৩। ঘন ঘন শুক কাসি, কাসিলে বক্ষঃস্থলে লাগা। আহারের মধ্যে ও পরে কাসির বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধ। ঔষধ—ব্রাইওনিয়া ৩০শ।

৪। বিছানায় শুইলে কাসি বৃদ্ধি। ঔষধ—হারসারাসাস্ ৩০শ।

৯। কর্ণশূল

১। রোগের প্রথমাবস্থার অর থাকিলে। ঔষধ—একোনাইট্ ৩০শ।

২। উত্তাপে ব্যথার বৃদ্ধি, কতকটা শক্তভাব, পুষ হইবার সম্ভাবনা, রায়ে বস্ত্রপার বৃদ্ধি।
ঔষধ—মার্কিউরিয়াম্ ৩০শ।

৩। পুষ হইলে; ঔষধ—হিগার সালফার ৩০শ।

১০। চক্ষুপ্রদাহ

১। অর থাকিলে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে, ঔষধ—একোনাইট্ ৩শ।

২। চক্ষু অত্যন্ত লাল, ব্যথামুক্ত, শুষ্ক বা জ্বালানুক্ত। আলো অসহ্য ও চক্ষু হইতে দ্রল পড়া। ঔষধ—বেলেডোনা ৩শ।

৩। জ্বালাত লাগিয়া পীড়া হইলে। ঔষধ—আনিকা ৩০শ।

৪। চক্ষুতে অত্যন্ত ব্যথা, ক্ষত, শ্রাব ও আলোতে কষ্ট। ঔষধ—মার্কিউরিয়াম্ ৩০শ।

১১। দাঁত কনকনানি

১। ঠাণ্ডালাগা হেতু অরভাবাপন্ন। প্রথমাবস্থার ঔষধ—একোনাইট্ ৩শ।

২। মাথা পর্যন্ত নৃপদগনি ব্যথা। ব্যথা হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। ক্ষরা দাঁতগুলি লাগার মত ব্যথা—ঔষধ—বেলেডোনা ৩০শ।

৩। ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া, চক্ষু, কর্ণ ও মাথা পর্যন্ত বেদনা। ঠাণ্ডা, উত্তাপে ও নড়নড়নে বৃদ্ধি। ঔষধ—ক্যামোমিলা ৩০শ।

৪। মাড়ী ও গাল কোলা। ব্যথা, ঘাড় ও কাঁধ পর্যন্ত ব্যাপক। দাঁত লম্বা ও নড়চড় হওয়া বোধ, ছুঁইলে উত্তাপ, বিছানার গরমে বৃদ্ধি। সুব দিয়া লাল পড়া। ঔষধ—মার্কিউ-রিয়াম্ ৩০শ।

৫। ছিঁড়িয়া বাওয়ার মত ও জ্বালানুক্ত ব্যথা। চোক, কান ও মাথা পর্যন্ত বেদনা। ব্যথা চলে চলে বেড়ান। ঔষধ—পালমেটো ৩০শ।

যে সকল পীড়া ও ঔষধের কথা লেখা হইল, তদ্বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

১। ঔষধগুলির যে যে শক্তি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করিলাম, যদি সেই সেই শক্তির ঔষধ গৃহে না থাকে, কিংবা যদি আমার নির্দিষ্ট শক্তির ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কল ভালরূপ লাভ না হয়, তবে সেই ঔষধের অন্ত কোন শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারিবে।

২। পীড়াগুলির যে যে লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঔষধের প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা গিয়াছে, তাহার সকল লক্ষণ যদি রোগীর নাও থাকে,—প্রধান প্রধান কয়েকটি লক্ষণ থাকিলেই সেই ঔষধ সেবন করাইবেন।

৩। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে এক ফোঁটা ঔষধে জল মিশাইয়া চারি বারের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবেন। তাহার উর্কে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক ফোঁটা ঔষধ দ্বারা সেই ভাবে দুই মাত্রা প্রস্তুত হইবে। পাঁচ বৎসরের উপরে এক এক ফোঁটার এক এক মাত্রা। এক এক ফোঁটার এক এক আউন্স (আধ ছটাক) জল।

গৃহ-চিকিৎসা (৩)

(কবিরাজী মতে)

দেশ-বিখ্যাত কবিরাজ বৈষ্ণবজী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ

সেন বিজ্ঞানভূষণ, এম্, এ মহাশয়ের দ্বারা

এই পুস্তকের লক্ষ লিখিত।

সন্তোষাত শিশুর পরিচর্যা :—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার গাত্ৰের জরায়ু অর্থাৎ শৈশবিক আবরণ এবং মুখ সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতদ্বারা বিশোধিত করিয়া, শিশুর মস্তকে ঘৃতাক্ত তুলকবর্তি প্রদান করিতে হইবে। তাহার পরে “নাড়ীক্সটা”র পাল। সুবর্ণ, রোপা অথবা লৌহদ্বারা প্রস্তুত অস্ত্রেই নাড়ী কাটা প্রশস্ত। অতঃপর জীভল (বা কোক) জলে শিশুর গাত্ৰ বেশ করিয়া পরিবেশ অর্থাৎ ছিটা দিয়া ধুইবে। তাহাতে শিশু স্ফুর্তি পাইবে। শিশু এইরূপে আণ্যায়িত হইলে, তাহাকে অনন্তা ও ব্রাহ্মীর রস, সুবর্ণভস্ম, মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা লেচন করাইতে হইবে। অতঃপর বধাকপলে শিশুকে বেশ করিয়া তৈল মাখাইয়া কোকজলে স্নান করাইতে হইবে। এই জল প্রস্তুত করার প্রণালী। হয় বটাদি ক্ষীরবৃক্ষের বকল সিদ্ধ করিয়া অথবা

রোপাঞ্চ বা স্বর্ণাঞ্চ উভয় জলের মধ্যে কেলিয়া অথবা কশিখের পত্র সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

প্রসবের পরে সাধারণতঃ দুই তিন দিবস বাদে চতুর্থ দিনে বা কখনও তৃতীয় দিনে প্রসূতির স্তনে স্তনের প্রবর্তন হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রথম দিনে তিনবার মাত্র অন্তার রস, মধু ও দ্ব্যত পান করাইলেই যথেষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিনে এবং আবশ্যক হইলে তৃতীয় দিনে লক্ষণামূলসিদ্ধ দ্ব্যত পান করাইতে পারিলে ভাল হয়। এই লক্ষণামূল বর্তমানে অপ্রাপ্য না হইলেও দুর্লভ ও দুপ্রাপ্য, ইহার মূল্যও অত্যধিক। সাধারণপক্ষে একটু একটু মধু অবলোহন এবং জলের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ জাল দিয়া তাহা সন্তোজাত শিশুকে আবশ্যকমত দেওয়া হইয়া থাকে। জলের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধ জাল দিবার উদ্দেশ্য যে, দুগ্ধ জালে গাঢ় হইলে গুরুপাক হয়, কিন্তু জল মিশাইয়া জাল দিলে আর গাঢ় হইতে পারে না, কাজেই গুরুপাক হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রসূতির স্তনে স্তনের প্রবর্তন হইলে তাহাই সন্তানের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু ঐ স্তন কোন কারণে দূষিত হইলে মূলকণা বৎসলা ধাত্রী (স্তন পরীক্ষাপূরক) নিরোজিত করা আবশ্যক।

ছোট ছোট স্তন্যপায়ী শিশুকে বিশেষ করিয়া ঔষধ সেবন করার দরকার হয় না। স্তন্যপায়ী শিশুর কোনও অসুখ হইলে সাধারণতঃ তাহাকে কোনও ঔষধ না দিয়া তাহার মাতাকে বা ধাত্রীকে সেই সেই রোগের ঔষধ সেবন ও তজ্জন্ত পালনীয় নিয়মের অধীন রাখিলেই শিশু রোগমুক্ত হয়। তাহাতে না হইলে মাতাকে বা ধাত্রীকে নিয়মাবধীন রাখিয়া মাতার বা ধাত্রীর স্তনে সেই সেই রোগের ঔষধ মাখিয়া দিতে হয়। শিশু স্তন্যপান করিবার সময় স্তনের সহিত উক্ত স্তনলিপ্ত ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে। তাহাতেই কল হইবে। ইহাতেও সুবিধামত কল না হইলে তখন তন্ত বা মধু দ্বারা তরল করিয়া লেহন বা পান করাইয়া দিতে হয়। অধিক-বয়স্ক লোকের যে যে পীড়ায় যে যে ঔষধ ব্যবহৃত—শিশুদিগকেও তত্তৎ ঔষধ উপযুক্ত কম মাত্রায় দিতে পারা যায়। কেবলমাত্র শিশুদিগের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত ঔষধও আছে। ঔষধের কথা পরে বলা যাইবে।

ঔষধের মাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। ঔষধ যে যে দ্রব্যে প্রস্তুত, তাহাদের বীৰ্য্য, রোগীর শারীরিক বল, বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিতে হয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, একমাস বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে এক রতি মাত্রার ঔষধ মধু, দুগ্ধ বা ঘৃতাদির সহিত মিশাইয়া অবলেহন করাইতে হয়। ইহার পরে এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক এক রতি করিয়া বাড়ান যাইতে পারে। এক বৎসরের পরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে এক মাষা করিয়া বাড়াইয়া ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইলে পূর্ণ-মাত্রার ঔষধ প্রযুক্ত হইবে।

এখানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মাত্রা কেবলমাত্র মৃৎবীৰ্য্য ঔষধের পক্ষেই খাটিবে।* সকল স্থলেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে মাত্রা স্থির করা কর্তব্য এবং একান্ত দ্বায়ে না পড়িলে শিশুকে বিরেচন, বমন ও বস্তি প্রয়োগ করিতে নাই।

১। জ্বরাদি রোগের সাধারণতঃ কতকগুলি মৃটিযোগ মাত্র নিয়ে কথিত হইল :—

অর হইলে তুলসীপাতার রস, শেফালিকুলের পাতার রস, বা ক্ষেপাপাড়ার ঘুসড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চিরতার ওল বিশেষ উপকারী।

২। সন্ধিতে—আদার রস মধুসহ এবং কাসি হইলে গোলমরিচ-চূর্ণ, মধুসহ উপকারী। ডুই অবহারই গরম জল সেব্য।

৩। পেটের অগ্রণে কচি বেল পোড়া ও ইক্ষুগুড় অথবা গাছালের ঝোল উপকারী।

৪। কাণ পাকিলে—সৈন্ধবসহ ছাগদুগ্ধ ঈষৎ গরম করিয়া তাহার তিন চার ফোঁটা কাণের মধ্যে ঢালিয়া দিলে উপকার হয়।

৫। জরের বেগ অত্যন্ত অধিক হইয়া দাহ হইলে—রোগীকে চিৎ করিয়া শোরাইয়া তাহার নাভির উপরে কাংড়া-নির্ম্মিত পাত্র রাখিয়া তাহাতে জলের ধারা দিলে দাহ প্রশমিত হয়।

৬। পেট গরম হইয়া অর হইলে শুড় বা সৈন্ধব সহ হরীতকী সেবন করিলে উপকার হয়।

৭। ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাতঃকালে দুতসহ রসোন সেবন অথবা হরীতকী ও মধু অথবা সেকালিকা কুলের পাতার রস সেবনে উপকার হয়।

৮। টাইফয়েড জ্বরে, জ্বরের চিকিৎসার প্রাথমিক না দিয়া অগ্ন্যুদীপক ঔষধের প্রাথমিক বেগুনা কর্তব্য। পেট গরম হইয়া অর হইলে তাহার চিকিৎসা এরূপ স্থলে প্রযোজ্য।

৯। আমাশা, ও অজীর্ণজনিত পাতলা দান্ত হওয়ারকে সাধারণতঃ ‘আমাশা’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, ইহা আমাশরোগে রোগ বলিয়াই এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই রোগই একটু বেশী রকমের হইলে অথবা তাহার সহিত বমনাদি উপদ্রব থাকিলে সাধারণতঃ কলেরা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দুই রোগেই ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং এখন হইতেই বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য।

১০। দস্তশূলে মধু, পিঙ্গলী ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে উপকার হয়।

১১। গলনালী কুলিলে গরম জল পান এবং আদা, গোলমরিচ প্রভৃতি ঝাল দ্রব্য সেবনে উপকার হয়।

১২। কোঁড়া হইলে—বরবার বা মসিনার পুলটিস্ অথবা তোপবারি জল দিয়া লাগাইলে কোঁড়া পার্কিয়া নিজেই গলিয়া যায়।

১৩। খোস হইলে—নিমের বা চালদুগার তৈল উপকারী।

১৪। দফ্ররোগে রসাজন ও চাকুলবাজ কর্ণথের রসে অথবা করলবীজ, চাকুলে বীজ ও ছুড়, গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

১৫। হঠাৎ কোনও স্থান কাটিয়া গেলে দুর্কার বা গাছাকুলের পাতার রস দিয়া চাপিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ হয়। জলপটি দিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

১৬। হজম ভাল না হইলে উপবাসই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। উপবাস অসম্ভব হইলে ভোজনের পূর্বে সৈন্ধবলষণ ও আদা সেবন করিলে পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়। শুড়ের সহিত হরীতকী অথবা শুঠী সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ দূর হয়।

১৭। গ্রীষ্মে প্রাণ কম হইলে জ্বাকুল কীজী (অরুজল) দ্বারা পেষণ করিয়া সেবন করিলে প্রাণ প্রবর্তন হয়। প্রাণ বেশী হইলে বাসকের রস, চিনি ও মধুসহ অথবা অশোকের রস মধুসহ সেবন করিলে উপকার দর্শায়। রসাজন ও কাটানটের মূল আতপচাউল চূর্ণ তিমান-জল এবং মধুসহ সেবনে অতিপ্রাণ বন্ধ হয়।

১৮। কিন্তু শূগাল বা ক্ষুধার কামড়াইলে দষ্টহান বেশ করিয়া চিরিয়া তাহা হইতে রক্তপ্রাণ করাইতে হইবে। পরে গরম ঘৃত দ্বারা সেই স্থান বেশ করিয়া ধোঁত করিয়া তাহাতে শিরীব প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। রোগীকে পুরাণ ঘৃত পান করাইবে, পুরাণ ঘৃত ও অর্কক্ষীর মিশ্রিত করিয়া বিরচন দিবে এবং কেবল ছুড় (কোনও মতে পব্যঘৃত) সহ অন্ন পব্য দিবে।

কৃষি-পঞ্জিকা

(শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষিবিভাগের সর্বোচ্চ

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়

কর্তৃক এই পুস্তকের জন্ম লিখিত)

বৈশাখ •

গুল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা (পালা) এই মাসে বপন করা উচিত । শশা, বিলাতী কুমড়া, লাউ, পুঁই, ডেস্কো-নটে প্রভৃতি শাকের বীজ এখনও বপন করা চলে; কিন্তু একটু দেরী হইয়া গিয়াছে ।

গুল :—

হাবড়ার নিকটে সাতরাগাছির গুল অতি উত্তম । গুলের গারে যে ছোট ছোট পাট বা মুখী হয়, তাহাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মাদী দোআল, হালুকা ও উচ্চ হওয়া দরকার । শৈতের গুল বৈশাখমাসে রোপণ করিতে হয়, নতুবা নাসের শেষে ক্ষেত্রে বসাইতে হয় । এক হাত অন্তর মুখী বসান উচিত । মুখী অকুরিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে তল দেওয়া দরকার ; পরে আর তল দিবার আবশ্যক নাই । জমিতে এক বৎসর থাকিলেই গুলের আকার বেশ বড় হয় ; তবে পাঁচ ছয়মাস পর হইতেই ব্যবহার করা বাইতে পারে । শৈতকালে গুল-গাছগুলি নিপ্তেজ হইয়া ক্রমে মাঝা মাঝি এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে আবার নূতন গাছ বাহির হয় । গুলের গোড়ার বাহাতে জল না জমে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত । নিয়ম—সাতসেঁতে জমিতে গুল তন্মিলে সেই গুলে ছিঁড়ি হয় এবং তাহাতে দুখ বুটুকুট করে ।

চিচিঙ্গা :—

লতা গাছ, হুতরাং মাচায় তুলিয়া দেওয়া হয় । মাচার নিয়ে ৩০ হাত অন্তর মাঝা করিয়া চৈত্রে শেষ হইতে আবার মাসের প্রথম পর্য্যন্ত বীজ বপন করা বাইতে পারে । আগে পুঁ তিলে বর্ষাকালে ফল ধরে, নতুবা আখিনে ফল ধরে । এক প্রকার তিক্ত চিচিঙ্গা আছে, তাহার গুঁছ ক্ষেত্রে জন্মিলে তুলিয়া ফেলা উচিত এবং বিবাহী লোকের নিকট হঠতে বীজ সংগ্রহ করা কর্তব্য ; নতুবা তিক্ত বীজ লাগাইয়া কোন ফল নাই ।

পালা বিজা :—

বাঙ্গালার সাধারণতঃ দুই প্রকার বিজা হইয়া থাকে—ভূঁই-বিজা ও পালা-বিজা। ভূঁই-বিজার গাছ বেশী লম্বা হয় না, তাই অন্যায়সে মাটিতে লতাইয়া থাকে। কিন্তু পালা-বিজার গাছ অধিক দীর্ঘ হয় বলিয়া উদ্ভিদগণকে মাটার তুলিয়া দিতে হয়। বৈশাখ মাসের মধ্যেই পালা-বিজা বপন করা উচিত। মাটার নিম্নে ৩০ হাত অন্তর মাঝা করিয়া প্রত্যেক মাঝার ৪.৫ টি বীজ বপন করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া দরকার। পালা-বিজার ফল খুব লম্বা হয়। পুষ্করীদিগে ধারে গাছ পুঁতিয়া অলের উপরে মাচা করিয়া দিলে, গাছ খুব তেজাল হয় এবং তাহাতে ফলও অধিক ধরে। এক প্রকার বিজা অতিশয় তিস্ত, সেটী জন্ত বিবাসী লোকের নিকট হইতে বীজ সংগ্রহ করা ভাল।

ভুঁটা :—

ভুঁটা বারমাসই জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালার ভুঁটা-চাষের প্রচলন নাই। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর এবং সুখরোচক। বাগানে কতকগুলি লাগাইয়া রাখা ভাল।

বৈশাখ মাসে বীজ বপন করা উচিত। জমী উত্তমরূপে খুঁড়িয়া এক হাত অন্তর বীজ বপন করিয়া মাটি ঢাশা দিবে। পরে পাঁচ হয় দিন হেঁচ দিলেই চারা বাহির হইবে। তাহার পরে মাসে ২৩ বার হেঁচ দিলেই বগেটে। বগনের দুই মাস পরে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। পাটনাই বীজ অপেক্ষা মার্জিত বীজ ভাল। গাছ অতিশয় তেজাল হইয়া উঠিলে ফলন করিয়া যায়। এইরূপ হইলে গাছের মাথা ছাঁটিয়া দেওয়া ভাল। গাছের গোড়া ও কাণ্ড হইতে ছোট ছোট কেঁকড়ি জন্মিলে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া দিবে। ভুঁটা গাছে সার দেওয়া বিশেষ দরকার। গোবর সার প্রয়োগ করাই ভাল।

জ্যৈষ্ঠ

লাউ, কুমড়া, চাঁড়স, পালা বিজা, পালা শসা, বর্ষাতি মূলা প্রভৃতি বীজ এই মাসে বপন করা হয়। শাক আলু বৈশাখের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত লাগাইতে পারা যায়। জলদি ফুল-কপির বীজ এই সময় হাপরে বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে পারিলে, খুব জলদি ফুলকপি পাওয়া যাইতে পারে।

কুমড়া (বিলাতী) :—

বিলাতী কুমড়া প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। একজাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, তৃত্ত রাতি আষাঢ় হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এবং অন্য প্রকার দ্বিতকালে কার্তিক হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত

কলিয়া থাকে। বর্ধতি কুমড়াই সর্বাংশে অধিক ফলে। এই বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা উচিত। বপন করিবার পূর্বে বীজগুলিকে এক রাত্রি ভেলে ভিজাইয়া রাখা ভাল। হ'কার জলে বীজ তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে বীজে পোকা ধরিয়া অল্প বাহির হইবার পূর্বে নষ্ট হইয়া যায় না।

ক্ষেত্রে ৭৮ হাত অন্তর মাঝা করিয়া প্রত্যেক মাঝার ২০টি করিয়া বীজ বপন করিবে। চারা গাছে প্রতিদিন প্রাতে অথবা সন্ধ্যার সময় জল দিতে হয়। বর্ধা আরম্ভ হইলে আর জল দিবার দরকার নাই।

বর্ধতি কুমড়ার জন্ম মাচা দরকার। নতুবা অল্প জাতীয় ফসলের জন্য মাচা দরকার হয় না, মাটির উপরে গাছে কল ধরে। কুমড়ার সকল ফলে ফল ধরে না, একথা সকলেই জানে। 'রাঁড়া' ফলগুলি গৃহস্থ ভাঙিয়া খাইয়া থাকে।

কুমড়া পাকিয়া পুটু হইলেই তাহাকে আর গাছে রাখা উচিত নহে, তখন গৃহে আনিয়া বাড়ির শিকার ব্লাইয়া রাখিলে অনেক দিন পর্যন্ত টিক থাকে। বর্ধার সময় কুমড়া গৃহস্থের প্রধান ভরকারী।

লাউ :—

লাউ সাধারণতঃ দুই জাতীয়—এক জাতি চৈত্র-বৈশাখে জন্মে এবং অন্য এক জাতি শীতের সময় অগ্রহায়ণ-শৌব মাসে জন্মে। শীতের লাউ খাইতে সুবাস।

লাউয়ের বীজ মাঝার বপন করিবে। বীজ বপন করিবার পূর্বে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাঝার মাটি খুব গভীর করিয়া খুঁড়িয়া তাহার সহিত গোবর সার মিশাইয়া দিবে। লাউএর মাচা করিয়া দিতে হয়, অথবা গৃহের ছাদে বা চালের উপর গাছ তুলিয়া দিতে হয়। বর্ধাকালে গাছের গোড়ার জল জমিতে দেওয়া উচিত নহে। সেইজন্য বর্ধার পূর্বে গোড়ার মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিবে। পুষ্করীপীর ধারে গাছ পুঁতিয়া জলের উপর মাচার গাছ তুলিয়া দিলে গাছে অধিক ফল ধরে। যে লাউ আকারে লম্বা এবং দেদিতে খুব লম্বা নহে, তাহাই অধিক সুবাস ও উপকারী। ৩০ মাসের মধ্যেই গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

মুলা (বর্ধতি) :—

বর্ধতি মুলার বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বপন করা উচিত। বর্ধতি মুলা শীতের মুলার মত আকারে বড় হয় না, কিন্তু খাইতে বেশী মিষ্ট ও বাস।

মুলা মাটির মধ্যে জন্মার, সেইজন্য ইহার মাটি খুব হালকা ও একটু বালিযুক্ত হওয়া

আবশ্যক । খুব গভীর করিয়া খনন করিয়া মাটি বেশ খুঁচা-খুঁচা করিতে হয়, নতুবা মাটি কঠিন থাকিলে, মূল্য বৃদ্ধ হয় না । মূলের পাট সহজ নহে, তাই খনন বচনে আছে :—

“শতক চাবে মূল্য । তার অর্ধেক তুলা ।”

গোরাল-বয়ের জম্মাল এবং গোবর সার মূলের পক্ষে ভাল । জমীতে অধি হাত অন্তর সারবান্ধি ভাবে বীজ ছিটাইয়া দিতে হয় । মূলের বীজ অতিশয় ছোট; সেইজন্য চানি ৩৭^{০০} খুঁচা মাটির সহিত বীজ মিশাইয়া লইয়া জমীতে ছিটাইয়া দিলে বীজ বেশ সমভাবে সকল স্থানে ক্ষেত্রে পড়ে, নতুবা একস্থানে অধিক ও অন্যস্থানে অল্প পরিমাণে বীজ পড়িবার সম্ভাবনা । গাছগুলি খন হইয়া বাহির হইলে, পাঁচ আঙ্গুল অন্তর গাছ রাখিয়া বাকি গাছগুলি চারাইয়া বেগুয়া উচিত । গাছে ১০১২ দিন অন্তর জল দেওয়া দরকার ।

দেশী মূলের মধ্যে মেদিনীপুর, বীরভূম ও পাটনার মূল্যই উৎকৃষ্ট । বিলাতী মূল্য আকারে ছোট হয়, তবে উহার ঝাঁজ অতি তীব্র । অগ্রহায়ণ মাসে বিলাতী মূল্য বপন করা উচিত এবং উহা কাঠের বাগ্জে বপন করিয়া প্রথমে চারা তৈয়ার করিয়া লগুয়া দরকার ।

টাঁড়স :—

ক্ষেত্রমধ্যে ১০ হাত অন্তর মাড়া করিয়া বীজ বপন করিবে । জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা আশাঢ় মাসের প্রথমে বীজ বপন করা উচিত । ফাল্গুন-চৈত্র মাসেও বীজ বপন করা চলে, কিন্তু তাহার ফলন ভাল হয় না । ছোট গাছে অধিক ফুল ধরিলে ফুল ছিঁড়িয়া বেগুয়া উচিত । বীজ অক্ষুরিত হইবার পর এক বাসের মধ্যেই ফল ধরিতে থাকে ।

গোবর সার এবং পোড়া উনানের মাটি সাররূপে ব্যবহার করিলে প্রচুর ফল ধরে ।

শাঁক আলু :—

শাঁক আলু ডরকারী নহে, ইহা ফলের স্তায় কাঁচা খাইতে হয় । শাঁক আলু লতা গাছ, লতার মূল ইহার জন্ম । জমীতে দেড় হাত অন্তর এক একটি গভীর গর্ত করিয়া এবং গর্তের মাটি খুব চূর্ণ করিয়া তাহাতে ২টি করিয়া বীজ পুঁতিয়া দিবে । বর্ষার পূর্বে পর্যন্ত গাছে থাকে থাকে জল দিতে হয় । শীতকালে গাছ শুকাইয়া আসিলে, সেই সময় আলু তুলিয়া ব্যবহার করা হয় । আলু বাহির করিয়া না লইলে, পর বৎসরের নুতন গাছ বাহির হয় এবং আলু আকারে বড় হয়, কিন্তু তাহাতে অধিক ছিঁড়ী হইয়া পড়ে, খাইতে ভাল লাগে না । আমাদেবর বাগানে তিন বৎসরে একটি ১০ সের শাঁক আলু হইয়াছিল ।

নটে শাক :—

নটে শাক নামা একর—চাঁপা, কনকা প্রভৃতি । ইহা বার মাসই জন্মিয়া থাকে, তবে

বধার নটেই খাইতে ভাল। অন্ন রসাল এঁটেল মাটি নটের পক্ষে উপযুক্ত। উত্তমরূপে জমী তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিবে এবং চারা ঘন হইয়া বাহির হইলে পাতলা করিয়া দিবে। চারা বাহির হইলে বর্ষা পর্যন্ত একদিন অন্তর জল সেচন করিবে। এক মাসের মধ্যেই গাছগুলি শাক কাটিয়া লইবার উপযুক্ত হয়। গাছ উপড়াইয়া বা লইয়া উপর হইতে শাক কাটিয়া লইলে আবার ২০ দিনের মধ্যেই নূতন পাতা বাহির হয়। এইরূপে ৮১০ বার শাক কাটিয়া খাওয়া বাইতে পারে। ক্ষেত্রে জলের অভাব না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ক্ষেত্রে গোবর সার এবং আবর্জনা সার দিলেই হইল।

ডেকো শাক বা ডেকো ডাঁটা :—

বর্ষাকালে ডেকো ডাঁটা গৃহস্থের প্রধান অবলম্বন। ডেকো নানা প্রকার। এক প্রকার ডেকো আছে, তাহা আকারে খুব লম্বা হয় বটে, কিন্তু কোন স্বাদ নাই। লাল বর্ণের এক ক্ষাত্তীয় ডেকো আছে, তাহা অতিশয় মিষ্ট ও স্বাদু। ডেকো গাছ বড় বড় হয়, ডাঁটা তত বিট হইতে থাকে, তবে তখন আর উহার পাতা খাইতে ভাল লাগে না। অন্ন রসাল এঁটেল মাটি হইবার উপযোগী। হাপরে বীজ বপন করিয়া, জল সেচন করিয়া হাপর তিজাইয়া রাখিলে ৪৫ দিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। পবে মাটিতে উত্তমরূপে সার মিশাইয়া বৃষ্টি পাইলেই চারাগুলি জমীতে এক হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে। বর্ষা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত গাছের গোড়ার মধ্যে মধ্যে জল দিবে। গাছের গোড়ার জল জমিলে ডাঁটার স্বাদ বিকৃত হইয়া যায়, মিষ্টতা কমিয়া যায়। গাছগুলি ১ হাত উচ্চ হইলে তাহার ডগা কাটিয়া দিবে, তাহা হইলে গাছ বেশী লম্বা না হইয়া চারিদিকে শাখাপ্রশাখাবৃত্ত হইবে।

লকা :—

লকা নানা প্রকার। ইহা নিজে তরকারী নহে বটে, কিন্তু লকার অভাবে কোন তরকারীই রন্ধন হইতে পারে না। ছোট ছোট 'ধানী' লকা খুব স্বাদ, আবার বড় বড় মোটা মোটা অনেক লকা আছে, বাহাতে আদৌ স্বাদ নাই।

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিবে। আবহাওয়া-মত জল সেচন করিলেই এক সপ্তাহের মধ্যে চারা বাহির হইবে। হাপরে গাছগুলি ৬০ ইঞ্চি বড় হইলে, জমী উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া আবহাওয়া-বর্ণ মাসে জমীতে দেড় হাত অন্তর সারবানি করিয়া চারা বসাইবে। লকার পক্ষে খোলা উচ্চ জমী ভাল অর্থাৎ বাহাতে রৌদ্র ও বাতাস উত্তমরূপে পায়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমী খুঁড়িয়া দিবে।

গাছের গোড়ার কোনরূপে জল জমিবার সম্ভাবনা না থাকিলে শিকড়ের উপরের মাটি

অল্প সরাইয়া শিকড়ে রৌত্র ও বাতাস খাওয়ারইলে গাছ সতেজ হয়। দিন ছুড়ি পরে সরিষার খোল ও মাটি বিশাইয়া গোড়ার মাটি চাপা দিলে এবং জল সেচন করিলে, গাছে অধিক ফল ধরে এবং কলের আকারও বড় হয়।

ছাঁচি-কুমড়া, চাল-কুমড়া বা দেশী কুমড়া :—

কচি ছাঁচি কুমড়া আমরা রন্ধন করিয়া ব্যবহার করি, পাকা কুমড়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রসে পাক করিয়া কুমড়ার মিঠাই তৈয়ার হয়। এই মিঠাই বেশ সুবরোচক ও লঘুপথ্য—শিশুদিগের উত্তম খাদ্য। এতদ্বির পাকা কুমড়ার ভিতরের শাঁস কুরিয়া পল্লীবধূগণ কুমড়ার বড়ি তৈয়ার করেন। ইহাও অতি উপাদেয়।

সাধারণতঃ এই কুমড়া চালের উপর হয় বলিয়া ইহার অপর নাম চাল-কুমড়া। একটু উচ্চ জমীর উপরে মাড়া তৈয়ার করিয়া প্রতি মাড়ার ২০টি করিয়া বীজ বপন করিবে। মাড়ার উপর মাটা করিয়া দিবে অথবা গৃহের ছাদে বা চালের উপর গাছটিকে তুলিয়া দিবে। মাটা বা চালের উপর গাছ তুলিয়া না দিলে ভিজা-মাটিতে কল থাকিলে, কল শীত্র পচিয়া যায়। দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যেই গাছে কল ধরিতে থাকে।

বেগুন :—

বেগুন প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। শীতের বেগুন-বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসে, গ্রীষ্মের বেগুন-বীজ অগ্রহায়ণ-শৌব মাসে বপন করিতে হয়। বেগুন নানা জাতীয়—তন্মধ্যে বাসালার মুক্তকেশী বেগুন প্রসিদ্ধ। হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। বেশ শীতল ছায়া-বুড় ছাদে হাপরে তৈয়ার করিবে। বীজ বপন করিবার পূর্বে এক রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে প্রাতে অল্পক্ষণ বাতাসে রাখিলেই বীজ শুক হইয়া আসিবে, তখন সেগুলি বপন করিবে। হাপরে চারাগুলি ১১০ অঙ্গুলি বড় হইলে স্থায়িতাবে ক্ষেত্রে নাড়িয়া পুঁতিয়া দিবে। সন্ধ্যার সময় হাপর হইতে চারা তুলিয়া ক্ষেত্রে বসাইবে। গৃহস্থের নিজের বাগানে ১০১২টি চারা বসাইবার আবশ্যক হইলে বীজ হইতে চারা তৈয়ার না করিয়া পুষ্ট চারা কিনিয়া বসাইলেই চলিবে। দুই হাত অন্তর জ্যেষ্ঠী কাটিয়া ৫৩ অঙ্গুলি উচ্চ পাড়া তৈয়ার করিবে। এই পাড়ার উপরে দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিবে। পরে বড় দিন পর্যন্ত গাছগুলি মাটিতে শিকড় না কেলে, তত দিন প্রত্যহ গাছের উপর জল দিবে। ইহার পরে বেগুন গাছে আর জল দিবার দরকার নাই। তবে শীতের বেগুনে ২১ বার জল সেচন করা মন্দ নহে। পুরাতন ভিটা মাটিতে বেগুন খুব ভাল হয়। বেগুনগাছের গোড়ার সরিষার খোল, ছাই ও অল্প চুণ বিশাইয়া ব্যবহার করিলে ভাল কল পাওয়া যায়।

আষাঢ়

এই মাসে শিম, লড়া, শীতের শসা প্রভৃতি বপন করিতে হইবে। পালাশ শাকের জলদি ফসল করিতে হইলে, এই সময়ে বপন করা উচিত।

শসা :—

শসা আর বার মাসই পাওয়া যায় এবং কচি শসা কাঁচা ও পাকা শসা রাখিয়া খাওয়া হয়। শসা সাধারণতঃ দুই জাতীয়—জুঁই-শসা ও পালা-শসা। পালা-শসার বীজ আষাঢ় মাসে বপন করা হয়। ক্ষেত্রে ১০ হাত অন্তর মাথা করিয়া প্রতি মাথার ২০টি করিয়া বীজ পুঁতিবে। পুষ্করিশির মাটি, পোড়া মাটি ও গোবর সার শসার জমিতে দিবে। গাছ বড় হইলে মাথার উপর মাচা করিয়া দিবে। তিন চারিটি মাথার উপর একটি বড় মাচা করিয়া দিতে পারা যায়। পালা-শসা ভাত্র মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত ফল দেয়। যেটে ঘরের পুরাতন বেগুনালের মাটি ও পুরাতন রাবিসের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শিম :—

দেশী শিমের মধ্যে আলুতাপাটি শিম উৎকৃষ্ট। যে সকল শিম চণ্ডার বড় হয় না, দেখিতে কড়াই-২'টির মত, তাহা খাইতে ভাল নহে। আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে মাথা করিয়া প্রতি মাথার ২০টি করিয়া বীজ বপন করিবে। শিমের বীজ বপন করিবার পূর্বে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। চারা বড় হইলে উপরে মাচা করিয়া দিবে কিংবা মিকটে কোন বড় গাছ থাকিলে তাহাতে উঠাইয়া দিবে। চালের উপরেও শিম গাছ তুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। গাছ মাটিতে থাকিলে ফল ভাল হয় না, এক গাছ হইতে ২০ বৎসর ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ফল কম হয় ও খাইতে বিবাদ হয়। হুতরাং শীতের পর গাছ নির্জীব হইলেই কাটিয়া দিবে।

আবণ

লাউ, পুঁই, বরবটি প্রভৃতি বপন করিতে হইবে।

পুঁই :—

শাকের মধ্যে পুঁই বিশেষ বলকারক। পুঁই আর সকল সময়েই পাওয়া যায়। ইহা দুই প্রকার :—লাল ও সবুজ। সবুজ পুঁই অধিক প্রচলিত। ক্ষেত্রে মাথার গর্ত করিয়া প্রতি

সাতার ২০টি বীজ পুঁতিবে। বৃষ্টি না হইলে সন্ধ্যার পূর্বে গাছের গোড়ার জল দেওয়া করকার। পুঁই গাছ লতাইয়া যায়। অল্প ২০টি গাছ হইলে মাচা করিয়া দেওয়াই ভাল, নতুবা উহা বেন জমীতে ইচ্ছানত লতাইয়া বাইতে পারে, তাহার ব্যবহা করিবে। অনেকে চালায় উপর পুঁই গাছ তুলিয়া দেন। সে প্রথা মন্দ নহে।

বরবটা :—

বরবটি অতি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ভরকারী। গ্রীষ্ম মাসে চৌকায় মধ্যে বীজ ছড়াইয়া দিবে। চৌকায় মধ্যে চারা ঘন হইলে পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। বরবটি গাছে আশ্বিনের শেষে হইতে কল ধরিতে আরম্ভ করে এবং মাঘ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন বরবটি বাওয়া বাইতে পারে। শুষ্ক বরবটির দানা হইতে ভাল তৈয়ার হয়। এই ভাল বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিমে অধিক প্রচলিত। যে সকল বরবটি লম্বা, উপযুক্ত পরিমাণে চণ্ডা এবং সালা হয়, তাহাই খাইতে নরম ও স্বাদু। এইরূপ বরবটির বীজই ব্যবহার করা উচিত।

আশ্বিন

শীতের মূলা, শিম, মটর প্রভৃতি এই মাসে বপন করিতে হয়।

কার্ত্তিক

শীতের সবজী এখনও বপন করিতে বাকি থাকিলে এই মাসে শেষ করিবে। এই সকল সজী 'নাবী' অর্থাৎ বিলম্বে হইবে।

অগ্রহায়ণ

বেগুন, লম্বা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যে সকলের চৈত্র-বৈশাখে কল ধরিবে, তাহাদিগকে এই মাসে বপন করিবে।

পৌষ

চৈত্রের শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি এই মাসেও বপন করা চলে।

ফাল্গুন

চাঁপা-নটে এই সময় বপন করিয়া ভাল করিয়া জল দিতে পারিলে শীঘ্র শাক পাওয়া যায়।

চৈত্র

লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি এই মাসে বপন করা হয়। টাউস ও ভুট্টাও এই সময়ে লাগাইতে পারা যায়। আন্ত বেগুনের বীজ হইতে চারা তৈয়ার করিতে হইবে। আদা ও হলুদ এই মাসে বসাইতে হয়।

আদা :—

আদা আমাদের বিশেষ দরকারী। ইহা রন্ধনে আবৃত্তক হয় এবং ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের বাগানে ২/১ বড় আদা লাগাইয়া রাখিলে সময়ে অনেক উপকারে লাগে।

আদা আঁতোর এবং ছায়াবৃত্ত স্থানে বেশ জন্মায়। বড় গাছের গোড়ায়, আঁতোতে, যে স্থানে অন্য কোন ফসল ভাল হয় না, সেই স্থানে আদা ভাল হয়।

জমী বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর জেগী কাটিবে এবং প্রতি জেগীতে আধ হাত অন্তর আদা পুতিয়া দিবে। বেশ এক পসলা বৃষ্টির পরে জমীতে আদা বসাইবে। গাছের গোড়ায় বাহাতে কোন প্রকারে জল না দাঁড়ায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। হাই ও দোল আদার পক্ষে উত্তম সার। অতিশয় হাল্কা দৌরাণ মাটিই আদার উপযুক্ত জমী। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আদার গোড়া খুঁড়িয়া কতক আদা ভাঙ্গিয়া লইতে পারা যায়, এবং পরে মাটি চাপা দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ মাসে গাছের পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে সকল আদা মাটি হইতে উঠাইবে।

ভূতা ও কর্মচারীদের বেতনের হিসাব
২৮ দিনে মাস হইলে

দিন	১	২	৩	৪	৫
১	৫০	১২	১২	৫	১১
২	১২	৫	১১	১০	১১
৩	১২	১১	১২	১১	১২
৪	৫	১৫	১১	১২	১০
৫	১৫	১২	১২	১১	১১
৬	১১	১১	১১	১২	১৫
৭	১০	১০	১০	১১	১০
৮	১০	১২	১২	১৫	১১
৯	১২	১৫	১১	১১	১৫
১০	১২	১১	১২	১১	১২
১১	৫	১০	১১	১২	১০
১২	১১	১২	১২	১১	১১
১৩	১১	১৫	১১	১২	১৫
১৪	১০	১১	১০	১১	১০
১৫	১০	১২	১১	১৫	১১
১৬	১২	১৫	১১	১১	১৫
১৭	১২	১১	১২	১১	১২
১৮	৫	১১	১১	১২	১০
১৯	১৫	১১	১২	১১	১১
২০	১১	১১	১১	১২	১৫
২১	১০	১১	১০	১১	১০
২২	১০	১২	১১	১৫	১১
২৩	১২	১৫	১১	১০	১৫
২৪	১২	১১	১২	১১	১২
২৫	৫	১০	১১	১২	১০
২৬	১১	১২	১২	১১	১১
২৭	১১	১৫	১১	১২	১৫

২৮ দিনে মাস ক্যালেন্ডার

দিন	৬	৭	৮	৯	১০
১	৬/৭	১০	১১	১/২	১/১২
২	১০/১৭	১১	১১/২	১১/৫	১১/৭
৩	১১/৫	১১	১১/১২	১১/৭	১/১২
৪	১১/১৫	১১	১১/৫	১১	১১/১৭
৫	১/১২	১১	১১/১৫	১১/১২	১১/১২
৬	১১/১২	১১	১১/৭	১১/১৫	১১/৭
৭	১১	১১	১১	১১	১১
৮	১১/৭	১১	১১	১১/২	১১/১২
৯	১১/১৭	১১	১১/২	১১/৫	১১/৭
১০	১১/৫	১১	১১/১২	১১/৭	১১/২
১১	১১/১৫	১১	১১/৫	১১	১১/১৭
১২	১১/২	১১	১১/১৫	১১/১২	১১/১২
১৩	১১/১২	১১	১১/৭	১১/১৫	১১/৭
১৪	১১	১১	১১	১১	১১
১৫	১১/৭	১১	১১	১১/২	১১/১২
১৬	১১/১৭	১১	১১/২	১১/৫	১১/৭
১৭	১১/৫	১১	১১/১২	১১/৭	১১/২
১৮	১১/১৫	১১	১১/৫	১১	১১/১৭
১৯	১১/২	১১	১১/১৫	১১/১২	১১/১২
২০	১১/১২	১১	১১/৭	১১/১৫	১১/৭
২১	১১	১১	১১	১১	১১
২২	১১/৭	১১	১১	১১/২	১১/১২
২৩	১১/১৭	১১	১১/২	১১/৫	১১/৭
২৪	১১/৫	১১	১১/১২	১১/৭	১১/২
২৫	১১/১৫	১১	১১/৫	১১	১১/১৭
২৬	১১/২	১১	১১/১৫	১১/১২	১১/১২
২৭	১১/১২	১১	১১/৭	১১/১৫	১১/৭

২০ দিনে যোগ হকেনে

দিন	১	২	৩	৪	৫
১	৫০	১০	১২২	৯২	৯১৫
২	১০	৯২	১৫	১৭	১১০
৩	১২২	১৫	১৭	৯১২	১৫
৪	৯২	১৭	৯১২	১১৫	১১
৫	৯১৫	১১০	১৫	১১০	১১৫
৬	১৫	৯১০	১১৭	১১৫	১১০
৭	১১৫	১১২	১১০	১১৭	১১৫
৮	১৭	১১৫	১১৫	১১২	১১০
৯	১৭	১১৭	১১৭	১১৭	১১৫
১০	১১০	১১০	১১০	১১০	১১০
১১	১১০	১১০	১১২	১১৫	১১৫
১২	১১০	১১২	১১৭	১১০	১১০
১৩	১১২	১১৫	১১০	১১২	১১৫
১৪	১১২	১১৭	১১২	১১৭	১১০
১৫	১১৫	১১০	১১৫	১১২	১১৭
১৬	১১৫	১১০	১১০	১১৫	১১২
১৭	১১৫	১১২	১১২	১১৭	১১৭
১৮	১১৭	১১৫	১১৫	১১৫	১১২
১৯	১১৭	১১৭	১১৭	১১৭	১১৭
২০	১১০	১১০	১১২	১১২	১১২
২১	১১০	১১০	১১৫	১১৭	১১৭
২২	১১০	১১২	১১৭	১১০	১১২
২৩	১১২	১১৫	১১০	১১৫	১১৭
২৪	১১২	১১৭	১১৫	১১০	১১২
২৫	১১৫	১১০	১১৭	১১২	১১৭
২৬	১১৫	১১২	১১০	১১৭	১১২
২৭	১১৭	১১৫	১১২	১১৭	১১৭
২৮	১১৭	১১৭	১১৭	১১৫	১১২

২৯ দিনে মাস হইলে

দিন	৬	৭	৮	৯	১০
১	৬/৫	৬/১৭॥	১৭॥	১১৭॥	১/১০
২	১৬/১২॥	১৬/১৫	১১৫	১১/১৭॥	১৬/০
৩	১১/১৭॥	১৬/১২॥	৬/৫	৬৬/১৭॥	১১০
৪	৬/৫	৬৬/১০	১/১২॥	১৬/১৭॥	১৬/০
৫	১১০	১৬/৭॥	১১৬/০	১১১৫	১১৬/১০
৬	১৬/১৭॥	১১৬/৫	১১৬/১০	১৬/১৫	২/০
৭	১১৬/২॥	১১৬/২॥	১৬৬/১৭॥	২৬/১৫	২১৬/১২॥
৮	১১৬/১০	১৬৬/০	২৬/৫	২১৬/১৫	২৬২॥
৯	১৬/১৫	১৬/১৭॥	২১৬/১৫	২৬১২॥	৩/১২॥
১০	২/২॥	২১৬/১২॥	২৬২॥	৩/১২॥	৩১৬/২॥
১১	২১৭॥	২১৬/১০	৩১০	৩১৬/১২॥	৩৬১২॥
১২	২১৬/১৫	২৬৬/৭॥	৩১/০	৩১৬/১২॥	৪৬/২॥
১৩	২১৬/০	৩৬/৫	৩১/৭॥	৪১০	৪১৬/১২॥
১৪	২৬৬/৭॥	৩১৬/২॥	৩৬/১৫	৪১/১০	৪৬/৫
১৫	৩/১২॥	৩১৬/০	৪৬/৫	৪১৬/১০	৫৬/১৫
১৬	৩১/০	৩৬/১৭॥	৪১৬/১২॥	৪৬৬/১০	৫১০
১৭	৩১৫	৪/১৫	৪১৬/০	৫১৭॥	৫৬/১৫
১৮	৩১৬/১২॥	৪১/১২॥	৪৬৬/১০	৫১/৭॥	৬৬/৫
১৯	৩৬৬/১৭॥	৪১৬/১০	৫৬/১৭॥	৫৬৬/৭॥	৬১৫
২০	৪৬/৫	৪৬/৫	৫১৫	৬৬/৭॥	৬৬৬/৫
২১	৪১/১০	৫/২॥	৫৬১৫	৬১৫	৭৬/১৭॥
২২	৪১১৭॥	৫১/	৬/২॥	৬৬/৫	৭১/৭॥
২৩	৪৬২॥	৫১১৭॥	৬১/১০	৭৬/৫	৭৬/১৭॥
২৪	৪৬৬/১০	৫৬১৫	৬১৬/০	৭১৬/৫	৮১৭॥
২৫	৫৬/১৫	৬৬১২॥	৬৬৬/৭॥	৭৬২॥	৮১/১৭॥
২৬	৫১৬/২॥	৬১০	৭৬/১৫	৮/২॥	৮৬৬/৭॥
২৭	৫১/৭॥	৬১৭॥	৭১৬/৫	৮১৬/২॥	৯১১৭॥
২৮	৫৬১৫	৬৬৫	৭১৬/১২॥	৮১৬/১০	৯১৬/১০

৩০ দিনে মাস হইলে

দিন	১\	২\	৩\	৪\	৫\
১	১০	১০	১০	১২॥	১২২॥
২	১০	১২॥	১২॥	১৫	১/৫
৩	১০	১২॥	১৫	১১২॥	১০
৪	১২॥	১৫	১১১॥	১১০	১১১২॥
৫	১১২২॥	১/৫	১০	১১১২২॥	১/৫
৬	১২॥	১১১॥	১/১০	১১৫	১\
৭	১১২২॥	১১১॥	১১২॥	১১১১১॥	১১১২২॥
৮	১৫	১১৫	১১৫	১/০	১১/৫
৯	১৫	১/১০	১১১॥	১১২২॥	১॥০
১০	১/৫	১১১২॥	১\	১১/৫	১১১১২২॥
১১	১/১৫	১১১২২॥	১/১০	১১১১১॥	১১/৫
১২	১১১॥	১১৫	১১২২॥	১১/১০	১\
১৩	১১১১১॥	১১১৫	১১৫	১১১১২২॥	১১১২২॥
১৪	১১১১॥	১১১১১॥	১১১১১॥	১১১১৫	১১/৫
১৫	১০	১\	১॥০	১\	১॥০
১৬	১১০	১/০	১১/১০	১১২২॥	১১১১২২॥
১৭	১/০	১১২২॥	১১১২২॥	১১৫	১১/৫
১৮	১/১০	১১২২॥	১১১৫	১১১১১॥	১\
১৯	১১২২॥	১১৫	১১১১১১॥	১১১০	১১১২২॥
২০	১১১১২২॥	১১/৫	১\	১১১১২২॥	১/৫
২১	১১২২॥	১১১১১॥	১/১০	১১১৫	১॥০
২২	১১১২২॥	১১১১১॥	১১২২॥	১১১১১১॥	১১১১২২॥
২৩	১৫	১১১০	১১৫	১/০	১১/৫
২৪	১১৫	১১/১০	১১১১১॥	১১২২॥	১\
২৫	১১/৫	১১১১১২২॥	১১০	১১/৫	১১১১২২॥
২৬	১১১৫	১১১১২২॥	১১/১০	১১১১১॥	১১/৫
২৭	১১১১১॥	১১১৫	১১১২২॥	১১/১০	১১০
২৮	১১১১১১॥	১১১১৫	১১১৫	১১১১২২॥	১১১১২২॥
২৯	১১১১১॥	১১১১১॥	১১১১১॥	১১১১৫	১১১/৫

৩০ দিনে মাগ হইলে

দিন	৬	৭	৮	৯	১০
১	৬/২॥	৬/২২॥	১৫	১৫	১/৫
২	১০/৭॥	১৬/৭॥	১১০	১১০	১০/১২॥
৩	১১/১২॥	১১/২॥	৬১৫	৬০/৭॥	১১
৪	৬১৭॥	৬০/১৭॥	১/০	১৬/২॥	১১/৫
৫	১১	১০/১২॥	১১/৫	১১০	১১০/১২॥
৬	১৬/২॥	১১০/৭॥	১১/১০	১৬১৫	১১
৭	১১০/৭॥	১১০/২॥	১৬/১৫	১/১০	১১/৫
৮	১১/১৭॥	১৬/১৭॥	১০/২॥	১১০/৭॥	১১০/১২॥
৯	১৬১৭॥	১/১২॥	১১০/৭॥	১১৬/২॥	১১
১০	১১	১১/৭॥	১১০/১২॥	১১	১১/৫
১১	১৬/২॥	১১/২॥	১৬০/১০	১১৫	১১০/১২॥
১২	১১০/৭॥	১৬১৭॥	১৬/২॥	১১/১০	১১
১৩	১১/১২॥	১৬১২॥	১১৬/৭॥	১৬০/৭॥	১১/৫
১৪	১৬১৭॥	১১৭॥	১১৬/১২॥	১৬/২॥	১১০/১২॥
১৫	১১	১১০	১১	১১০	১১
১৬	১৬/২॥	১১৬/১২॥	১১৫	১৬১৫	১১/৫
১৭	১১০/৭॥	১৬৬/৭॥	১১১০	১৬/১০	১১০/১২॥
১৮	১১/১২॥	১৬/২॥	১৬১৫	১১০/৭॥	১১
১৯	১৬১৭॥	১১০/১৭॥	১৬/০	১১৬/২॥	১১/৫
২০	১১	১১০/১২॥	১৬/৫	১১	১১০/১২॥
২১	১৬/২॥	১৬০/১৭॥	১১/১০	১১৫	১১
২২	১১০/২॥	১০/২॥	১৬/১৫	১১/১০	১১/৫
২৩	১১/১২॥	১৬/১৭॥	১৬/৭॥	১৬০/৭॥	১১০/১২॥
২৪	১৬১৭॥	১১/১২॥	১১০/১৭॥	১৬/২॥	১১
২৫	১১	১৬/৭॥	১১০/১২॥	১১০	১১/৫
২৬	১৬/২॥	১৬/২॥	১৬০/১৭॥	১৬১৫	১১০/১২॥
২৭	১১০/৭॥	১৬১৭॥	১৬/২॥	১৬/১০	১১
২৮	১১/১২॥	১১১২॥	১১৬/৭॥	১১০/৭॥	১১/৫
২৯	১৬১৭॥	১৬১৭॥	১১৬/১২॥	১১৬/২॥	১১০/১২॥

৩১ দিনে মাস হইলে

দিন	১	২	৩	৪	৫
১	১০	১০	১০	১০	১০
২	১০	১০	১০	১২	১২
৩	১০	১০	১২	১০/২	১০/২
৪	১০	১২	১০/২	১৫	১০/৫
৫	১০	১২	১০/২	১০/৫	১০/৫
৬	১০	১০/২	১০/৫	১১	১০/১০
৭	১০	১০/২	১০/১৫	১০/১১	১০
৮	১২	১৫	১১	১১০	১১২
৯	১২	১০/৫	১০/১১	১০/১০	১০/২
১০	১২	১০/৫	১০/১০	১১২	১১/১৫
১১	১০/২	১০/৫	১০	১০/১২	১১৫
১২	১০/২	১১	১০/১০	১১৫	১১০
১৩	১০/২	১১/১১	১২	১১০/১৫	২/১০
১৪	১০/২	১০/১১	১১/১২	১১১১	২২
১৫	১০/২	১১/১১	১০/১৫	১১০/১১	২১০/২২
১৬	১৫	১১০	১১৫	২/০	২১/৫
১৭	১৫	১/১০	১১০/৫	২০	২১০/১৫
১৮	১০/৫	১০/১০	১১০/১১	২১/২	২১০
১৯	১০/১৫	১০/১০	১১/১১	২১০/২	৩/০
২০	১০/৫	১১২	১১০	২১/৫	৩০/২২
২১	১০/১৫	১১/১২	২১০	২১০/৫	৩০/২
২২	১০/৫	১১০/২২	২০/১০	২১/১১	৩১৫
২৩	১০/১৫	১১০/২২	২০/১২	২১০/১১	৩১০/৫
২৪	১১	১১৫	২১/২	৩/১০	৩১০
২৫	১১১	১১/১৫	২১০/১৫	৩০	৪১০
২৬	১১/১১	১১০/১৫	২১৫	৩১/১২	৪০/২
২৭	১১/১১	১১০/১৫	২১/১৫	৩১০/২২	৪১/১২
২৮	১১/১১	১১১১	২১০/১১	৩১/১৫	৪১৫
২৯	১১/১১	১১০/১১	২১১১	৩১০/১৫	৪১০/১৫
৩০	১১/১১	১১০/১১	২১০/১০	৩১০/১১	৪১০

୩୬ ଦିନେ ଯାମ ହେଲେ

ଦିନ	୬	୭	୮	୯	୧୦
୧	୧୦	୧୧	୧୨	୧୩	୧୪
୨	୧୫	୧୬	୧୭	୧୮	୧୯
୩	୨୦	୨୧	୨୨	୨୩	୨୪
୪	୨୫	୨୬	୨୭	୨୮	୨୯
୫	୩୦	୩୧	୩୨	୩୩	୩୪
୬	୩୫	୩୬	୩୭	୩୮	୩୯
୭	୪୦	୪୧	୪୨	୪୩	୪୪
୮	୪୫	୪୬	୪୭	୪୮	୪୯
୯	୫୦	୫୧	୫୨	୫୩	୫୪
୧୦	୫୫	୫୬	୫୭	୫୮	୫୯
୧୧	୬୦	୬୧	୬୨	୬୩	୬୪
୧୨	୬୫	୬୬	୬୭	୬୮	୬୯
୧୩	୭୦	୭୧	୭୨	୭୩	୭୪
୧୪	୭୫	୭୬	୭୭	୭୮	୭୯
୧୫	୮୦	୮୧	୮୨	୮୩	୮୪
୧୬	୮୫	୮୬	୮୭	୮୮	୮୯
୧୭	୯୦	୯୧	୯୨	୯୩	୯୪
୧୮	୯୫	୯୬	୯୭	୯୮	୯୯
୧୯	୧୦୦	୧୦୧	୧୦୨	୧୦୩	୧୦୪
୨୦	୧୦୫	୧୦୬	୧୦୭	୧୦୮	୧୦୯
୨୧	୧୧୦	୧୧୧	୧୧୨	୧୧୩	୧୧୪
୨୨	୧୧୫	୧୧୬	୧୧୭	୧୧୮	୧୧୯
୨୩	୧୨୦	୧୨୧	୧୨୨	୧୨୩	୧୨୪
୨୪	୧୨୫	୧୨୬	୧୨୭	୧୨୮	୧୨୯
୨୫	୧୩୦	୧୩୧	୧୩୨	୧୩୩	୧୩୪
୨୬	୧୩୫	୧୩୬	୧୩୭	୧୩୮	୧୩୯
୨୭	୧୪୦	୧୪୧	୧୪୨	୧୪୩	୧୪୪
୨୮	୧୪୫	୧୪୬	୧୪୭	୧୪୮	୧୪୯
୨୯	୧୫୦	୧୫୧	୧୫୨	୧୫୩	୧୫୪
୩୦	୧୫୫	୧୫୬	୧୫୭	୧୫୮	୧୫୯
୩୧	୧୬୦	୧୬୧	୧୬୨	୧୬୩	୧୬୪
୩୨	୧୬୫	୧୬୬	୧୬୭	୧୬୮	୧୬୯
୩୩	୧୭୦	୧୭୧	୧୭୨	୧୭୩	୧୭୪
୩୪	୧୭୫	୧୭୬	୧୭୭	୧୭୮	୧୭୯
୩୫	୧୮୦	୧୮୧	୧୮୨	୧୮୩	୧୮୪
୩୬	୧୮୫	୧୮୬	୧୮୭	୧୮୮	୧୮୯

আয় ও ব্যয়

ত্রিযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক লিখিত ।*

সংসার করিতে হইলে একটি আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা কর্তব্য । কি প্রণালীতে সরলভাবে হিসাব রাখা যাইতে পারে, নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে । একটি কল্পিত সংসার মনে না করিলে হিসাবের আদর্শ দেওয়া অসম্ভব, এইজন্য একটি কল্পিত পরিবার উপস্থিত করিতেছি, ধরুন,—

নরহরি রায়—বাটির কর্তা ; চাকরী করেন । রাখালচন্দ্র রায়—নরহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র ; ব্যবসা করেন । কৃষ্ণদাস রায়—নরহরির কনিষ্ঠ পুত্র ; স্কুলে পড়েন । কেশবচন্দ্র—নরহরির ভ্রাতা । লক্ষ্মীর স্বামী । কান্তিকচন্দ্র—কৃষ্ণদাসের পুত্র । রামচরণ—নরহরির চাকর । মহামায়া—নরহরির স্ত্রী । লক্ষ্মী—নরহরির জ্যেষ্ঠা কন্যা । সরস্বতী—নরহরির কনিষ্ঠা কন্যা । বর্ণিমালা—রাখালচন্দ্রের স্ত্রী । হলধর দাস—স্বামী । পতিতপাষন ঘোষ—স্বামী । অগস্ত্য—খোপা । একটি গাড়ী ।

* গার্হস্থ্য-হিসাব-রক্ষা বিষয়ে ক্ষেত্রমোহন কৃতিত্ব অনন্তসাধারণ । তাহার বাড়ীতে হিসাব যে ভাবে রক্ষিত হইতে দেখিরাছি—সংসার-খরচের এরূপ সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ হিসাব আদি কোথাও পাই নাই ।

ঐ

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বৃথবার—	১লা বৈশাখ—	১৪ই এপ্রেল—
জমা—	খরচ—	
নগদ—	নগদ—	
হস্তে মজুত—	হলধর দাস—	
নরহরি দাস	চৈত্রমাসের মূল্য—	
চৈত্র মাসের বেতন—৫০/	দেনা—	৩০/
রাখালচন্দ্র দাস	পতিতপাবন ঘোষ—	
৩১ চৈত্র তারিখের দোকানে	চৈত্র মাসের দুধের	
বিক্রয়—	দেনা—	৫/
		৫৫/
বান—	৫৪৭/০	
মজুত—	৬৭/০	
		ককদাসের ইকুলের বাহিরানা
		দঃ এপ্রেল—
		৪/
		অগস্তাখ খোলা
		দঃ চৈত্র—
		২/
		মহামারার
		শাড়ী ১ জোড়া—
		২/
		কার্তিকের অন্ন
		ডাক্তারের ফি—
		২/
		ঔষধ—
		৬০
		বাজার—
		১৭/০
		৫৪৭/০

ক্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বুধবার— ১লা বৈশাখ— ১৪ই অক্টোবর—

জমা—		খরচ—
ধার—		ধার—
হলধর দাস—		অগস্ত্য খোঁপা—
চাউল—	৭\	৩০ খানা কাপড়—
১/০		
রত—	২৬০	
/২		
সর্বপ তৈল	১৮০/০	
/৫		
ডাল—	৬০	
/৫		
লবণ—		
/২॥	১/০	
	<hr/>	
	১২॥/০	

পতিতপাবন ঘোষ

স্থগ্ন ১০

/১

ধার জমা অর্থাৎ যে কোন দ্রব্য ক্রয় করা হইল, পরে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে, তাহাকে ধার জমা বলা হয়—যেমন হলধর দাসের দোকান হইতে চাউল ইত্যাদি ১২॥/০ মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কেনা হইল, পরে মাস-কাবারে তাহার মূল্য

দেওয়া হইবে। অল্প তারিখে চৈত্র মাসের মূদীর দোকানে ধারে যে সকল জিনিস কেনা হইয়াছিল, মূল্য ৩০ টাকা নগদ দেওয়া হইল—ইহা নগদ খরচ।

পতিতপাবন বোঝাপ্রত্যহ দুগ্ধ দেয়, কিন্তু তাহার দান মাসকাবারে দেওয়া হয়, সুতরাং এই দুগ্ধের হিসাব ধার জমা হইল।

ধার খরচ—জগন্নাথ ধোপাকে কাপড় কাচিবার জন্ত ৩০ খানি কাপড় দেওয়া হইল। এটা জগন্নাথের নামে 'ধার-খরচ' পড়িল। পরে যখন জগন্নাথ কাপড় ফিরাইয়া দিবে, তখন তাহার নামে ঐ কাপড় পড়িবে। (৩রা বৈশাখ দেখ)

ধোপাকে কি কি কাপড় দেওয়া হইল, তাহার অল্প একখানি খাতা রাখা কর্তব্য। যেমন ৩০ খানি কাপড় দেওয়া হইলে এই প্রকারে লিখিতে হইবে।

নরহরি বাবু—

রাখালচন্দ্র—

সাদা ধুতি—১

কালাপেড়ে—১

কামিজ—১

কোট—১

পাটলুন—১

উড়ুনী—১

চাপকান—১

কুম্বদাস—

মোজা—১ জোড়া

পাঞ্জাবী—১

কমাল—১

লাল পাড়—১

কার্তিক—

সরস্বতী—

ক্রক—১

লেশ পাড়—১

পেনী—১

সেমিজ—১

মহাধারা—

মণিমালা—

কস্তা-পাড়—১

বেগুনী দাঁত পাড়—১

লক্ষী—

বডিস—১

লাল পাছা—১

বিছানার চাদর—২

ডুয়ে—১

বালিশের ওরাড়—৮

মোট—

৩০ খানা

ক্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বৃহস্পতিবার— ২রা বৈশাখ— ১৫ই এপ্রেল—

জমা—		খরচ—	
নগদ—		নগদ—	
মজুত—	৭৭/০	রাখালচন্দ্র রাই—	
রাখালচন্দ্র রাইয়ের দোকানে—		দোকান ভাড়া	
১লা বৈশাখের বিক্রয়—২০/		দঃ টেজ—	১০/
	২০৭৭/০	দোকানের জিনিস খরচ—	৫/
বাদ—	১৮৭৭/০	গোকর ভূসী	৭৭/০
	২৭	।০	
		খইল	১১০
		/৫	
		লক্ষ্মীর খন্তরবাড়ীর তব	২৭
		বাজার—	১০/
		জলখাবার	১১০
		ট্রাম ভাড়া	১১০
		ডাকের চিকিট্	২১০
			১৮৭৭/০

রাখালচন্দ্রের দোকানের ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব অত্র দোকানের অত্র খাতা থাকিবে। যে টাকা রাখালচন্দ্র বাড়ীতে দিবে, তাহাই তাহার নামে জমা পড়িবে এবং যে টাকা লইবে, তাহাই তাহার নামে খরচ পড়িবে।

শ্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

বৃহস্পতিবার— ২রা বৈশাখ— ১৫ই এপ্রেল—

জমা— খরচ—

খার— খার—

হলধর দাস—

নারিকেল তৈল— ৥০

/১

পতিতগাবন ঘোষ—

ছদ্ম— ১০

/১

শ্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩রা বৈশাখ— ১৬ই এপ্রেল—

জমা— খরচ—

নগদ— নগদ—

মজুত— ২১ বাজার— ৥০

৥০

১৥০

ক্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩রা বৈশাখ— ১৬ই এপ্রেল—

জমা —

খরচ—

ধার—

ধার —

অগরাধ—

৩০ খানা কাপড়

পতিতপাবন ঘোষ—

৫৬—

১১

এই প্রকারে সংসারের জমা-খরচের হিসাব লিখিতে হইবে। ১লা তারিখের মুদী, গোয়ালী ও ধোপার খরচ বুঝাইবার অন্ত পর-পূষ্ঠার মাসের শেষ তারিখে একটি হিসাব দেওয়া গেল। শেষ-তারিখে মুদীর মোট কত পাওনা, গোয়ালীর মোট কত পাওনা ও ধোপার মোট পাওনা হিসাব করিয়া ধার জমা দেখাইতে হইবে, পরে যখন টাকা দেওয়া হইবে, সেই তারিখে তাহাদের নামে নগদ খরচ লেখা হইবে—যেমন ১লা বৈশাখে লেখা হইয়াছে।

ক্রী.

সন ১৩২২ সাল

ইংরাজী ১৯১৫ সাল

শুক্রবার— ৩১শে বৈশাখ— ১৪ই মে—

জমা—

খরচ—

নগদ—

নগদ—

মজুত—

বাজার ইত্যাদি—

শ্রী.....

সন ১৩২২ সাল

ইং ১৯১৫ সাল

শুক্লাব্দ—

৩১শে বৈশাখ—

১৪ই মে—

জমা

ধরচ—

ধার—

ধার—

পতিতপাবন ঘোষ—*

হুঙ্—।০

/১

হলধর দাস—

১লা—১২॥/০

২রা——॥০

ইত্যাদি—

মোট—

পতিতপাবন ঘোষ—

বৈশাখ মাস

মোট হুঙ্—৭৬০

৮০

অগস্তাখ ঘোষা—

বৈশাখ মাস

মোট কাপড়—

৮০ খানা ৪১

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক—

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (চতুর্থ সংস্করণ)	...	৫৮
২। রামায়ণী কথা (তৃতীয় সংস্করণ)	..	১১০
৩। বেহুলা (সপ্তম সংস্করণ)	...	১০
৪। জড়ভরত (চতুর্থ সংস্করণ)	...	১০
৫। কুল্লরা (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১০
৬। সতী (সপ্তম সংস্করণ)	...	১০
৭। ধরাদ্রোণ ও কুশলক (তৃতীয় সংস্করণ)	...	১০
৮। গৃহীণী (সপ্তম সংস্করণ)	...	২৮
৯। তিন বন্ধু (তৃতীয় সংস্করণ) সাধারণ সংস্করণ	...	১৮
১০। কুন্তিবাসী রামায়ণ	...	৪৮
১১। কালীদাসী মহাভারত (তৃতীয় সংস্করণ)	...	৫৮
১২। স্মৃতি	...	১০
১৩। সতী (ইংরাজী অনুবাদ, গ্রন্থকার কৃত)	...	২৮

[২]

১৪। History of Bengali Language and Literature	...	১২৮
১৫। Typical selections from old Bengali Literature	..	১২৮
2 vols	...	১২৮
১৬। Medaeval Vaisnab Literature of Bengal	...	২৮
১৭। Chaitanya and his companions	...	২৮
১৮। Folk Lore of Bengal	...	বহু
১৯। The Bengali Ramayans	...	৫
২০। The forces that developed our early Literature	...	৫

